গল্পের নকশিকাঁথা গল্পের সংকলন

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
গাড়িতে কাঁটা	৪
ছদ্মবেশ	৭
রাতের অতিথি	১০
রাধানগরের চাটুজ্জেবাড়ি	১৩
মূল্যবোধ	১৫
দেবীপ্রসাদ	১৮
মহাজীবনের পথে	২১
যোগশাস্ত্র প্রণেতা	২৩
সায়াহ্নের অনুভব	২৮
আগুন পাওয়া	৩০
ইয়ে টিয়ে (রম্য রচনা)	৩২
টানাপোড়েন	৩৫
ঋণশোধ	৩৭
অনন্তের ডাক	৪০
নেই	৪৩
শক্তিরূপেণ	৪৫
হেমন্ত রাগ	৪৭
মিড সি ব্লু কাঞ্জিভরম	৫০
আনন্দ দিন	৫৩
সোলমেট	৫৬
পয়মন্ত	৬০
নষ্ট দাম্পত্য	৬৩
সিলেক্টেড	৬৭
নিয়তির গতি	৭০
পলায়ন	৭৩
ক্লান্ত সন্ধ্যার রোমন্থন	৭৬
শ্রদ্ধাবানের অনুভবে	৭৮
ভগবানের মার	৮০
রবীন্দ্র পুরস্কার	৮২
ধর্মের কল	৮৭
ভবিষ্যৎ কর্ণধার	৯২
কৈশোরের কালবৈশাখী	৯৪
জীবনসঙ্গী	৯৯
তুলসীগাছ	১০২
স্মৃতি বিস্মৃতির দোলাচলে	১০৬
ওগো আমার প্রিয়	১১১
ফিরে পাওয়া	১১৪

BANGLADARSHAN.COM

॥গাড়িতে কাঁটা॥

বছর পনের আগের ঘটনা। আমার আত্মজা ছোট থেকেই এলার্জেটিক শ্বাসকষ্টের ক্রনিক পেশেন্ট। মাঝে মাঝেই ডাক্তার পাল্টে হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক নানা বিকল্প পদ্ধতির চিকিৎসা ব্যবস্থার ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাওয়ানো হত তখন, যদি ওর একটু শ্বাসের সুরাহা করা যায়। একবার টানা এগারোদিন সারাদিন সারারাত জেগে বসে কেশেছিল, একদম আধমরা হয়ে গেছিল সেবারে। কোথায় কোথায় যে গেছি আমরা ওর এই অসুস্থতার জন্য, সে আর কি বলব। তার মধ্যে প্রত্যেকবার যে ডাক্তার দেখত, এলার্জি টেস্ট করে একটা লিস্ট করে দিত যে কি কি ও খেতে পারবে না। ওকে সেগুলো মানাতে গিয়ে বাড়িতেও সেগুলো ঢুকত না, সে তার বড়ো ফিরিস্তি, পোনা মাছ, চিংড়ি মাছ, বেগুন, ডিম, পালং শাক, মুসুর ডাল, কাবলি ছোলা, ময়দা, ইলিশ মাছ ইত্যাদি আরো জিনিস বন্ধ ছিল।

সেবারে আয়ুর্বেদিক ডাক্তার দেখানো হল, তিনি একগাদা ওষুধ দিলেন, যেখানে ওষুধগুলো পাওয়া যাবে সেটাও বলে দিলেন। সেই জায়গাটা এজরা স্ট্রিটের একটা দোকান যেটা পোদ্দার কোর্টের কাছে। সময়টা অগাস্টের শেষের দিকে, পুজোর কেনাকাটা শুরু হয়ে গেছে তখন।

এদিকে কর্তামশাইয়ের বেহালা থেকে সল্টলেকের অফিসে যাতায়াত করতে হয় বলে মোটামুটি সারাদিনের ছ'ঘন্টা তাঁর বাস জার্ণিতেই কেটে যায়, সে যেতে পারবে না বলে হাত তুলে দিল। আমিও তখন অফিস করি পার্ক স্ট্রিটের কাছে, আমিই দায়িত্ব নিলাম বাড়ির গাড়িতে সারথি সমেত ‘যাবো’ বলে। আমি কিন্তু পোদ্দার কোর্ট জায়গাটা তখন একদমই চিনি না।

যাই হোক, সাড়ে পাঁচটায় অফিসের পরে গাড়ি নিয়ে চললাম পোদ্দার কোর্টের দিকে, আমার সারথিটি, যার নাম রাম, একটি অল্পবয়সী ছেলে। কিছুদূর গিয়ে গোলদীঘির পাশ দিয়ে গিয়ে গাড়ি লালবাজারের দিকে চলল। ওইখানে বারদুয়েক গোল গোল ঘুরে একই জায়গায় ফেরত আসার পরে পুলিশকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে এজরা স্ট্রিটে গাড়ি যাবে না, আমাকে গাড়ি পোদ্দার কোর্টের কাছে রেখে হেঁটে গিয়ে এজরা স্ট্রিটে বেশ ভেতরে ওই দোকান থেকে ওষুধগুলো নিতে হবে। রামকে বললাম, “তুমি দেখেশুনে পার্কিংয়ের জায়গায় গাড়িটা রাখো, আমি আসছি।”

রাস্তায় নেমে দেখি সেটা ওই জায়গার ক্রসিং, বাদুড়ঝোলা হয়ে বাসগুলো চলেছে, ওয়াকিটকি নিয়ে ট্রাফিক পুলিশ সমানে কথা বলছে আর যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছে। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করে এজরা স্ট্রিটের দিকে হাঁটা লাগালাম। সেই ওষুধের দোকান একটা বড়ো বাড়ির ভেতরে ঢুকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ছাদের ওপরে উঠে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে বাড়িটার আরেকটা অংশে নেমে বেশ অনেকটা গিয়ে একটা বড়ো বারান্দার শেষ প্রান্তে। সমস্ত জায়গাটা অবাঙালি অধ্যুষিত। আমি গুটি গুটি হেঁটে খুঁজতে খুঁজতে সেই বাড়িটার গেটে ঢুকব হঠাৎ শুনি “একি বৌদি, আপনি এখানে!” বলে কেউ ডাকল, দেখি ঠিক গেটের মুখে একটা বড়ো ইলেকট্রিকাল

এপ্লায়েন্সের দোকান থেকে আমাকে ডাকছে, আমাদের পাড়ার ঠিক আমাদের পাশের বাড়ি ও ইলেক্ট্রিকের দোকানের প্রতিবেশী দুই ভাই, ওদের মূল দোকান আর আরো দুটো দোকান আছে ওই বাড়িটাতেই। ওরা আমাকে বসতে বলল ওদের দোকানে, তারপরে ওষুধের দোকানের কথা শুনে ওরাই আমাকে দোকানটার ঠিকঠাক জায়গাটা বলে দিল।

সেই মত অপরিসর অন্ধকার কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে সেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে বারান্দা পেরিয়ে দোকানে ঢুকলাম, ওষুধগুলো কিনছি এমন সময় রামের ফোন, "দিদি, শিগগির আসুন, পুলিশ আমাদের গাড়িতে কাঁটা দিয়েছে।" আমি বললাম, "কেন?" রাম বলল, "গাড়ি পোদ্দার কোর্টের দোকানগুলোর সামনে রেখেছি এমন সময় ট্রাফিক সার্জেন্ট এসে আমার লাইসেন্স দেখতে চাইল, আমি ভুল করে লাইসেন্সটা বাড়িতে ফেলে এসেছি আজকে, দেখাতে পারিনি, তারপর গাড়ির ব্লু বুক দেখতে চাইল, সেটা তো দাদা গাড়িতেই রাখেন, সেটা দেখালাম, তারপরে গাড়ির চাবিটা নিয়ে গাড়িতে কাঁটা দিয়ে দিয়েছে।" আমার একদম জলে পড়ার মত মনে হল। বললাম, "তুমি গাড়ির কাছে থাক, আমি আসছি।" দোকানে যিনি ওষুধ দিচ্ছিলেন তিনি জানতে চাইলেন "কি হয়েছে দিদি", বললাম, তিনি বললেন, "এ হে, একদম কাঁচা কাজ হয়ে গেছে, পুজোর মুখে কেউ এ ভুল করে? ওদের পুজোর বাজারে এবারে আপনার অনুদান যোগ হয়ে গেল।" মনে মনে তো প্রমাদ গুনলাম। এমন একটা বিষয় যেটা আমার এক্তিয়ারেই নেই।

ওষুধ কিনে বেরোনোর মুখে ওই এলাকায় হয়ে গেল লোডশেডিং, হাতড়ে হাতড়ে নিচে নেমে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে যখন গাড়ির কাছে পৌঁছলাম তখন সাতটা। দেখলাম একটা তিনকোণা লোহার যন্ত্র গাড়ির সামনের চাকায় ঢোকানো। সেই সার্জেন্টের সাথে গিয়ে কথা বললাম, তিনি বললেন, "বিনা লাইসেন্সের কারুর হাতে গাড়ি ছাড়ব না, আপনার হাসব্যান্ডকে বলুন তাঁর লাইসেন্স নিয়ে এসে গাড়ি নিয়ে যাক।" আমি তাঁকে আমাদের ভীষণ অন্যায় হয়েছে,ভবিষ্যতে আর কখনো হবে না, বাড়িতে ছোট বাচ্ছা একা রয়েছে ইত্যাদি অনেক কিছু বলে অনুনয় বিনয় করলাম, ভদ্রলোক অনড়, শেষে নিরুপায় আমি অগত্যা কর্তাকে ফোন করলাম, সে জানাল অন্তত ঘন্টা খানেক তো লাগবেই পৌঁছতে, সেই সময়টা আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

আমি রামকে গাড়ির কাছে রেখে সেই সার্জেন্ট যেখানে ট্রাফিক সামলাচ্ছেন ক্রসিংয়ের মুখে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরে সচকিত হয়ে খেয়াল করলাম যত গাড়ি যাচ্ছে, বাস যাচ্ছে ওই মোড় পেরিয়ে সবাই একবার করে আমাকে আর একবার ওই সার্জেন্টকে আপাদমস্তক দেখে চলে যাচ্ছে, ভদ্রলোকও ক্রমে সেটা লক্ষ্য করলেন, আমায় বললেন, "আপনি গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ান।" আমি ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে ওখানে ওঁর পাশেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

যখন সাড়ে সাতটা বাজে হঠাৎ দেখি ভদ্রলোক ইশারায় ওঁর সঙ্গে আসতে বলে গাড়ির দিকে যাচ্ছেন, আমি ওঁর সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। উনি গাড়ির কাছে এসে আমার হাতে গাড়ির চাবিটা দিলেন, রামকে আরেক প্রস্থ বকলেন, তারপরে আমায় বললেন, "যান, চলে যান বাড়িতে, আর যেন এরকম না হয়, সবসময় চেক করে নেবেন

গাড়িতে ওঠার আগে যে চালাচ্ছে তার লাইসেন্স সঙ্গে আছে কিনা, আপনার অসহায়তা দেখে ছেড়ে দিচ্ছি।” আমি তো তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে রামকে বললাম, “আগে এই চত্বর ছেড়ে চল।”

তারপরে কর্তাকে ফোন করলাম, সে তখন থিয়েটার রোডের কাছে, আমাকে বলল প্লানেটোরিয়ামের সামনে দাঁড়াতে। ওকে ওখান থেকে তুলতে প্রথমে জিজ্ঞেস করল, “কত দিতে হল?” আমি বলার আগে রাম উত্তরটা দিল, “একটা টাকাও না, দিদি ওই মোড়ের মাথায় গিয়ে এমন ভাবে কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল আর যেতে আসতে সবাই এমন করে দেখতে লাগল যে পুলিশটা একদম নিজের সম্মান বাঁচাতে গাড়িটা ছেড়ে দিল দাদা। আমাদের আগের, পরের দুটো গাড়িকে দুহাজার টাকার ফাইন আদায় করে তবে ছেড়েছে দাদা, আমার সামনে।” আমি ওকে ধমক লাগালাম, “আর তুমি যে বাড়িতে লাইসেন্স রেখে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলে, সেটা বুঝি খুব মহৎ কাজ হয়েছে?” দেখি কত্তামশাই হা হা করে হাসছেন।

॥ছদ্মবেশ॥

বৃটিশ আমলের বাংলা। কলকাতা থেকে ছেলে মেয়েদের নিয়ে দুই বোন, ইন্দুবালাদেবী আর ঊষারানীদেবী,যাঁরা আবার দুই জাও বটে, চলেছে জলপাইগুড়িতে নিজেদের বাপের বাড়িতে। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে লোকাল ধরে শিয়ালদা স্টেশন, ওখানে থেকে ট্রেনে যাওয়া। ঊষারানীর বর যিনি ইন্দুবালার সেজ দেওর তিনি এসে ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। সকলেরই টিকিট আর রিসারভেশন লেডিস কামরায়। ট্রেন ছাড়ল, রাত্রের অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চলল ট্রেন। লেডিস কম্পার্টমেন্টে চলেছেন উষারানী দেবী, ইন্দুবালা দেবী, ইন্দুবালা দেবীর তিন মেয়ে, আর এক ছেলে, আর ঊষারানী দেবীর এক মেয়ে আর এক ছেলে। সকলের অভিভাবক ইন্দুবালা দেবী, কারণ তাঁর অসামান্য সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি। সবাইকে নিয়ে চলেছেন তাঁদের জলপাইগুড়ির বাপের বাড়িতে। বর্ধমানে ট্রেন থামলে ট্রেনে উঠল একটি সুশ্রী নেহাতই ছেলেমানুষ বয়সের কনে বৌ যার আগের দিন রাত্রে বিয়ে হয়েছে, নতুন টুকটুকে লাল বেনারসী আর গা ভর্তি গয়না পরা নববধূটিকে ইন্দুবালা দেবীর পাশে বসিয়ে জিম্মা করে দিয়ে তার সদ্য বিবাহিত তরুণ বরটি উঠল গিয়ে পাশের কামরায়। তারাও যাবে জলপাইগুড়ি। বধূটি প্রথমে ট্রেনে উঠে কাঁদছিল, আস্তে আস্তে সহজ হয়েছে সে। ইন্দুবালা দেবী নানা গল্পে তাকে আপন করে নিয়েছেন।

পরের স্টেশন বোলপুরে গাড়ি দাঁড়াতে এক বিধবা মহিলা উঠলেন, তিনি দেখে শুনে ওই কনে বৌটির পাশেই বসলেন। ফর্সা, দোহারা চেহারার বিধবা মহিলাটির চুল ছোট করে কাটা, পরনে সাদা সেমিজের ওপরে সাদা থান। তিনি বৌটির পাশে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানান ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে জানতে লাগলেন তার হাতের চুড়ি কে দিল, গলার কোন হারটা কার দেওয়া, কানের পরনের দুল জোড়া ছাড়া আর কয় জোড়া দুল সে পেয়েছে, হাতের চুড়ি গুলো শুধু সোনার না ব্রোঞ্জের এবংবিধ নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রশ্ন। ইন্দুবালা দেবী একটু অসন্তুষ্টই হলেন ওই বিধবা মহিলার প্রশ্নের ধরণ দেখে এবং গায়ে পড়া আচরণে।

এদিকে রাত বাড়ছে, রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে সবাই শোবার তোড়জোড় করছে। ইন্দুবালা দেবী দাঁড়িয়ে থেকে সকলের শোবার সুবন্দোবস্ত করে দিয়ে ওই কনে বৌটির উল্টোদিকের বার্থে শুলেন, শুধু ওই বিধবা মহিলা অন্যত্র জায়গা থাকা সত্বেও ওই বৌটির পায়ের কাছে বসে রইলেন। ইন্দুবালা দেবী কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না, কি এক অস্বস্তিতে তাঁর দৃষ্টি বারবার ওই বিধবা মহিলাটিতে গিয়ে নিবদ্ধ হচ্ছে। উনি চুপ করে শুয়ে আছেন চোখ বুজে কিন্তু সজাগ। উল্টোদিকের বার্থে ওই বৌটি একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সকলেই ঘুমোচ্ছে শুধু ইন্দুবালা দেবী আর ওই বিধবা মহিলাটি ছাড়া। বিধবা মহিলাটি বসে বসে মাঝে মাঝে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হচ্ছেন।

তখন প্রায় মধ্যরাত। ট্রেন তখন একটা ব্রীজের ওপর দিয়ে ছুটছে। ব্রীজ পেরোনোর আওয়াজে ইন্দুবালা দেবী উঠে বসলেন।হঠাৎ ইন্দুবালা দেবীর নজর পড়ল ওই বিধবা মহিলা উঠে বাথরুমে গেলেন। ইন্দুবালা দেবী উঠলেন, উঠে ওই মহিলার হাত ব্যাগটিতে কি যেন দেখলেন, যেটি ওই বৌটির মাথার কাছে রাখা, তারপর বড়ো মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে তুললেন, তুলে নিয়ে চললেন বাথরুমের দিকে। বড়মেয়ে যে তখন কিশোরী কিছুই না বুঝে

মাকে অনুসরণ করল। তাকে ইন্দুবালাদেবী নির্দেশ দিলেন দরজার লকটা বাইরে থেকে সর্বশক্তি দিয়ে আটকে রাখতে, দিয়েই ট্রেনের চেন টানলেন। ট্রেন তখন ঢুকছে মালদা স্টেশনে।

চেন টানতেই রেলপুলিশের লোক নিয়ে সাহেব গার্ড আর ড্রাইভার ছুটে এলেন কি হয়েছে দেখতে।

ইন্দুবালা দেবী বললেন, "বাথরুমের মধ্যে যে মানুষটি আছে সে একজন পুরুষ এবং দুষ্কৃতী, এখুনি ওকে গ্রেপ্তার করুন আপনারা।"

রেল পুলিশের সাহেব দারোগা জিজ্ঞেস করলেন ইন্দুবালা দেবীকে, "আপনি কিসের ভিত্তিতে এই অভিযোগ করছেন?"

ইন্দুবালা দেবী বললেন, "আমি দেখেছি ওর সেমিজের তলায় বন্দুকের কার্তুজ বেল্টে আটকানো রয়েছে যা সাদা থানের উপর দিয়ে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাচ্ছিল আর ওর গাল পরিষ্কার পুরুষদের কামানো গাল, আর হাতে পায়ে বড়ো বড়ো পুরুষালি লোম। আমি নিঃসন্দেহ যে ওটি একজন পুরুষ যে বিধবা মহিলার ছদ্মবেশ ধরে রয়েছে। বিশ্বাস না করলে আপনারা (সাহেব পুলিশের লোক) জানলা দিয়ে দেখে সন্দেহ নিরসন করুন।" এদিকে মহিলাদের আব্রুর ব্যাপার ভেবে পুলিশও ইতস্তত করছে বাথরুমের জানলা দিয়ে দেখতে।

বাথরুমের ভেতরে গেছে যে লোক, সে ট্রেন থেমে গেছে দেখে খটকা লাগায় তখন বেরোনোর চেষ্টা করে যেই দেখেছে যে দরজা খুলতে পারছে না, সে স্বমূর্তি ধারণ করেছে। প্রথমে লক খোলার চেষ্টা করে বিফল হয়ে সে পালাবে বলে জানলার কাঁচে গুলি করেছে ওখান দিয়ে বেরোবে বলে। এইবার প্লাটফর্মের উপস্থিত পুলিশ দেখে যে সে শুধু আন্ডারপ্যান্ট আর গেঞ্জি পড়ে বাথরুমের ভেতর থেকে ক্রমাগত গুলি ছুঁড়ছে, কোমরে কার্তুজের সেই বেল্ট থেকে। শেষ পর্যন্ত ওই জানলা দিয়ে তার পায়ে গুলি ছুঁড়ে তাকে জখম করে পুলিশ তাকে ধরতে পারল। ধরার পরে দেখা গেল সে জেল পালানো এক কুখ্যাত আসামী যে লেডিস কম্পার্টমেন্টে উঠেছিল সময় মতো বন্দুক দেখিয়ে ডাকাতি করতে। ইন্দুবালা দেবীর তৎপরতায়, গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির জোরে সেই অপকর্মটি আর তার সম্পন্ন করা হল না, উল্টে আবার শ্রীঘরে যেতে হল তাকে। ইন্দুবালা দেবীর এহেন কর্মটি বহুল প্রশংসিত হল।

পরেরদিন সব কাগজে ইন্দুবালাদেবীর ছবিসহ এই ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হল, ইন্দুবালা দেবীকে মেডেল ও মানপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করল বৃটিশ সরকার। আর সেই নতুন বৌটি আর তার স্বামী ইন্দুবালা দেবীর কাছে চির কৃতজ্ঞ হয়ে রইল।

এটি একটি সত্য ঘটনা, যা শৈশব থেকে বহুবার শোনা আমার মাতুলালয়ের সবার মুখে, যেটি আজ এই ২০২০র পিতৃপক্ষে আমি শ্রদ্ধার্ঘ্য ও স্মৃতিতর্পন হিসেবে নিবেদন করছি সেই বিদেহী পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে যাঁরা আমাদের

জীবনের বেশ কিছু সময় তাঁদের স্নেহচ্ছায়ার নির্মল ছত্রটি বিস্তৃত করে সুগম করেছিলেন।উষারানী দেবী আমার দিদা, ইন্দুবালা দেবী আমার বড়ো দিদা, আর তাঁদের সন্তানেরা আমার মামা আর মাসি।

॥রাতের অতিথি॥

ব্রিটিশ আমলের উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স। অ্যান্ডার্সন হাউসের ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট ও দারোগা শ্রীপুলিনবিহারী ব্যানার্জী এবার বদলি হয়ে এসেছেন প্রত্যন্ত ছোট্ট এই পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা ওদলাবাড়িতে বেশ কিছুদিন ধরে ঘটতে থাকা কয়েকটি খুন ও ডাকাতির তদন্ত করতে।পাহাড়ের ওপরে জঙ্গল ঘেরা তাঁর কাঠের বাংলোতে এসে উঠেছেন সপরিবারে স্ত্রী ইন্দুবালা আর পাঁচমাসের মেয়ে কনকলতাকে নিয়ে, বাংলোতে আছে মদেশীয় কেয়ারটেকার রঘুরাম আর আছে তাঁর প্রায় ছায়ার মতো সর্বক্ষণের সঙ্গী পরমপ্রভুভক্ত জার্মান শেফার্ড কুকুর টাইগার।

বাংলোর ঠিক নীচে পাহাড়ের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে দুটি নদী লিশ আর চেল যাদের মাঝের ভূখণ্ডটিতে একটু পাহাড়ের কোলঘেঁষে এই বাংলোটির অবস্থান। চারপাশে চোখজুড়োনো সবুজের সমারোহ, নাম না জানা বহু পাখির আনাগোনায়, হাতির পাল, বন্য বরাহ, হরিণ আর গন্ডারের পদচারণায় স্থানটি যদিও খুবই মনোরম কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে পুলিনবাবুর কর্মস্থলটি তাঁর বাংলো থেকে চার কিলোমিটার দূরে আর প্রায় দিনই তাঁর ফিরতে রাত হয়ে যায়। আশেপাশে আর কোনো জনবসতি নেই। এদিকে কেয়ারটেকার রঘুরাম সন্ধ্যের পরে নেশাতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। জায়গাটি আরো বিখ্যাত ডাকাতির জন্য। পুলিনবাবুর স্ত্রী ইন্দুবালা দেবীর একটি সেলাই মেশিন আছে, যেটি রেখেছেন ড্রয়িং রুমের এক কোণে, যেটিতে তিনি সাংসারিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন বাচ্ছার জামা, নিজের ব্লাউজ, পেটিকোট, পর্দা সেলাই করেন অবসরে আর আছে তাঁর ভীষণ সাহস।নিজের আর শিশুটির সুরক্ষার জন্য তিনি হাতের কাছে সর্বদা মজুত রাখেন একটি বড়ো টর্চ, একটি রামদা, বর্শা আর টাঙ্গি। প্রতুৎপন্নমতিত্বে আর সজাগ নজরদারিতে তিনি যথার্থই “দারোগা গিন্নি।”

পুলিনবাবু যেহেতু একজন দক্ষ শিকারী, তাই বাংলোতে তাঁর লাইসেন্সড রাইফেল আছে গোটা তিনেক, যেগুলি উনি জঙ্গলে শিকার করার সময় নিয়ে বেরোন, আর অন্য সময় ড্রয়িং রুমে সাজানো থাকে। বাংলোতে ঢুকলে প্রথমেই বোগেনভেলিয়া শোভিত লোহার গেটের পরে মোরামের লাল রাস্তা যেটি এসে উঠেছে বাংলোর সিঁড়ির কাছে সেটি চোখে পড়ে, মোরামের রাস্তার দুধারে প্রচুর মরশুমি ফুলের গাছ আর কিছু ফলের গাছ দিয়ে ভরা সুন্দর বাগান যার পরিচর্যা করে মালী ঝন্টু। বাগানটি চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বেষ্টিত। মোরামের রাস্তার পরে বাংলোর পাঁচটি সিঁড়ি, তার পরে টানা বারান্দা, বারান্দা সংলগ্ন প্রথম ঘরটি ড্রয়িং রুম, ড্রয়িং রুমের মধ্যে দিয়েই দুপাশে দুটি বেডরুম, একটি বেশ বড়ো, যেটি ওখানে বলে, মাস্টার বেডরুম আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট বেডরুম, একটি লিভিং রুম, একটি স্টাডি আছে এই ছোট বেডরুমের সঙ্গে, দুটি বেডরুমের সঙ্গেই একটি করে লাগোয়া টয়লেট আছে, একটি ডাইনিং হল, একটি স্টোররুম যেটি ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয় আর একটি কিচেন, কিচেনের পেছনে আর একটি ছোট বারান্দা আছে যেখানে দাঁড়ালে পেছনের জঙ্গল আর নদীগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। পুরো বাংলোটি কাঠের।

সম্প্রতি আশেপাশের অঞ্চলে ডাকাতি খুব বেড়েছে, ইনফর্মার মারফত খবর এসেছে একটি ডাকাত দলের দলপতি কালু সরদার দলবল নিয়ে গিয়ে অতর্কিতে গ্রামবাসীদের ওপর চড়াও হয়ে তাদের বছরের ফসলের বস্তাভর্তি চাল, ডাল, আলু, আনাজ আর পোষা ছাগল, মুরগি যখন তখন তুলে নিয়ে আসছে। কয়েকদিন ধরে

সেই তদন্তের জন্যে পুলিনবাবুকে প্রায় রোজই আরো একটু দূরে যেতে হচ্ছে, ফিরছেন রাত বারোটা বাজিয়ে, ভরসার কথা সঙ্গে তাঁর সবসময়েই টাইগার রয়েছে আর রয়েছে তাঁর সার্ভিস রিভলভার।

সেদিন রাত দশটা বেজে গেছে, পুলিনবাবুর তখনো ফেরার নাম নেই। ইন্দুবালা দেবী আর কি করেন, তিনি ড্রয়িং রুমের এবং আর সব ঘরের দরজা ভালো করে বন্ধ করে নিজেদের রাতের খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে মেয়েকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে সেলাই মেশিনে কিছু সেলাই নিয়ে বসলেন। পুলিনবাবু আসলে উঠতে তো হবেই খেতে দেবার জন্য, তাই নিজের খাবারটাও ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেন। বাইরে নিস্তব্ধ প্রকৃতি, শান্ত জায়গা তাই ঝিঁঝির ডাক, রাতচরা পাখিদের ডাক পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, পেছনে নদীতে হাতির পাল, বুনো জন্তুদের জল খাবার শব্দ পরিষ্কার কর্ণগোচর হচ্ছে, দূরে কোথায় যেন কোনো বন্য জন্তু ডেকে উঠল, প্রকৃতির নৈঃশব্দ খানখান করে সেই ডাক শোনা গেল। ইন্দুবালা দেবী টর্চ, রামদা আর টাঙিটা হাতের কাছে নিয়ে, মেয়েকে পাশের সোফাতে শুইয়ে ঘর্ঘর ঘর্ঘর করে মেশিনে মেয়ের জামা সেলাইয়ে মন দিলেন।

ঘন্টাখানেক পরে ইন্দুবালা একটানা সেলাই করার ক্লান্তিতে একটু তন্দ্রাছন্ন হয়েছেন, হঠাৎ মনে হল পাশের দেয়ালটাতে যেন একটা আওয়াজ হল। উনি সজাগ হয়ে গেলেন। কিন্তু সেলাই বন্ধ করলেন না, এরপরে উনি খেয়াল করলেন একটানা কেউ যেন করাত চালাচ্ছে ওই দেয়ালের দিকটাতে। উনি মেশিনটা বন্ধ করে তুলে রাখলেন। নির্জন জায়গা, তায় বেশ রাত, কয়েক মাইলের মধ্যে কোনো জনবসতি নেই। চেঁচিয়ে যে কাউকে ডাকবেন তার উপায় নেই। রান্নাঘরের পাশের স্টোর রুমে রঘু আছে বটে কিন্তু নেশাছন্ন হয়ে সে সম্পূর্ণ অচেতন। এদিকে সেই করাত দিয়ে কাটার ঘষঘষ আওয়াজ কিন্তু হয়েই চলেছে। হঠাৎ ওঁর নজরে এল যে ওই ড্রয়িং রুমের বাগানের দিকের দেয়াল অনেকটা ফাঁক হয়ে গেছে, যেখান দিয়ে বাইরের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বাগানের কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। উনি টর্চ মেরে জায়গাটা নিরীক্ষণ করলেন। টর্চের আলো পড়ায় সাময়িক করাত চালানো বন্ধ হল। টর্চ নিভিয়ে যেই বসলেন আবার শুরু হল। দমবন্ধ করে উনি বসে আছেন মেয়ের পাশে আর দেখছেন একটু একটু করে কাঠের দেয়ালের ফাঁকটা বড়ো হচ্ছে। কতক্ষন সময় কেটে গেছে উনি জানেন না, দেয়ালের ফাঁক আরো বড়ো হল, এইবারে উনি দেখলেন একটি মাথায় ফেট্টি বাঁধা চুলভর্তি কালো মাথা ওই ফাঁক দিয়ে ঢুকছে। ইন্দুবালা দেবী উত্তেজনায় হাতে রামদা আর টর্চ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মাথাটি সম্পূর্ণ ঘরের ভেতরে ঢুকতেই উনি হাতে ধরে রাখা টর্চটা জ্বেলে রামদা দিয়ে পরপর বেশ কয়েকটি কোপ দিলেন ওই মাথাটির ঘাড়ে আর গলায়। তখন তাঁর আর মাথা কাজ করছে না, এদিকে যার ঘাড়ে গলায় কোপ পড়ল সে ততক্ষনে আর বেঁচে নেই আর পুরো ঘটনার আকস্মিকতায় ইন্দুবালা দেবী নিজে থরথর করে কাঁপছেন। এমন সময় হঠাৎ দেখলেন ওই দেয়ালের ফাঁকটুকু দিয়ে টাইগার পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে ঢোকার চেষ্টা করছে আর বাইরে পুলিনবাবুর জিপের শব্দ। টাইগারকে দেখে উনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালেন।

পরেরদিন যখন ওঁর জ্ঞান ফিরল দেখলেন, পুলিনবাবু অন্য অনেক সাহেব পুলিশকর্তাদের সাথে ড্রয়িং রুমে বসে আছেন আর অদূরে পড়ে রয়েছে একটি মৃতদেহ। জানতে পারলেন যে ওই মৃতদেহটি ডাকাতদের দলপতি কালু সর্দারের যে আগেরদিন রাত্রে এসেছিল পুলিনবাবুর রাইফেলগুলি চুরি করত, এটা জেনেই যে পুলিনবাবু সেদিন রাত্রে বাংলোতে নেই। এই ঘটনার পরে আরো দুবছর তাঁরা ওখানে ছিলেন কিন্তু ডাকাতি অনেক কমে গেছিল।

ইন্দুবালা দেবীর সাহসিকতার জন্য কালুর পুলিনবাবুর রাইফেল চুরি করা তো হলোই না, উল্টে পৈতৃক প্রাণটি সে খোয়ালো। ব্রিটিশ সরকার ইন্দুবালা দেবীকে এই সাহসিকতার জন্য মেডেল ও মানপত্র দিয়ে অবশ্য পুরস্কৃত করেছিল।

এটি একটি সত্য ঘটনা যেটির পাত্র ও পাত্রী পুলিনবিহারীবাবু ও ইন্দুবালা দেবী আমার বড়ো দাদু আর বড়োদিদা।

॥রাধানগরের চাটুজ্জেবাড়ি॥

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মল্লভূমরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহদেবের দেওয়ান ছিলেন শ্রীরামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জমিদারির অন্তর্গত ছিল রাধানগর, অযোধ্যা, কাঁকলা আর ভোরা। স্বর্গীয় শ্রীরামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের ভদ্রাসনটি ছিল রাধানগরে বর্তমান সোনামুখী রাধানগর বাস রাস্তা সংলগ্ন স্থানে, বর্তমান বাস রাস্তাটি চাটুজ্জে বাড়ির জমির ওপর দিয়েই তৈরী হয়েছে। বিষ্ণুপুর থেকে রাধানগরের দূরত্ব ছ মাইল। ভদ্রাসনটির পাশেই কুলদেবতা রঘুবীরের মন্দির আর ভদ্রাসনের একপাশে রয়েছে পুরাতন দুর্গাদালান, যেখানে প্রতিবছর মা দূর্গার পূজাটি গ্রামের লোকেদের সার্বজনীন আনন্দোৎসব। ভদ্রাসনের ভেতরে বিরাট উঠোন যেখানে সার দিয়ে ধানের মড়াই বাঁধা থাকত, ঠাকুরদালানের একপাশে মায়ের পূজার হাড়িকাঠ, ঠিক উঠোনের মাঝখানে একটি বিরাট আমগাছ আর বাড়ির ঠিক পেছনে চাটুজ্জেদের নিজেদের পুকুর চাটুজ্জেগোড়া। গ্রামের মধ্যেকার মোট বাহান্নটি পুকুরে চাটুজ্জে বংশের ভাগ ছিল, তাই বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হলে এই পুকুরের মাছ দিয়েই তা উদ্ধার হয়ে যেত।চাটুজ্জেবাড়ি ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে ডান দিকের রাস্তায় এগোলেই পড়ে গঙ্গাধরের মন্দির, গাজনের মাঠ আর চণ্ডীমণ্ডপ যেগুলি সবই চাটুজ্জে বংশের অন্তর্গত। রঘুবীরের মন্দিরের ঠিক গায়েই আছে সতী মায়ের থান যেখানকার সিঁদুর দিয়ে আজও চাটুজ্জেদের যে কোনো বিবাহে সিঁদুরদান হয়। শ্রীরামশঙ্কর চাটুজ্জের পুত্র ছিলেন শ্রীরাঘবেন্দ্র চাটুজ্জে, যাঁর পুত্র শ্রীবামাচরণ চাটুজ্জের দুটি পুত্র, শ্রীসত্যশরণ ও শ্রীসত্যকিঙ্কর। শ্রীবামাচরনের সময় পর্যন্ত বাড়ির গোয়ালেতে চল্লিশ বেয়াল্লিশটা গরু থাকত, কিন্তু বামাচরণের স্ত্রীবিয়োগের পরে ছেলেরা কর্মসূত্রে বাইরে চলে যায়, তাই গোয়ালের বেশিরভাগ গরুই দান করে দেন বামাচরণ। বামাচরণের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীসত্যশরণের বিবাহ হয় বর্ধমানের ছোটবৈনানের জমিদার শ্রীঅঘোরমোহন মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সরলাবালার দেবীর সঙ্গে এবং যেহেতু অঘোরমোহনের কোনো ছেলে ছিল না তাঁর বিশাল জমিদারি দেখাশোনার জন্য, তাই শ্রীসত্যশরণ স্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে ছোট বৈনানে বসবাস করে জমিদারির তদারকি করতে থাকেন, এছাড়াও তিনি রেলে চাকরি করতেন, যেটি ছিল বদলির চাকরি। ছেলেমেয়েদের ঠিকভাবে মানুষ করা ও লেখাপড়া চালানোর জন্য উনি পরিবারকে ছোট বৈনানে রেখে কর্মস্থলে থাকতেন এবং একপক্ষকাল বা মাসে একবার বাড়িতে আসতেন। শ্রীবামাচারণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসত্যকিঙ্কর চ্যাটার্জীর বিয়ে হয় রাধানগরের পাশের গ্রাম অযোধ্যার মায়ের পূজারী শ্রীদামোদর গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সুভদ্রাদেবীর সঙ্গে। শ্রীসত্যকিঙ্কর চাটুজ্জে ছিলেন দানাপুর স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। শ্রীসত্যকিঙ্কর চাটুজ্জে পরে বিষ্ণুপুরে পুরোনো মিউনিসিপালিটির পাশে গোঁসাইনদের কয়লার ডিপোর পেছনে নিজগৃহ নির্মাণ করেন।শ্রীসত্যকিঙ্করের তিনটি পুত্র আর তিনটি কন্যা, জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় শ্রীঅর্ধেন্দুভূষণ চ্যাটার্জী আমার পিতা। আমার পিতা দূর্গাপুরে কর্মরত ছিলেন। বাকি দুই কাকা থাকতেন বিষ্ণুপুরের দাদুর করা বাড়িতে, পরে ছোটকাকা বিষ্ণুপুরেই অন্যত্র বাড়ি করেন।

রাধানগর গ্রামের সঙ্গে আমার সংযোগ খুবই ক্ষীণ, কিন্তু আমার পিতৃবংশের দুটি অদ্ভুত ঘটনা বলার জন্য এই লেখার অবতারণা। প্রথমটি হচ্ছে ওই সতীমায়ের থান। সতীমা ছিলেন বাবার ঠাকুর্দা শ্রী রাঘবেন্দ্র চাটুজ্জের সতী সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রী, স্বামীর মঙ্গলকামনায় নিবেদিত প্রাণ, পতিপ্রাণা ভক্তিমতী সহধর্মিনী। রঘুবীরের নিত্যপূজা নিজের হাতে না করে তিনি জলস্পর্শ করেননি কখনো।শ্রীরাঘবেন্দ্র চাটুজ্জে শেষ জীবনে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বহুদিন শয্যাগত ছিলেন। সতীমা দিবারাত্র এককরে তাঁর সেবা করে যাচ্ছিলেন কিন্তু বৈধব্য জীবন তাঁর কাছে

দুঃস্বপ্নবৎ ছিল এবং তাই তিনি নিত্য রঘুবীরের কাছে আর্জি জানাতেন স্বামীর আগে নিজের মৃত্যুর জন্যে। এরপরে শ্রীরাঘবেন্দ্র চাটুজ্জের যখন শ্বাস উঠে গেছে দেখলেন সতীমা, তিনি এক অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি রঘুবীরশিলার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি যদি কায়মনোবাক্যে সত্যিই সতী হন তো স্বামীর অন্তিম শ্বাসের আগে তিনি দেহ ছাড়বেন এবং তাঁর জাঙের মাঝখান থেকে তাঁর বংশধরেরা সিঁদুর কৌটো পাবে যে সিঁদুর দিয়ে তাঁর অন্তিম যাত্রায় সিঁথি রঞ্জিত হবে এবং যেটা চাটুজ্জে বংশকে চিরকাল গৌরবান্বিত করবে। শোনা যায়, তাঁর এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা শেষ হওয়া মাত্র তাঁর শ্বাস ওঠে এবং তিনি দেহ রাখেন, শ্রীরাঘবেন্দ্র চাটুজ্জে তাঁর পরে মারা যান।তিনি সধবা অবস্থায় দেহ রাখলে তাঁর পুত্র ও বংশের লোকজন সত্যি সত্যি তাঁর জাঙের ভেতর থেকে সিঁদুর কৌটো উদ্ধার করেন, তাঁকে সেই সিঁদুরটাই পরানো হয় তাঁর অন্তিমযাত্রায় আর তিনি যে জায়গায় দেহত্যাগ করেন সেই জায়গাটি বাঁধিয়ে সেখানে এই সিঁদুর কৌটোটি পূজিত হতে থাকে তাঁর সতীত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ, আমার স্বর্গতা জননীকে তাঁর বিয়ের সময় ঐখানকার সিঁদুর দান করা হয়েছিল বলে তাঁর কাছে শুনেছিলাম।

দুর্গাদালানের প্রসঙ্গে মায়ের কাছে শুনেছি যে চাটুজ্জেদের দূর্গাপুজা মহাধুমধাম করে হয়, অষ্টমীর সন্ধিপুজোয় মাকে একশো আটটা পদ্মফুলের মালায় সাজানো হয়, ঘটেও প্রচুর অন্য ফুলের সঙ্গে পদ্মফুল থাকে। ঠিক সন্ধিপুজোর সময় যখন দেবী চামুণ্ডার আরাধনা করে মৃন্ময়ী প্রতিমাতে প্রাণ সঞ্চার হয় দেবী চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন, তখন দেবীর ঘটের পদ্মটি দেবীর আশীর্বাদ স্বরূপ ঘট থেকে নিচে পড়ে।যদি দূর্গা দালানে চাটুজ্জে বংশের লোকজন ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত থাকে তাহলে সেই ফুলটি আর পড়েনা।

আমি আমার একুশ বছর বয়স পর্যন্ত রাধানগরে গেছি, মূলতঃ ধানাদায়ের সময় শীতকালে, মাটির দোতলা মাঠকোঠাতে থেকেছি, তখনো সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না, হ্যারিকেনের আলোয় কাঁথা মুড়ি দিয়ে কাকা পিসিদের সাথে থেকেছি, জলখাবারে চপ মুড়ি বোঁদে খেয়েছি, চাটুজ্জেগোড়ায় চান করেছি, ধানের মড়াইয়ে ধান রাখা দেখেছি, আখের রস জ্বাল দিয়ে আখের গুড় তৈরী, খেঁজুর রস জ্বাল দিয়ে খেঁজুর গুড় তৈরী হচ্ছে, আখ মাড়াইয়ের ঘানির চারপাশে বলদ ঘুরছে এইসব দেখেছি, গরম আখের গুড়, খেঁজুর গুড় শালপাতার দোনায় করে খেয়েছি আর দাদু শ্রীসত্যকিঙ্কর চ্যাটার্জী বেঁচে থাকতে মনে পড়ে জমির আলে দাঁড়িয়ে দাদু আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছেন যতদূর চোখ যায় যে সবুজ খেত, সব আমাদের জমি,জমি বর্গা হবার পরেও বাবা বলতেন পঞ্চাশ বিঘে জমি আমাদের, বাবা ১৯৮৬ সালেও একার ভাগের ধান বেচেছেন দশ হাজার টাকার আর সেই টাকা পুরোটাই ঠাকুমার হাতে তুলে দিয়েছেন যযার থেকে একশো টাকা ঠাকুমা বাবাকে দিতেন আমাদের জন্য মিষ্টি নিয়ে আসতে,সেই সম্পত্তির ভাগ আমরা নিতে যাইনি বাবার অবর্তমানে, না আমি গেছি, না আমার বোন গেছে। আর মনে পড়ে একবার চলন্ত খড়বোঝাই গরুর গাড়ির সামনে পড়ে গেছিলাম, গাড়োয়ান সাবধান করতে গিয়ে তাঁর হাতের ঘন্টা বাজিয়ে বলেছিলেন, “অ পুঁটি, সৈরে যা লো”, সেটাও ধানাদায়ের জন্য শীতকালেই যাওয়া হয়েছিল, দাদু তাড়াতাড়ি করে এসে কোলে নিয়ে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর আমি ভীষণ রেগে সেই গাড়োয়ানকে বলেছিলাম, “আমি পুঁটি নই, আমার নাম পম্পা”, শুনে দাদু খুব হেসেছিলেন আর অনেকদিন পর্যন্ত আমায় “পুঁটি” বলে ডেকে রাগাতেন।আসলে ওই অঞ্চলে ছোট মেয়ে মাত্রই “পুঁটি” বলার রেওয়াজ আছে।

॥মূল্যবোধ॥

এককাপড়ে তাঁর পিতা তৎকালীন অভিজাত শিল্পপতি ও জমিদার শ্রী শ্রীনাথ চাটুজ্জের অতুল ঐশ্বর্য ছেড়ে মধ্যবিত্ত স্বামী শ্রীমনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন শ্রীমতি মহাশ্বেতা দেবী সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এক জীবনের পথে। ঘটনাটা একটু খুলেই বলা যাক। উত্তরবঙ্গের বৃটিশ কালেক্টর মিস্টার নরম্যান ক্লার্কের বিশেষ বন্ধু ছিলেন কলকাতার ডেপুটি মেজিস্ট্রেট মিস্টার বেনিস ব্লেক। একটি দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তির জন্য মিস্টার ক্লার্ক মিস্টার ব্লেককে অনুরোধ করেন তাঁকে সহায়তা করতে দার্জিলিং আসার জন্য।মিষ্টার ব্লেক তার সহকারী তথা বিশ্বস্ত কর্মচারী শ্রীমনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে আসেন দার্জিলিঙে বন্ধু ক্লার্ককে সাহায্য করতে। সেখানে এসে সেই দেওয়ানী মামলার কাজে তদন্ত করতে গিয়ে মনমোহনের সঙ্গে আলাপ হয় দার্জিলিঙের দক্ষিণ শিবখোলার নিকটস্থ তিনধারিয়া সংলগ্ন অঞ্চলের তৎকালীন জমিদার, অভিজাত সমাজের মধ্যমণি ও ওই অঞ্চলের বেশ কিছু চা বাগানের মালিক শ্রী শ্রীনাথ চাটুজ্জে মহাশয়ের।

এই মামলার কাজের সুবাদে প্রায় বছর খানেক ব্লেক সাহেবের সঙ্গে মনমোহনকেও থাকতে হয় এবং সেই সুবাদে শ্রীনাথ বাবুর কাছে প্রায়শঃই যাতায়াত করতে হত মনমোহনকে। শ্রীনাথ চাটুজ্জে সেযুগে তাঁর একমাত্র কন্যা মহাশ্বেতাকে বাড়িতে গভর্নেস রেখে পড়িয়েছিলেন বহুদিন। মেমসাহেব পিয়ানো টিচার রেখে পিয়ানো আর অর্গান বাজানো শিখিয়ে ছিলেন, ওস্তাদের কাছে শিখিয়ে ছিলেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত,তাঁর মনোগত ইচ্ছে ছিল সৎপাত্র দেখে মেয়েকে পাত্রস্থ করে জামাইকে ঘরজামাই রেখে দেবেন যাতে মেয়ে চোখের আড়াল না হয়। মেয়ে তাঁর প্রাণপ্রিয়, অত্যন্ত আদরের।

তাই মনমোহনের মত সুদর্শন, দৃঢ়চেতা, সৎ, কর্তব্যপরায়ণ এবং দায়িত্বশীল ছেলে দেখে নিজে যেচে সম্বন্ধে করেন মনমোহনের সঙ্গে নিজকন্যা মহাশ্বেতার। অনাথ এবং অভিভাবকহীন মনমোহনও আপত্তি করেননি সুন্দরী শিক্ষিতা মহাশ্বেতাকে বিবাহ করতে। শ্রীনাথবাবুর দার্জিলিঙের পাগলা ঝোড়া সংলগ্ন বিশাল বাগানসহ তিনতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়িতে বিয়ের পরে কয়েকমাস কেটেও যায়, কিন্তু কালেক্টরেটের কাজ শেষ করে যখন ব্লেক সাহেবের সঙ্গে মনমোহনের যাবার সময় উপস্থিত হয়, শ্রীনাথবাবু মনমোহনকে চাকরি ছেড়ে সেখানেই স্থায়ী ভাবে থেকে যাবার প্রস্তাব দেন, কিন্তু মনমোহন সেই প্রস্তাবে অসম্মত হন। তাঁর মতে যে কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের প্রথম পরিচয় তাঁর স্বনির্ভরতা ও আত্মসম্মানবোধ। এর ফলে শ্বশুর-জামাইয়ের সংঘাত উপস্থিত হয় এবং তারই ফলস্বরূপ মনমোহন শ্বশুরালয় ছেড়ে যেতে উদ্যত হলে মহাশ্বেতা দেবী স্বামীকে অনুগমন করে এককাপড়ে বেরিয়ে আসেন স্বামীর হাত ধরে। মহাশ্বেতার কষ্ট হবে তাঁর মত সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনযাপনে মনে করে মনমোহন স্ত্রীকে অনেক বোঝান কিন্তু স্ত্রী তাঁর সঙ্গ নেন। শ্রীনাথবাবু অত্যন্ত ব্যথিত হন মেয়ে জামাইয়ের এহেন আচরণে এবং অসুস্থ হয়ে শয্যা নেন।

মনমোহনের পৈতৃক ভিটে বারাসাতে থাকলেও তিনি কর্মসূত্রে কলকাতায় মেসে থাকতেন। এবারে ফিরে এসে তিনি বালিগঞ্জ এলাকায় বাসা ভাড়া করেন যেখান থেকে তাঁর আলিপুরের অফিসে যেতেও সুবিধে হবে,

কলকাতায় থাকা হবে এবং সময় এগোতে থাকে। সেই সময় মনমোহন বেতন পেতেন নব্বই টাকা কিন্তু বাড়িতে এসে স্ত্রী মহাশ্বেতা দেবীর হাতে দিতেন কখনো পনের টাকা কখনো কুড়ি টাকা, ওই টাকাতেই মহাশ্বেতা দেবীকে সংসার চালাতে হতো। কারণ মনমোহন যেদিন বেতন পেতেন, তাঁর দপ্তরের বাইরে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বিভিন্ন সাহায্যপ্রার্থীরা, কারুর লেখাপড়ার খরচ, কারোর মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা, কারোর বাড়ির অসুস্থ কারুর ওষুধের টাকা, কারুর পরীক্ষার ফিসের টাকা ইত্যাদি খাতে মনমোহনের কাছ থেকে প্রতিমাসে এরা কিছু কিছু টাকা নিয়ে যেত, এবং এই সাহায্যপ্রার্থীদের টাকা মিটিয়ে যে টাকা পড়ে থাকত তাই দিয়েই মহাশ্বেতা দেবীর সংসারের খরচ নির্বাহ করতে হতো।

ক্রমে মনমোহনের সাতটি পুত্র ও চারটি কন্যা সন্তান হয়। সাতটি পুত্রই তাঁদের পিতার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন প্রখর আত্মসম্মানজ্ঞান, চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্তব্যপরায়ণতা আর সততা। ছেলেরা প্রত্যেকেই ছিলেন শিক্ষিত, বিশেষতঃ বড়ো পুত্র পুলিন আর চতুর্থ পুত্র সুবল ছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ডিগ্রির অধিকারী।বড়ো পুত্র পুলিন ছিলেন ব্রিটিশ পুলিশের এন্ডারসন হাউসের ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট, মেজ পুত্র নলিন ছিলেন ডাক্তার, সেজ কুঞ্জ ছিলেন সরকারি চাকুরে, চতুর্থ সন্তান সুবল বা রাসু ছিলেন কলকাতা পুরসভার এসেসর যিনি ঘুষের দফতরের প্রধান হয়েও আজীবন একটা পয়সা ঘুষ নেননি কখনো, পঞ্চম পুত্র বিজন আর ষষ্ঠ পুত্র দ্বারিক ছিলেন গানপাগল, দুজনেই ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী, কিন্তু মা সরস্বতীকে বেচবেন না এই মূল্যবোধে কখনো গান গেয়ে পয়সা রোজগারের চেষ্টা করেন নি আর কনিষ্ঠ পুত্র হারাধন ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মেয়েরা সকলেই সুশীলা, লেখাপড়া জানা এবং সুন্দরী ছিলেন তাই তাদেরও সুপাত্রে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই দান ধ্যানের স্বভাবটির জন্যই কলকাতায় কোনো নিজস্ব বাসস্থান তৈরী করে উঠতে পারেননি। কিন্তু অকৃতদার ষষ্ঠ সন্তান দ্বারিক বাদে প্রত্যেক পুত্রই নিজের নিজের বাড়ি করেছিলেন কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়।

তাই যখন তিনি অবসর নেবার অব্যবহিত পরে মৃত্যুশয্যায়, তখন মহাশ্বেতা দেবী তাঁকে প্রশ্ন করেন, “তুমি আমার জন্য কি রেখে যাচ্ছ?” উত্তরে তিনি তাঁর সাত পুত্রদেরকে দেখিয়ে বলেন, “আমি তোমার জন্য সাতটি রত্ন রেখে যাচ্ছি, আমার অবর্তমানে এরাই তোমার সহায় হবে।” সত্যি কথাই, পিতার অবর্তমানে এই সাত পুত্রই মহাশ্বেতা দেবীর সহায় ছিলেন। ষষ্ঠ পুত্র দ্বারিক ছিলেন অবিবাহিত, তাই তাঁর সঙ্গেই থাকতেন মা মহাশ্বেতা দেবী, কিন্তু তাঁর সব কটি পুত্রই ছিলেন মাতৃভক্ত। যখন তখন যে কোনো প্রয়োজনে মা একবার ডাকলেই পুত্রেরা মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য করতে সর্বদা হাজির। মহাশ্বেতাদেবী নিজেও ছিলেন অত্যন্ত আধুনিকমনস্কা, জ্যেষ্ঠ পুত্র পুলিনের বড়মেয়ের নবছর বয়সে বিবাহের পরে এগারো বছর বয়সে বালবিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসে, মহাশ্বেতা দেবী প্রথম তাঁর পুত্রবধূকে বলেন সেই বালবিধবা মেয়েটির আবার বিবাহ দিতে কারণ সে তো বিবাহের গুরুত্ব বোঝার আগেই তার বিবাহিত জীবনের অবসান হয়ে গেল, কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ তাঁর সে প্রস্তাবে সম্মত হননি এবং আজীবন সেই মেয়েকে বৈধব্য পালনে বাধ্য করেছিলেন।

স্বর্গীয়া শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন আমার মায়ের ঠাকুমা এবং মহাশ্বেতা দেবীর চতুর্থ পুত্র কলকাতা পুরসভার এসেসর স্বর্গীয় শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় মাতামহ, যাঁর সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে

পরে কখনো লেখার ইচ্ছে আছে। স্বর্গীয় শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই মেয়ে কমলা আর নীলিমা আর এক ছেলে পিনাকী, আমি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া নীলিমা চ্যাটার্জীর বড়ো মেয়ে। স্বর্গীয়া শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবী ও তাঁর সন্তানদেরকে আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি এই কারণেই যে ধনী পিতার নয়নের মণি হওয়া সত্বেও কতখানি মানসিক দৃঢ়তা থাকলে নিজে এইরকম সাধারণ জীবন যাপন করেও, হেলায় সব ঐশ্বর্য ছেড়ে এসেও, আজীবন ভাড়া বাড়িতে কাটিয়েও নিজের স্বামীকে শুধু তাঁর সদ্গুণের জন্য চিরকালীন শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে তাঁর আদর্শ নিজের সন্তানদের মূল্যবোধে গভীরভাবে প্রোথিত করে দিতে পারা যায়!!!

॥দেবীপ্রসাদ॥

ষাটের দশকের উত্তরকাশী। একদম নির্জন, অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা সম্বলিত এক অতি প্রাচীন জনপদ গাড়োয়াল হিমালয়ের কোলে। ভাগীরথীর তীরঘেঁষে বসে আছেন দুর্গাদাস। বিষাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসে ভাবছেন নিজের অদৃষ্টের কথা। শান্ত সুন্দর, কাশীরই হিমালয়ের সংস্করণ যেন উত্তর কাশী। এখানে আছে ভাগীরথী, আছে অসি আর বরুণা নদী, আছে বিশ্বনাথের মন্দির, আছে প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও পাঠের সংস্কৃত চতুষ্পাঠী আর আছে হিমালয়ের শৈলশিরা তাদের উত্তুঙ্গ তুষারের মুকুটে আবৃত করে যা উত্তরকাশীকে করেছে শীতল, নির্মল, পবিত্রতায় মোড়া এক ধ্যানগম্ভীর তীর্থক্ষেত্র।

বরুণ পর্বতের পাশে বরুণা এবং অসি নদীর সঙ্গমস্থলে এই শহরের অবস্থান।মূল ভূখণ্ডের অধিকাংশই পাহাড়ি, এবং এই অঞ্চলের উপর দিয়ে উত্তরকাশী জেলার অনেক ছোট এবং বড় নদী প্রবাহিত হয়েছে। যার মধ্যে যমুনা এবং গঙ্গা (ভাগীরথী) সবচেয়ে বড় এবং পবিত্র। এই দুই নদীর উৎপত্তিস্থল যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী (গোমুখ) এই জেলাতেই অবস্থিত। অসংখ্য সাধু সন্ত এখানে বিমুক্তকামী হয়ে সাধনা করেছিলেন আর এখনো করে চলেছেন। পবিত্র এই তীর্থক্ষেত্রকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করে বয়ে চলেছে উত্তরবাহিনী গঙ্গা।এই উত্তরকাশীতেই জ্যোতির্ধামের রাজাকে উত্তরাখণ্ডে বৈদিক ধর্ম পুনঃস্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগের করার উপদেশ দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন আচার্য শঙ্কর। সেখানে ভাগীরথী তীরবর্তী আশ্রমে বসে আছেন তিনি।

সংসারী মানুষ ছিলেন তিনি এই কয়েক বছর আগেও, ছিল পতিব্রতা স্ত্রী, একটি ফুটফুটে কন্যাসন্তান। দারিদ্র ছিল, কিন্তু সংসারে শান্তির অভাব ছিল না। রোজ রাত্রে শুতে যাবার সময় নিজেকে খুব সুখী আর সৌভাগ্যবান মনে করতেন তিনি। সপরিবারে বাস ছিল তাঁর মোক্ষভূমি বারাণসীতে। সারাদিন পরিশ্রম শেষে বাড়ি ফেরার আকুলতা থাকত এক রত্তি ছোট্ট মেয়েটার জন্য। কিন্তু মহামায়া সব সুখ সবার জন্যে লেখেন না। হঠাৎই তিন দিনের জ্বরে মেয়েটা চলে গেল তার দশ বছর বয়সে, মেয়ের শোকে বউও গেল তার ছমাসের মাথায় তাঁকে একেবারে একা করে দিয়ে। যুগপৎ পর পর দুটি শোকে বিহ্বল দুর্গাদাসের আসে জীবনের প্রতি অসম্ভব বীতস্পৃহা। চলে আসেন তিনি হরিদ্বার। সেখানে নিজের জীবন শেষ করতে উদ্যোত হন এবং প্রাণ বিসর্জনের নিমিত্ত দেবপ্রয়াগের গঙ্গার খরস্রোতে ঝাঁপ দিতে যান, কিন্তু মহামায়ার মায়ার জগতে মা মহামায়া তাঁর জন্য কিছু অন্য রকমই নির্দিষ্ট করে রেখে ছিলেন। তাই আত্মবিসর্জনের মুহূর্তে এক সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ান তাঁর সংকল্পের পরিপন্থী হয়ে। সন্ন্যাসী তাঁকে নিয়ে চলেন যোশীমঠে। সেখানে তাঁর দীক্ষা হয় সেই সন্ন্যাসীর গুরু শ্রীযুক্তানন্দ আশ্রমের কাছে। শ্রীযুক্তানন্দ আশ্রম তাঁকে ভার দেন উত্তরকাশীর আশ্রমের তত্বাবধানের। তারপরে কেটে গেছে দীর্ঘ বারোটি বছর।দুর্গাদাস মেয়ের শোক ভুলতে মন প্রাণ ঢেলে দেন মাতৃ আরাধনায়। একসময়ে বেশ কিছুদিন তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা করেছেন, ছিল কবিতা লেখার বাতিকও। সেইসব তাঁর কাছে ফিরে আসতে থাকে নতুন ভাবে, নতুনরূপে। রোজ তিনি রচনা করে চলেন কিছু কিছু কবিতা, কখনো বাংলায়, কখনো হিন্দীতে আবার মাঝে মাঝে লিখে ফেলেন ঊর্দু বয়েৎও। মনেপ্রাণে নিজেকে নিবেদন করেন ইষ্টপদে, সারাদিন সকল কাজের মাঝে তাঁর মনপ্রাণ জুড়ে শুধু চলে অজপা ইষ্ট মন্ত্র জপ। তাঁর ব্রহ্মচর্যের বারো বছর হয় অতিক্রান্ত। তাই

তাঁকে তাঁর গুরু দেন সন্ন্যাস দীক্ষা, নাম হয় শ্রীদুর্গাদাস আশ্রম। দশনামী সম্প্রদায়ের আশ্রম সম্প্রদায় ভুক্ত হন তিনি।

দিন এগিয়ে চলে, প্রায় তিরিশটা বছর তাঁর কেটে গেল এই আশ্রমে, একদিন সকালে এক মাতাজী আসেন তাঁর আশ্রমে, মাতাজীর বয়স চল্লিশের কোঠায়, অনিন্দ্য সুন্দর মাতৃমূর্তি, দুর্গাদাসজীর মনে হয় যেন তাঁর সেই হারিয়ে যাওয়া মেয়ে এসেছে আবার তাঁর কাছে। মাতাজী নিজে নীতিসিদ্ধা ও উচ্চকোটির মহাত্মা, খুবই অল্পবয়সে তিনি অভিষিক্তা হয়েছেন সদ্গুরুর আসনে সন্ত মন্ডলী দ্বারা। মাতাজী স্বয়ং আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ।তিনি দুর্গাদাসজীকে দিলেন যোগদীক্ষা, দুর্গাদাসজীর দেহ অন্তঃস্থিত চক্রে হল জ্যোতি দর্শন, কিন্তু তিনি যে তাঁর ইষ্টমূর্তিকে দর্শনাভিলাষী। তিনি মাতাজীর কাছে জানতে চাইলেন তাঁর কি ইষ্টমূর্তির দর্শন লাভ কপালে নেই। মাতাজী তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন অবশ্যই হবে তাঁর ইষ্টমূর্তির দর্শন, এরপরে তিনি চলে গেলেন তাঁর নিজ আশ্রমে।

সেদিন দুর্গাপূজার মহাষ্টমী, সকালে সেদিন দুর্গাদাসজীর আশ্রমে হবে কুমারী পূজা, সেই মত আশে পাশের জনপদ থেকে এসেছে বহু মানুষ তাদের পরিবার নিয়ে আশ্রম প্রাঙ্গনে। হঠাৎ দুর্গাদাসজীর চোখে পড়ে একটি ছোট্ট মেয়েকে, অপরূপা সেই কন্যাটির সর্বাঙ্গ জুড়ে যেন বিধাতা অকৃপণ হাতে সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে। খুব বেশী হলে মেয়েটির বয়স হবে পাঁচ বছর, গৌরবর্ণার দুপায়ে অলক্ত রঞ্জিত, তিলফুল নিন্দিত নাসিকাটি, কোমল টুকটুকে অধরের বুলি এখনো পরিষ্কার হয়নি। অতো ছোট মেয়েটি এসেছে একদল অচেনা লোকের সঙ্গে পুজো দেখতে। দুর্গাদাসজী নিজের সমস্ত মনের মাধুরী ঢেলে মেয়েটিকে সাজিয়ে বসালেন পুজোর সিংহাসনে কুমারী মাতা রূপে। শুরু হল পূজা, ধূপ দীপ প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো, ধুনো গুগ্গুলের দিব্যগন্ধে যেন সত্যি একটুকরো স্বর্গ নেমে এল আশ্রম প্রাঙ্গনে। দুর্গাদাসজীর চণ্ডীপাঠের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আজ যেন দুর্গাদাসজী নিজের আজ্ঞাচক্রে দর্শন করতে লাগলেন নিজের ইষ্টমূর্তি ওই কুমারী কন্যাটির রূপে। বিভোর হয়ে পূজা করতে করতে এক সময় দুর্গাদাসজী কখন যেন সমাধিস্থ হয়ে বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে গেছেন, দুচোখে অবিরাম ধারায় ঝরে যাচ্ছে অশ্রু, অন্য কোনো এক অতীন্দ্রিয় জগতে যেন তিনি বিচরণশীল তখন। আশ্রমের অন্য সহযোগীরা শেষ করলেন পূজা, তখনো দুর্গাদাসজী সমাধিতে। পূজা শেষে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সকলে আশীর্বাদ নিল সেই কুমারী কন্যার কুমারী মাতা রূপে। সমস্ত লোক আস্তে আস্তে ফিরে যাচ্ছে, কেটে গেছে আরো চারঘন্টা, আস্তে আস্তে ব্যুত্থান হচ্ছে দুর্গাদাসজীর সমাধি থেকে, এমন সময় দুটি কোমল বাহুর বন্ধন অনুভব করলেন দুর্গাদাসজী তাঁর গলায়, চমকে উঠে দেখেন সেই মেয়েটি তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে ডাকছে। তিনি চোখ মেললেন, মেয়েটি তাঁকে বলল যে তার সঙ্গীরা সকলে চলে গেছে, দুর্গাদাসজী কি তাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসতে পারবেন? দুর্গাদাসজী সচেতন হয়ে দেখলেন বেলা পড়ে এসেছে, সূর্যদেব অস্তাচলগামী। তিনি উঠে মেয়েটির হাত ধরে চললেন তাকে এগিয়ে দিতে। লোকালয় ছাড়িয়ে একটি পাহাড়ের বাঁকে গিয়ে মেয়েটি হঠাৎ এগিয়ে গেল, দুর্গাদাসজী ত্রস্তপদে ওর হাতটা আবার ধরতে ওই বাঁক ঘুরে মেয়েটিকে আর দেখতে পেলেন না। অনেকক্ষন খুঁজে মেয়েটিকে না পেয়ে ভগ্নমনে যখন আশ্রমে ফিরলেন তখন তাঁর শরীরের আর শক্তিটুকু অবশিষ্ট নেই। তিনি ভেতরে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজিয়ে বসলেন যখন তখন আবার তাঁর আজ্ঞাচক্রে সেই কুমারী কন্যার দর্শন হল, তিনি উপলব্ধি করলেন তিনি দেবী প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি লিখলেন,

“গৌর বর্ণা কুমারী কন্যা,
আলতা লাগানো ছোট্ট পায়ে,
আয় মা সাজাবো মনের মতন
আমারই পরানে যেমন চায়।
শিশুরূপে ওই মায়ের চরণে,
লুটায়ে রহিব অশ্রু ঝরণে,
লীলাময়ীমা আপন খেয়ালে
করিতে লীলা এসেছে ধরায়।
নয়নে মায়ের বিজুরির জ্যোতি
কন্যার রূপে এলো উমা সতী
মৃণাল বাহুতে কোমল পরশ
অসুরনাশিনী তনয়ে তরায়।”

-সন্ত গুরুদাস আশ্রম রচিত

সমগ্র লেখাটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। বিশেষ কারণে চরিত্রের নাম পরিবর্তিত।

॥মহাজীবনের পথে॥

সময়টা পঞ্চাশের দশকের। সদ্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। চোদ্দ বছরের ছেলে কমলের ম্যাট্রিক পরীক্ষা খুব একটা ভালো হয়নি, ওর ধারণা ও অঙ্কে পাশ করবে না। পিতৃহারা কমল মানুষ হয়েছে তার মামারবাড়িতে, মা আর দাদামশাইয়ের তত্ত্বাবধানে। মা অতিশয় ভক্তিমতী মহিলা। কমল মা অন্তপ্রাণ। মায়ের ইচ্ছে কমল এমন এক মানুষ তৈরী হোক যে থাকবে রাতের অন্ধকার আকাশে তারার মতো দেদীপ্যমান। তাই পরীক্ষা ভালো না হওয়াতে কমল খুব মুষড়ে পড়েছে মনে মনে। থাকে সে হাওড়ায়, মনের দোলাচলে সে ঠিক করতে পারছে না কি করবে।

ঠিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগে আগে একদিন কমল অনেকক্ষন গঙ্গার ঘাটে পা ঝুলিয়ে বসে রইল। তারপরে সন্ধ্যা সমাগত দেখে গিয়ে ঢুকল হাওড়া স্টেশনে আর চড়ে বসল বেনারসগামী একটি ট্রেনে। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল এবং ছুটে চলল রাতের অন্ধকারের বুক চিরে। কমলের পরনে হাফপ্যান্ট আর জামা, পকেটে আছে পনেরটি টাকা। আর কিছু নেই তার সঙ্গে, একেবারে একবস্ত্রে সে বাড়ি ছেড়েছে। সময় মতন ট্রেনে টিকিট চেকার উঠলেন, সকলের টিকিটও দেখলেন, কিন্তু কমলকে যেন দেখতেই পেলেন না, চলে গেলেন অন্য দিকে। কমল খুব অবাক হল বটে আবার নিশ্চিন্তও হল, স্বস্তিতে সেও ঘুমিয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষন বাদে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল। ট্রেন তখন বেনারসে ঢুকছে, সে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল।হেঁটে হেঁটে একে ওকে জিজ্ঞাসা করে গঙ্গার পাড়ে এসে দাঁড়াল, পতিতপাবনী পুণ্যতোয়া গঙ্গার পবিত্র শীতল ধারা নিয়ে মাথায় দিল সে, তারপরে নামল ঠান্ডা জলে স্নান করতে। শীতল জলধারায় স্নান কমলের যাত্রার ক্লান্তি অপনোদন করে দিল।স্নান করতে করতে তার কানে এল ঘাটের কিছু লোকজন আলোচনা করছে এক আশ্রমের ভান্ডারার। সেখানে নাকি আশ্রয় চাইলে আশ্রয়ও পাওয়া যাবে। কমল খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হল সেই আশ্রমে, দেখল লোকে লাইন দিয়ে খাবার নিচ্ছে, সেও নিল। সেই সময় সে লক্ষ্য করল একজন বেশ মাতব্বর গোছের লোক অনেকের সঙ্গেই কথা বলে তাদের থাকার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে আর একজন পালোয়ানের মত চেহারার লোক খেতে দিচ্ছে। পালোয়ানের মত লোকটির কাছে গিয়ে কমল খাবার নিয়ে খেয়ে উঠে গিয়ে সেই মাতব্বর গোছের লোকটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো আশ্রয় প্রার্থী হয়ে, আশ্রয় মিলে গেল। দু' তিন দিন নির্ভাবনায় কেটেও গেল, তারপর একদিন রাত্রে খেয়ে দেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ একটা দম আটকানো অনুভূতি হতে তার ঘুম ভেঙে যেতে সে দেখল যে পালোয়ানের মত লোকটি তার বুকের ওপরে উঠে বসেছে তার গলাটা টিপে ধরে আর সেই মাতব্বর লোকটি তাকে পুলিশের চর মনে করে শাসাচ্ছে যে সে নাকি ওদের আশ্রমের খবর পুলিশকে দেবে বলে এখানে ঘাঁটি গেঁড়েছে, সে যেন পরেরদিন ভোর হবার সাথে সাথে বেনারস ছাড়ে, না হলে আর বেঁচে ফিরবে না সে। প্যান্টের ভিতরের পকেটে তার বারোটা টাকা ছিল, সেটাও ওরা বের করে নিয়েছে। এতো সত্যি সত্যি "শিবঠাকুরের আপন দেশে নিয়ম কানুন সব্বোনেশে হয়ে গেল ব্যাপার।"

কমল খুবই হতোদ্যম হয়ে সেই আশ্রম ছাড়ল, আবার সে উঠে বসল হরিদ্বারগামী একটি ট্রেনে আর পরেরদিন যখন হরিদ্বারের কাছে ট্রেন, তখন কমল ট্রেনে বসে দেখল দূরে আবছা হিমালয়ের পর্বতশ্রেণীর আভাস দেখতে পাচ্ছে সে। সে আশে পাশের লোকজনের কথা শুনে বুঝল ট্রেন হরিদ্বারে ঢুকছে। ট্রেন হরিদ্বারে থামল, সে ট্রেন

থেকে নেমে পড়ল। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল ক্রমে অপসৃয়মান ট্রেনটার দিকে, তারপরে সে বাইরে এলো।

বাইরে এসে সে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে উপস্থিত হল গঙ্গার ধারে। গঙ্গাতটে দাঁড়িয়ে আশে পাশের প্রাকৃতিক শোভায় তার মন ভরে গেল, মনসা পাহাড়ের মাথায় মনসা মন্দির, চণ্ডী পাহাড়ের চণ্ডী মন্দির, অদূরে হিমালয়ের শৈল শিখর আর মহাদেবের জটা থেকে নিঃসৃত পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গার স্বতঃ প্রবাহিত শীতল পবিত্রধারা মিলে হরিদ্বার সত্যই দেবতাত্মার প্রবেশদ্বার। তারপরে হাঁটতে হাঁটতে "হর কি প্যারি"র ঘাটের সিঁড়িতে গিয়ে বসল। সারাটা দিন অভুক্ত অবস্থায় তার কেটে গেল ওই ঘাটে, সে খেয়াল করল উল্টোদিকের তটে গঙ্গার অপর পাড়ে রক্তাম্বর পরিহিত এক সন্ন্যাসী বসে আছেন সকাল থেকে, তাঁর চিমটে, ত্রিশূল আর ঝোলাটা পাশেই নামানো রয়েছে আর তিনি নিমীলিত নেত্রে ধ্যান মগ্ন। দুপুরের দিকে সে আস্তে আস্তে উঠে গঙ্গার অন্য তীরে গিয়ে দাঁড়াল পায়ে পায়ে, মন তার খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে কাল রাত্রের ঘটনায়। তারপরে সে চলতে আরম্ভ করল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। সেই রক্তাম্বর পরিহিত সন্ন্যাসীর পাশ দিয়ে একটু এগিয়ে যাবার পরে সে শুনল কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। সে কিছুটা বিস্মিত হলেও এগোতে যাবে এমন সময় সে শুনল কেউ বলছে, “এ বাঙালি ভূত,তেরা নানা বহুত ভারি খোঁজ লাগায়া রে তেরে লিয়ে। কাল রাত কয়সা সাধুসঙ্গ হুয়া রে তেরা?” কমল খুবই অবাক হয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখে সেই রক্তাম্বর পরিহিত সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন আর হাত নেড়ে তাকে কাছে ডাকছেন। সে কাছে যেতে তিনি আবার তাকে ওই একই কথাগুলো বললেন, বলে বললেন, “মুঝে আজহি তুরন্ত ইঁহা আনা পড়া তেরে লিয়ে, তু চল মেরে সাথ।” এই বলে এগিয়ে এসে ছোট্ট কমলের হাতটা ধরলেন, কমল অবাক হয়ে দেখল সন্ন্যাসী প্রায় সাত ফুট লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ, শ্বশ্রুগুম্ফ সম্বলিত প্রশান্ত মুখমন্ডল। কমলের মনে তখন তোলপাড় চলছে তার দাদামশাই তার খোঁজ করছেন এবং তার মা চিন্তিত হয়েছেন সেই সংবাদটি জেনে, আর এই সন্ন্যাসী তার নাম, তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া গতকাল রাত্রের ঘটনা কিভাবে জানলেন এইসব চিন্তায় সে স্তম্ভিত। সে তো কাউকে কিছুই বলেনি এই বিষয়ে। সন্ন্যাসী তার করতলটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছেন গঙ্গার তটরেখা ধরে ততক্ষনে। হাঁটতে হাঁটতে দিনের আলোর শেষ রেশটুকু যখন মুছে যাচ্ছে সন্ন্যাসী ঋষিকেশের কাছে এক জায়গায় থামলেন, থেমে তাঁর ঝোলা থেকে তাঁকে গরম পুরি তরকারি খেতে দিলেন। সে ক্ষুধার্ত আর ক্লান্ত ছিল, তায় পরপর তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার অভিঘাতে বিমূঢ় ছিল,খেয়ে নেবার পরে সে গঙ্গার ঘাটেই ঘুমিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর আসনের পাশে। পরেরদিন দিন ঘুম ভাঙার পরে আবার চলতে শুরু করল তারা, তৃতীয় দিনে তারা গিয়ে পৌঁছল বদ্রীনারায়ানের নিকটবর্তী ব্যাসপীঠে, যেখানে এই সন্ন্যাসীর ডেরা। সন্ন্যাসীর ডেরাতে পৌঁছে কমল দেখল আরো কয়েকজন রয়েছে সেখানে আর জানতে পারল সন্ন্যাসী হলেন জীবন্মুক্ত নিত্যসিদ্ধ হঠযোগে ও লয়যোগে সিদ্ধযোগী ব্রহ্মানন্দ পরমহংস, যাঁকে সবাই যোগীবাবা বলে সম্বোধন করে।

ব্যাসপীঠে আসার কিছুদিনের মধ্যে যোগীবাবা কমলকে দীক্ষা দিলেন এবং সাধনার বিভিন্ন পদ্ধতি রপ্ত করাতে শুরু করলেন। আশ্রমের রোজের কাজকর্মের দায়িত্ব যেমন রান্না, দূরের পাহাড়ে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করা, জল আনা ইত্যাদি কাজ অন্যসব গুরুভাইদের সঙ্গে সঙ্গে কমলের ওপরেও ন্যস্ত ছিল। কমল খুব দ্রুত তার সাধনার স্তর গুলি অতিক্রম করতে লাগল। হিমালয়ের ব্যাসপীঠের ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ, নীলকণ্ঠ পর্বতের তুষারধবল

শৃঙ্গ, পারিপার্শ্বিকের অটল নৈঃশব্দ আর সর্বোপরি সদ্গুরু যোগীবাবার নিয়ত সান্নিধ্য ও পথপ্রদর্শন কমলকে অচিরেই এক মহাজীবন আস্বাদনের যাত্রী করে তুলল। দেখতে দেখতে চোদ্দ বছর অতিক্রান্ত হল তার ব্যাসপীঠে, এই চোদ্দ বছরে কমল অনুভব করল যে যোগীবাবা যেন তার একাধারে মাতা, পিতা, সখা, গুরু এবং তার ইহকাল পরকালের একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠেছেন। টানা চোদ্দ বছর সাধনা করে কমল সিদ্ধিলাভ করল, এখন তার নাম হল শ্রীকেবলানন্দ পরমহংস। যোগীবাবা তার সাধনা কালীন সময়ে বিভিন্ন রকম ভাবে পরীক্ষা নিয়ে দেখে নিয়েছিলেন তার আধারটি সাধনার জন্য কতখানি উপযুক্ত এবং সে কতটা গুরুগতপ্রাণ।

এবার যোগীবাবা কমলকে পাঠালেন পরিব্রাজনায়, তার আগে অবশ্য কমলকে যোগীবাবা পাঠিয়েছিলেন তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। মা ভীষণ অসুস্থ ছিলেন তখন, ছেলেকে ফিরে পেয়ে তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। যে অঙ্ক পরীক্ষা খারাপ হয়েছে মনে করে কমল গৃহত্যাগ করেছিল, দেখা গেল সেই অঙ্কতে কমল লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কিন্তু আশুতোষ কলেজে ভর্তি হয়ে কিছুদিন ক্লাস করার পরে কমল যোগীবাবার নির্দেশে বেরিয়ে পড়ে পরিব্রাজনে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ সে এইভাবে তিনবার ভ্রমণ করে। কয়েকবছর পরে কমলের ক্রিয়াযোগে দীক্ষা হয়, সে আত্মদর্শন করে নিজের সৎচিদানন্দময় আত্মার দর্শন লাভ করে, নিজের স্বরূপ জেনে আরো কিছুবছর সাধন করে সিদ্ধি লাভ করে আপ্তকাম হয়। এরপরে সে তান্ত্রিক দীক্ষা নিয়ে তন্ত্র সাধনা করে কালের নিয়ন্ত্রণকারী মা কালীর দর্শন ও বরদানে ধন্য হয়। এইভাবে এক সাধারণ ঘরের সাধারণ ছেলে কমলের জীবন থেকে মহাজীবনের পথে ঘটে উত্তরণ। সে আমৃত্যু লোকহিতের ব্রত নিয়ে লোককল্যাণের নিমিত্ত নিজের জীবন উৎসর্গ করে। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলে কমল হয়ে ওঠে মহাত্মা কেবলানন্দ পরমহংস যে হয়ে ওঠে বহু অনাথ, আতুর, জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষুর আশ্রয়স্থল।

॥যোগশাস্ত্র প্রণেতা॥

কথায় বলে, "গুরু ঘাঁটিয়ে বিদ্যে পায়, আর রাখাল ঘাঁটিয়ে টাকর (গালাগালি) পায়।" পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার সংযোগ এই দেহভান্ডটির মাধ্যমে যে উপায়ে সম্ভব, তার অন্যতম পন্থা যোগশাস্ত্র।ঈশ্বরকৃপা, আত্মকৃপার পরে গুরুকৃপায় মানুষ লৌকিক জীবন থেকে মহাজীবনে উন্নীত হতে পারে সেই গুরুকৃপার সঙ্গে যৌগিক শাস্ত্র করায়ত্ত করতে পারলে।ভারতীয় যোগশাস্ত্রের ইতিহাসে অমলিন অবদান রেখে যাওয়ার জন্য আমরা ঋণী যাঁর কাছে তিনি মহর্ষি পতঞ্জলি, যাঁর সম্পর্কে আমাদের ভারতবাসী হিসেবে জানা আবশ্যক।

খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতকে শিক্ষাক্ষেত্রে তক্ষশীলা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৭০০ শতক থেকে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তক্ষশীলার ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ব্রহ্মদত্ত, কৌটিল্য, পাণিনি, যিবেক ও পতঞ্জলি'র মত মহান পণ্ডিতগণ তক্ষশীলায় অধ্যয়ন করতেন। এদের মধ্যে পতঞ্জলি ছিলেন ভারতীয় যোগ দর্শনের প্রবর্তক, মহান দার্শনিক, ব্যাকরণবিদ ও বিজ্ঞানী। তিনি ছিলেন 'যোগশাস্ত্রে'র স্রষ্টা। হিন্দু যোগ দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ 'যোগসূত্র'র সংকলক ছিলেন পতঞ্জলি। মহাভাষ্য (পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী-এর উপর রচিত কাত্যায়নের বৃত্তিকার টীকা) গ্রন্থেরও রচয়িতাও তিনি। দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয় নগরের রাজা বীরবাক্কুর প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন এই পতঞ্জলি। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'মাধব নিদান।' রোগ নির্ণয়ের জন্য এই গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে।

বহু দিন আগে, এক সময় সমস্ত মুনি ও ঋষিরা ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এই কথা বলার জন্য যে, যদিও তিনি (ধন্বন্তরী অবতার) আয়ুর্বেদের মাধ্যমে অসুখ নিরাময়ের উপায় দিয়েছেন, তবুও মানুষ অসুস্থ হয়। তাঁরা এও জানতে চেয়েছিলেন যে যখন মানুষ অসুস্থ হয় তখন কি করা উচিত।

শুধু শারীরিক অসুস্থতাই নয়, কখনও কখনও ক্রোধ, লালসা, লোভ, ঈর্ষা ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন মানসিক আবেগজনিত অসুস্থতাও নিরাময়ের প্রয়োজন হয়। এই সব অশুদ্ধি থেকে একজন কিভাবে মুক্তি পেতে পারে? এর উপায় কি?

ঋষিরা যখন তাঁর কাছে নিজেদের বক্তব্য পেশ করলেন, তিনি আদিশেষ/শেষনাগ/অনঙ্গদেবকে (সচেতনতার প্রতীক), তাঁদের কাছে পাঠালেন, যিনি পৃথিবীতে মহর্ষি পতঞ্জলি হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এযুগে মহাত্মা রামঠাকুরের গুরু ছিলেন অনঙ্গদেব এবং রামঠাকুর স্বয়ং ছিলেন সেই গুরুর আরেকটি সত্তা।

যোগ দর্শনের প্রবর্তক পতঞ্জলির প্রদর্শিত মার্গ 'পাতঞ্জল দর্শন' নামে পরিচিত। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের চারটি পাদ। প্রথম পাদে আলোচিত হয়েছে যোগের লক্ষণ ও সমাধি। দ্বিতীয় পাদে সমাধি লাভের পূর্বে অনুসরণীয় ব্যবহারিক যোগ এবং যম, নিয়ম, আসন ইত্যাদি যোগাঙ্গের কথা বা অষ্টাঙ্গ যোগের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পাদে ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও এসবের ফল এবং বিভূতি বা ঐশ্বর্য আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ পাদে পাঁচ

প্রকার সিদ্ধি ও পরা প্রয়োজন কৈবল্যের আলোচনা করা হয়েছে। এইভাবে পতঞ্জলি পৃথিবীতে আসেন যোগের জ্ঞান দান করার জন্য। এই জ্ঞানই 'যোগসূত্র' নামে পরিচিত।
জানা যায়, পতঞ্জলি বলেন ১০০০ মানুষ একত্রিত না হলে তিনি 'যোগসূত্র' আলোচনা করবেন না। সুতরাং সহস্র মানুষ তাঁর জ্ঞান শোনার জন্য বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণ দিকে একত্রিত হলেন। পতঞ্জলির আরেকটি শর্ত ছিল, তাঁর ছাত্রদের ও তাঁর মধ্যে একটি পর্দা রাখতে হবে। ছাত্রদের কেউ সেই পর্দা তুলতে পারবে না। তিনি যতক্ষণ না জ্ঞান দান শেষ করছেন, সবাইকে কক্ষে উপস্থিত থাকতে হবে।

পতঞ্জলি পর্দার আড়ালে থেকে ১০০০ মানুষকে জ্ঞান দান করছেন, প্রত্যেকের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চারিত হচ্ছে!

এ এক বিস্ময়কর তত্ত্ব, এমন কি ছাত্ররাও বিশ্বাস করতে পারছিল না কি করে তাদের এই জ্ঞান লাভ হচ্ছে। কি করে গুরু পর্দার আড়ালে থেকে একটি শব্দ উচ্চারণ না করে প্রত্যেকের মাঝে এই জ্ঞানের উপলব্ধি ঘটাচ্ছেন তা তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না।

প্রত্যেকে বিস্ময়ে বিহ্বল অবস্থায় এক অদ্ভুত অনুভব প্রাপ্ত হল। প্রত্যেকে এমন এক অদম্য শক্তি, এমন এক অভাবনীয় উৎসাহ অনুভব করছিল যে তারা স্থিরভাবে তা ধারণ করতে পারছিল না। কিন্তু তাদেরকে নিয়ম বজায় রাখতে হবে।

একটি ছোট ছেলেকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয়েছিল। তাই সে স্থান ছেড়ে চলে যায়। সে মনে মনে ভাবল যে, সে যাবে এবং নিঃশব্দে ফিরে আসবে। আরেক জন কৌতুহলী হয়ে উঠল-"পর্দার আড়ালে গুরুদেব কি করছেন? আমি দেখতে চাই।"

এখানে গুরু যে চোখের সামনে না থেকেও তাঁর জ্ঞান শিষ্যদের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন, তা তিনি প্রত্যেকের আত্মার সঙ্গে নিজ আত্মার আত্মিক সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। আর মাঝখানের পর্দাটি হল অজ্ঞতার পর্দা। ঘরের মধ্যে উপস্থিতি মানে আত্মার সঙ্গে আত্মার সংযোগ রক্ষা করা।

একটি ছাত্র আর ধৈর্য রাখতে না পেরে পর্দাটি তুলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই ছাত্রটিসহ বাকি ৯৯৮ জন ছাত্র ভস্ম হয়ে যায়, মহর্ষি পতঞ্জলি খুবই দুঃখিত হন, যেখানে তিনি সারা বিশ্বকে জ্ঞান দানে রাজি ছিলেন, সেখানে তাঁর সমস্ত ছাত্র ভস্মীভূত হয়ে গেল। আধার উপযুক্ত হবার আগে যদি জ্ঞান ও সাধনা বেশী হয়ে যায়, তবে আধারের দেহ নাশ হয়।

এমন সময় সেই ছোট ছেলেটা ফিরে এল, মহর্ষি তাকে জিজ্ঞেস করলেন সে কোথায় গেছিল। ছোট ছেলেটি তাঁকে বলল যে সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গেছিল এবং তার এই না অনুমতি নিয়ে বেরোনোর জন্য মহর্ষি যেন তাকে ক্ষমা করে দেন। মহর্ষি স্বস্তির সঙ্গে ভাবলেন যে একজন অন্তত রয়েছে যাকে তিনি যোগের সূত্রগুলোর বিষয়ে তাঁর জ্ঞান দান করতে পারবেন, তিনি সেই ছেলেটিকে সমস্ত জ্ঞান দান করলেন। কিন্তু জ্ঞানলাভের শেষে

ছেলেটিকে বললেন যে যেহেতু সে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগের পদ্ধতির জ্ঞান লাভ করার সময়ে গুরুর অনবধানে বারণ সত্বেও কক্ষ ত্যাগ করেছে, তাই সে নিয়ম ভেঙেছে, ফলে সে ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে গাছে ঝুলে থাকবে আর এই অভিশাপ থেকে সে তখনি মুক্তি পাবে যখন সে এই জ্ঞান একজন শিষ্যের মধ্যে সম্যক ভাবে প্রদানে সমর্থ হবে। এই বলে পতঞ্জলি দেব অদৃশ্য হলেন।

ব্রহ্মরাক্ষস গাছে ঝুলে রইল, যে গাছের তলা দিয়ে যায়, তাকে সে একটা করে প্রশ্ন করে, তারা উত্তর দিতে অপারগ হয় আর সে তাদের খেয়ে ফেলে, এছাড়া তার আর কোনো রাস্তা নেই, এইভাবে তার কয়েক হাজার বছর কেটে গেল। সে এই সময়ের মধ্যে একজনকেও পেল না যাকে সে যোগসূত্রের জ্ঞান দান করতে পারে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যখন বিপথগামী হন, তখন সে একজন সাধারণ দুষ্কৃতীর চেয়ে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর হন। এইভাবে ব্রহ্মরাক্ষস গাছে ঝুলে থেকে মুক্তির প্রতীক্ষা করতে রইল।

দয়াপরবশ হয়ে শেষে মহর্ষি পতঞ্জলি আবার নিজেই জন্ম নিয়ে এলেন তার কাছে শিষ্য হয়ে এবং ব্রহ্মরাক্ষস তাঁকে যোগসূত্রের পূর্ণজ্ঞান দান করলেন। শিষ্যরূপী পতঞ্জলি তা কয়েকটি তালপাতায় লিখে রাখলেন। শিষ্যকে মুক্তি দিতে গুরু তাঁর শিষ্যের শিষ্য হলেন।পতঞ্জলি সূত্রগুলি গাছের মগডালে বসে লেখেন যেহেতু ব্রহ্ম রাক্ষস ওখানেই থাকে এবং ওখানে বসেই সূত্রগুলি বিবৃত করে।ব্রহ্ম রাক্ষস রাত্রে তাঁকে বলেন আর পতঞ্জলি তা পাতায় লেখেন। প্রতিদিন তিনি কিছু পাতা তুলে আনেন, দেহের কোন জায়গায় কেটে রক্ত বের করে তাই দিয়ে লিখে রাখেন।এইভাবে সাতদিন ধরে লিখে সমস্ত জ্ঞান আহরণ করে তিনি ক্লান্ত হয়ে গেলেন। সব লেখা শেষ হলে তিনি সব পাতাগুলোকে একটুকরো কাপড়ে বেঁধে গাছের তলায় রেখে নদীতে গেলেন স্নান করতে।যখন তিনি ফিরে এলেন, দেখলেন যে একটা ছাগল ওই পাতাগুলোর বেশিরভাগটাই খেয়ে ফেলেছে।ছাগলটি এখানে মায়ার প্রতীক যার বশে আমাদের জ্ঞানের দীপ্তি অনেকটাই ঢেকে যায়।উপযুক্ত স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করে জ্ঞান অরক্ষিত রাখা অনুচিত।পতঞ্জলি কাপড়ের ঝোলটির মধ্যে বেঁচে যাওয়া পাতাগুলি নিলেন এবং ওখান থেকে চলে গেলেন। এখানে এই পাতাগুলি জ্ঞানের প্রতীক যে জ্ঞান একসঙ্গে পুরোটা ধারণ করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। গল্পটি পুরাণের, গল্পটির অন্তর্নিহিত গভীরতা আছে যা পুরাণ ব্যাখ্যা করে না, পাঠকের চিন্তা শক্তির ওপরে ছেড়ে দেয় তার রহস্য উদ্ধার করতে।

পতঞ্জলির সংজ্ঞানুসারে ‘যোগ’ মানে হল মনের পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করা। বিভিন্ন ধরণের যোগ থাকলেও, প্রত্যেক ধরণের যোগের উদ্দেশ্যই হল মনকে নিয়ন্ত্রণ বা বশ করা। ‘যোগ’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ ‘ইউয্’ থেকে। যার মানে হল একত্রিত করা- আত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগ। পতঞ্জলি যোগ দর্শনকে বাংলায় ব্যাখ্যা করেছেন অনেকেই, কিন্তু প্রাঞ্জল সাবলীলভাবে যৌগিক ব্যাখ্যা করেছেন ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব এবং শ্রীমৎ হরিহরানন্দ গিরি। এঁদের দুজনেরই ব্যাখ্যা সাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব যদিও মূল বিষয়টি গুরুকৃপাতেই বোধের স্তরে আসে। কারণে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করে অতীন্দ্রিয় স্তরে উন্নীত হতে হয় আর সেই অতীন্দ্রিয় অনুভব গুরুকৃপা ভিন্ন অধরাই থেকে যায়, কারণ সদ্গুরু আসেন সাধারণকে উদ্ধার কল্পে সাধনা করিয়ে নিয়ে মোক্ষ প্রদান কার্যে, যাঁকে ঈশ্বর স্বয়ং চাপরাশ দিয়ে প্রেরণ করেন। তাই সর্ব স্তরেই "গুরু কৃপাহি কেবলম।”

"গুরু পরম ধন অমূল্য রতন
রাখরে হৃদয়ে ধরি করি সযতন।”-শ্রীশ্রী মা সর্বাণী

BANGLADARSHAN.COM

॥সায়াহ্নের অনুভব॥

নর্মদার দক্ষিণতট ধরে হেঁটে চলেছে নর্মদা মায়ের পরিক্রমাকারী সুশান্ত। সেই সকাল নটায় স্নান পূজা সেরে বাল্যভোগের প্রসাদ পেয়ে বেরিয়েছে সে। মা নর্মদার নাম মুখে নিয়ে আর মা নর্মদার প্রতি ভক্তি বুকে নিয়ে পথ চলতে চলতে সবে বেলা তিনটেয় এসে সে পৌঁছল নর্মদাতট সংলগ্ন শঙ্করভারতীজীর মাধবপুরের নির্মীয়মান আশ্রমে। মধ্যপ্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল এই মাধবপুর। জবলপুর-অমরকণ্টক রোডের ধার ঘেঁষে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছলে শঙ্করভারতীজী তাকে সাদরে তাঁর আশ্রমে থাকতে অনুরোধ করলেন। ভারতীজীর মতে "সেবাই পরম ধর্ম", উনি এই মতে বিশ্বাসী। মানবশরীর পঞ্চভূতে সৃষ্ট, তাই তার সেবাই পঞ্চভূতের সাধনা। সুশান্ত নর্মদার পুণ্য স্রোতে অবগাহন করে পূজা সেরে আহার গ্রহণ করল। তারপরে এসে বসল একাকী এই মা নর্মদার কোলধৌত করা ঘাটের সিঁড়িতে। কার্তিকের বেলা, বিকেল পাঁচটাতেই আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামছে, পশ্চিম দিগন্তে আবিরের লালিমা ছড়িয়ে পাটে বসেছেন মার্তন্ডদেব। পূর্ব দিগন্তে সদ্য গত পূর্ণিমার চাঁদের আভাস সুস্পষ্ট। ক্লান্ত বিহগকুল ফিরছে তাদের কুলায়। নদীর অপর পাড়ে একটি দুটি করে দীপের আলো দৃশ্যমান। এপারেও মন্দিরে মন্দিরে ঘন্টাধ্বনি আর ধূপদীপের গন্ধে সন্ধ্যা সমাগমের বার্তা ঘোষিত হচ্ছে।ডিঙি নৌকোগুলো জলের স্রোতে আর বাতাসে একটু একটু করে দুলছে। ঘাট প্রায় জনশূন্য।

BANGLADARSHAN.COM

সূর্যের আলোর রেশ মুছে যেতেই জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হল চরাচর। সুশান্ত যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছে। মন্দিরের আরতির ঘন্টাধ্বনি আর সন্ধ্যারতির বিরতি ঘটতেই অপার নৈঃশব্দে ডুবে গেল সম্পূর্ণ বাতাবরণ। নর্মদার পুণ্যধারার কুলুকুলু ধ্বনি ব্যতীত আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। বহুদূরের কোনো মন্দির থেকে ভেসে আসছে অস্পষ্ট স্তোত্র পাঠের আওয়াজ। হঠাৎই টি টি করে ডাকতে ডাকতে চলে গেল কোনো রাতচরা পাখি। কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ জ্যোৎস্নালোকে নদীর জল, গাছের পাতা, পার সংলগ্ন মন্দির, সাধুদের কুঠিয়া এখন স্পষ্ট দৃশ্যমান, কিন্তু নির্জন তটে একটি দুটি মানুষ, কিছু সারমেয় আর কয়েকটি নিশাচর প্রাণী ছাড়া কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

সুশান্ত নিজের মধ্যে নিজে ডুবে গেছে। নদীর জলের স্রোতের দিকে চেয়ে ভাবতে চেষ্টা করছে একমাস আগে এইরকম সন্ধ্যায় সে কোথায় বসে কি করছিল সেই কথা। অকৃতদার সুশান্ত পরিবারের বড়ো, তার পরে দুটো ছোট বোন, লেখাপড়ায় সে বরাবর ভালো, কিন্তু তাও কলেজের শেষ পরীক্ষাটা সে দিল না ঘর ছাড়ার নেশায়। গেল বেনারস, সেখানে মন টিকলো না, গেল হরিদ্বার, সেখানে এক উচ্চকোটির মহাত্মা তাকে আশ্রয় দিলেন। দীক্ষা হল, হঠযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ আয়ত্ত হল তার, এমন সময় সেই গুরুদেব দেহ ছাড়লেন। সুশান্তর মন আর ওখানে টিকলো না, তন্ত্র সাধনা করবে বলে তারাপীঠে কিছুদিন রইল, সেখান থেকে বক্রেশ্বরে এসে তান্ত্রিক গুরু লাভ হল, সাতবছর তান্ত্রিক অভিচারিক ক্রিয়া করে সাধনায় বেশ উন্নতি করছিল, এমন সময় সংসারের দায়িত্বের জন্য বাড়িতে ফিরতে হল।

বাড়িতে ফিরে চাকরি নিল সে, একে একে বোনেদের বিয়ে হয়ে সংসারে থিতু হল তারা, বাবা মারা গেলেন, নিজের সব টাকাপয়সা দিয়ে মায়ের ব্যবস্থা করে বোনেদের হাতে মায়ের দেখাশোনার ভার দিয়ে সে ঠিক করল

নর্মদা পরিক্রমা করবে। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে অমর কন্টকে পৌঁছে শুনল আগামী দেড়মাস চাতুর্মাস্য থাকায় পরিক্রমা বন্ধ আপাতত। হঠাৎই কাকতালীয় ভাবে সেখানকার এক মাতাজী তাকে তাঁর আশ্রমে এই দেড়মাসের জন্য আশ্রয় দিলেন কিছু শ্রমের বিনিময়ে,সে রাজি হল। গতমাসে সেই মাতাজীর আশ্রমেই সে ছিল, কপিলধারা, মা কি বাগিয়া, দুধধারার আশে পাশে সাধু সঙ্গে তার সময় কেটেছে। তারপরে পরিক্রমা শুরু হতেই সে পরিক্রমাকারীর দলে নাম লিখিয়ে আজ দিন দশেক ধরে হেঁটে এই মাধবপুরে পৌঁছেছে।দৈহিক ক্লেশ তার মনকে প্রভাবিত করতে পারছে না আর তাই পায়ের ফোস্কা, কেটে যাওয়া সত্ত্বেও মনের ঐশ্বর্যের জোরে সে এই তাপ সহনের তপস্যায় এগিয়ে চলেছে। এই চলা নিজের আত্মচেতনের ব্রত পালন, এই পরিক্রমণ নিজের মোক্ষের পথের দ্বারের দিকে এগোনো। মা নর্মদার দর্শনেই যে মুক্তি সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে এই কদিনে।

মন তার এই কদিনেই যেন কোন এক অতীন্দ্রিয় জগতে ঘুরছে। শরীরটা তার নর্মদার নির্মল ধারায় স্নান করছে, একনিষ্ঠ হয়ে পূজাপাঠ করছে কিন্তু মনটি ভরে আছে অপার অনাবিল প্রশান্তিতে। সে অনুভব করছে, "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে"। তারও যে জগতের আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রণ রয়েছে এই উপলব্ধিটি তাকে পথ চলার অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। মা নর্মদার দিব্য উপস্থিতিতে সে পথ হারিয়েও আবার সঠিক পথে এসে উঠেছে বহুবার।মনের গহীনে ডুবে গিয়ে এই আত্মিক অনুভবটি বেশ নিবিড় হয়ে ছেয়ে গেছে যখন অন্তঃস্থলে, ঠিক সেই সময়ে কাঁধে একটা হাতের স্পর্শে তার চমক ভাঙলো। শঙ্করভারতীজী তাকে ডাকতে এসেছেন রাত্রির শয়নকাল সমাগত দেখে। জ্যোৎস্নার আলোকরাশি মাঝে সোমদেবকে মধ্য গগনে বিরাজ করতে দেখে সুশান্ত বুঝল বেশ রাত হয়ে গেছে। সে শঙ্কর ভারতীজীর সঙ্গে আশ্রম সংলগ্ন তার জন্য নির্দিষ্ট শয্যায় গিয়ে নিদ্রাদেবীর কোলে নিজেকে সমর্পন করল। মনে বাজতে রইল কবীরজীর ভজনের কটি চরণ,

BANGLADARSHAN.COM

“রাম জপ জিয়া আইসে আইসে,
ধ্রুব প্রহ্লাদ জপিয়ে হরি যায়সে,
দিন দয়াল ভরোসে তেরে,
সব পারিয়ার চড়াইয়া বেরে।”

॥আগুন পাওয়া॥

ক্লাস নাইনে পড়ার সময় কাকার একসময়ের সহকর্মী রায়কাকুর ছোট ছেলেকে বাপি একদিন নিয়ে এল আমাদের বাড়িতে। শ্রীকাঞ্চনকুমার রায়,আমারই বয়েসী ছেলেটা, নিজেদের বোলপুরের কাছে বাহেরির বাড়ি ছেড়ে দূর্গাপুরে রায়কাকুর কাছে এসেছে তখন সবে, শিবাজী বয়েজে ভর্তি হয়েছে। রায়কাকু তখন টাউনশিপ মেন্টেনেন্স অফিসে আছেন, কোয়াটার পাননি তখনো, বেনাচিতিতে ভাড়া বাড়িতে থাকেন। অচিরেই কাঞ্চন আমার বন্ধু হয়ে গেল, ভীষণ খোলা মনের ছেলে আর ভীষণ ভালো সেন্স অফ হিউমার ওর। আমাদের বাড়িতে কাঞ্চন একদম পরিবারের একজন হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। সকাল, বিকেল, সন্ধ্যে, রাত্রি যে কোনো সময় ও সময় পেলেই চলে আসত, আমার মা ওকে খুবই স্নেহ করতেন। এখনো মনে পড়ে, দুপুরে আমাদের ডাইনিং টেবিলে আমি খাবার জায়গা করছি, হঠাৎ দরজায় ধাক্কা, খুলে দেখি কাঞ্চন। মা ওকে দেখেই আমায় বলতেন,'ওরে ওরও থালাটা দে, খেয়েদেয়ে রোদ পড়লে বিকেলের দিকে যাবে ‘খন।’ আমরা একসাথে সবাই মিলে, মানে মা, বাবা, বোন, আমি আর কাঞ্চন, খেয়ে উঠলাম, বাইরের ঘরের খাটে বসে ওর সাথে কিছুক্ষন আড্ডা মারলাম, তারপর ও একটু গড়িয়ে নিল, আমিও মায়ের কাছে এসে গড়িয়ে নিলাম, বিকেলে পাড়ার রঞ্জিতের দোকানের চপ, জিলিপি আনা হল, চপ জিলিপি আনতে কাঞ্চনও গেল আমার সাথে,মুড়ি আর চা সহযোগে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা হল সবাই মিলে গল্প করতে করতে। তারপরে ও ওর বাড়ি গেল।ও বলত মুড়ি আর চপ জল দিয়ে লঙ্কা দিয়ে মেখে খেতে সবচেয়ে ভালো লাগে।

BANGLADARSHAN.COM

কখনো পড়ার কোনো বিষয়ে দুজনে বসে সারা সন্ধ্যে আলোচনা করেছি, এতো সাবলীল, সচ্ছন্দ ওর ব্যবহার ছিল যে কোনোদিন ওকে পর ভাবতেই পারিনি। ইলেভেনে আমার সঙ্গে ও বাসুদেব হাজরা স্যারের কাছে ইংলিশ টিউশন নিতো। রহিম পথে স্যারের বাড়িতে যেতে গেলে একটা অন্ধকার মাঠ পড়ত যেটাতে কিছু বাজে ছেলেদের আড্ডা ছিল, আমি একা মেয়ে ছিলাম স্যারের ওই ব্যাচে, ওই ছেলেগুলো বিরক্ত করত আমাকে, কাঞ্চন আমাকে একদম এসকর্ট করে নিয়ে যেত, নিয়ে আসত, তখন ওরা সেকেন্ডারির ভেতরের দিকে কোয়াটার পেয়ে ওখানে থাকে। ও কিন্তু আমাকে মোটেই একা ছাড়তো না, অনেক ব্যাপার যেগুলো সংকোচে হয়তো মা বাবাকে বলতে পারছিনা, ওকে বলতাম, ওর সঙ্গে পরামর্শ করতাম। একদম প্রাণের বন্ধু ছিল ও আমার, আমার বোনকেও খুব ভালোবাসতো। আমাদের পরিবারের সঙ্গে মিশে গেছিল কাঞ্চন।

ইলেভেনে পড়ার সময় শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবে ও আমার মা বাবাকে রাজি করিয়ে নিয়ে চলল ওদের গ্রামের বাড়ি বাহেরীতে আমাকে। মা যাতায়াতের খরচ বাবদ কিছু টাকা দিলেন, সঙ্গে ওদের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য মিষ্টির টাকা। কাঞ্চন প্রান্তিকা থেকে বাসে উঠল, স্টুডেন্ট বলে ভাড়া দিল না, দূর্গাপুর স্টেশনে কিছুতেই টিকিট কাটতে দিল না আমাকে, খানা জং স্টেশনে নেমে ওখান থেকে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে উঠলাম, ও ফার্স্ট ক্লাসে উঠল আমাকে নিয়ে, গুছিয়ে বসে ঝালমুড়ি, বাদাম খেলাম আমরা, বোলপুরে ট্রেন থেকে নেমে একটা দোকানে চা খাওয়ালো, মিষ্টি কিনতেই দিল না, বাহেরির বাসে সেই স্টুডেন্ট বলে ভাড়া না দিয়ে নিয়ে গেল ওদের পৈতৃক ভিটেতে। কাকু কাকিমা খুব যত্ন করলেন, রাত্তিরটা কাটিয়ে পরেরদিন ভোরে বেরোলাম

আমরা, শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় তখন সবে সানাই শেষ হয়ে শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গাইতে বসেছেন, তন্ময় হয়ে আপ্লুত হয়ে শুনলাম, অনুষ্ঠান শেষ হতে মেলা থেকে টুকিটাকি হাতের কাজ কিনে একটু কিছু খেয়ে নিয়ে কাঞ্চন আমাকে দূর্গাপুরের ডাইরেক্ট বাসে তুলে দিল, এবারে আমি উঠেই ভাড়া দিয়ে টিকিট কাটলাম যখন, তখন আমায় বলল, "দেখ, তোর পুরো ভাড়ার বেশিটা কেমন বাঁচিয়ে দিলাম।" আমি সাড়ে চারটের মধ্যে বাড়ি ঢুকে গেলাম। এইরকম ছিল কাঞ্চন।

এহেন কাঞ্চনের ভীষণ সিগারেটের নেশা ছিল, যে কারণে ও মাঝে মাঝেই আমাদের বাইরের বারান্দায় বা ছাদে ছুটতো, আমার মায়ের ভাষায়, ফুঁকতে। সেবারে শীতকালে ভীষণ ঠান্ডা সেদিন, রাস্তায় একটা লোক নেই, হিমেল হাওয়া দিচ্ছে বাইরে,কাঞ্চন সাড়ে নটা নাগাদ বেরোল আমাদের বাড়ি থেকে সোয়েটার আর টুপির ওপরে শাল জড়িয়ে সাইকেল নিয়ে। ঠান্ডায় বেচারা জমে যাচ্ছে একেবারে, তখন ও আর ওর বাবা বেনাচিতিতে ঘর ভাড়া করে থাকে। আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভেটেনারি হসপিটালের কাছে ও দেখে আরেকজন মুখে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে উল্টোদিক থেকে সাইকেলে আসছে। ও ওই টুপি চাদরের আড়াল থেকে তার কাছে গিয়ে আগুন চেয়েছে নিজের সিগারেটটা ধরাবে বলে। সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরা দুটো হাত ওর ততক্ষনে ঠান্ডায় অসাড় হয়ে গেছে। জ্বলন্ত সিগারেট মুখে লোকটি ওকে আগুনটা দিল, ও নিজের সিগারেট ধরিয়ে একটা সুখটান দিয়ে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরল। খেয়ে দেয়ে আরাম করে বসেছে সবে এমন সময় ওর বাবা রায়কাকু ঢুকলেন বাড়িতে। ওকে দেখেই কাকু বললেন, "হ্যাঁ বাবা, শেষে বাপের কাছে থেকেই আগুনটা নিতে হল তোর ?" কাঞ্চন ততক্ষনে ভুলে গেছে রাস্তায় ওর আগুন চেয়ে সিগারেট ধরানোর ব্যাপারটা, কাকুর কথা শুনে প্রথমে বুঝতে পারেনি, বুঝতে পেরেই অপ্রস্তুত তো বটেই, খুব লজ্জা পেয়েছিল। পরেরদিন আমাকে বলবার সময়ও ওর সেই অপ্রস্তুত ভাবটা কাটেনি।

BANGLADARSHAN.COM

এখন কাঞ্চন ASP তে চাকরি করে, দুর্গাপুরে থাকে, একটা মেয়ে ওর প্রায় আমার মেয়ের বয়সি, আজও ও আমার সেই প্রাণের বন্ধুই আছে। সদ্য আরেক বন্ধু জয়দীপের জন্য ওর সাথে আবার যোগাযোগ হল, শুনলাম ও আমাকে খুঁজতে আমাদের পুরোনো কাজের দিদির বাড়ি গেছে, আমার পরিচিত অনেকের কাছে আমার কথা জিজ্ঞেস করেছে।ওর কথা মনে হলেই এই ঘটনাগুলো মনে পড়ে যায়।

॥ইয়ে টিয়ে (রম্য রচনা)॥

তখন দূর্গাপুরের বিধানে সায়েন্স নিয়ে এগারো বারো ক্লাসে পড়ি, একটা টিউশনে আমার সহপাঠী ছিল সুদীপ ভট্টাচার্য। ছোটোখাটো কিন্তু গাট্টাগোট্টা চেহারার সুদীপ ছিল আমার অগতির গতি বন্ধু, কোনো রেফারেন্স পাচ্ছি না কিছুতে, সুদীপ কোথা থেকে জেনে এসে বলে দেবে, কোথাও কিছুর জন্য যেতে হবে আমায়, সুদীপ চলল আমার সঙ্গে। মাথায় আমার চেয়ে অনেকটাই বেঁটে কিন্তু আন্তরিকতা দিয়ে সেটা ও ঢেকে দিত। আমাদের বাড়িতেও ওর ছিল অবাধ গতিবিধি। আমার আরেক বন্ধু কাঞ্চন ওকে দেখলেই ক্ষেপাত ওকে, ওরা দুজনেই শিবাজী বয়েজে পড়ত। কেন ক্ষেপাত? কারণ সুদীপ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো ফ্যান, মানে সাদা বাংলায় স্তাবক বলতে যা বোঝায় তাই। আমি যা কিছুই করব, ওর মনে হত এমনটা আর কেউই করতে পারেনা। আর আমি সাজগোজ করলে একেবারে মুগ্ধ হয়ে পায়ের তলায় বসে পড়ত। আমি খুব মজা পেতাম, কিন্তু ওকে কিছু বলতাম না, কারণ ও সত্যি সত্যিই আমার ভালো চাইত।

আমার মা আমার সব বন্ধুদের কাছে জনপ্রিয় ছিল দুটো কারণে, প্রথম কারণ, মায়ের কাছে এসে কেউ কখনো খালি মুখে ফেরত যেত না, মায়ের ভাঁড়ারে কিছু না থাকলে মা চিঁড়ে ভেজে, নয় টোস্ট ওমলেট করে বা নিদেন চানাচুর, আলুভাজা, শশা দিয়ে মুড়ি মেখে চা করে হলেও খাইয়ে ছাড়বে আর দ্বিতীয় কারণ, মায়ের স্বাভাবিক সহজ হয়ে তাদের সাথে মিশে তাদের সঙ্গে গল্প করা। ফলে মায়ের সঙ্গে আমার সব বন্ধুরা একদম অসংকোচে অনেক কথা বলত। সুদীপও মাকে খুব পছন্দ করত, শ্রদ্ধা করত। মাও ওকে সন্তান স্নেহে ভালোবাসতো।

BANGLADARSHAN.COM

সুদীপের স্তাবকতার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। একবার কালীপুজোর দিন সকালে মা, বাপি বেরিয়েছে, আমি আর বোন বাড়িতে, আমার সেদিন পুজোর একটা না পরা লাল হলুদ শাড়ি, যেটা খুব শখ করে কিনেছিলাম, খুব পরতে ইচ্ছে হল। বোনের কয়েকটা না পরা জামা থেকে একটা পরালাম, ওকে সাজালাম, নিজে ওই শখের শাড়িটা পরে, সেজে নিলাম, কোথাও যাব না, বাড়িতেই থাকব, কিন্তু সেদিন মাথায় ঐরকম খেয়াল চেপেছিল। সেজে গুজে আমি আর বোন একটু ঘরটা ঠিকঠাক করছি, এমন সময় শুনি দরজায় কেউ কড়া নাড়ছে, খুলে দেখি সুদীপ।

দরজা খুলতে ও ভেতরে এলো, এসে সোজা আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল, আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, “কি রে, কি হল তোর? অমন মেঝেতে বসে পড়লি কেন?” ও প্রথমে কিছুক্ষন হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ঘোরের মধ্যে বলল, “তোকে না একদম দেবীর মত লাগছে। তুই এইভাবে বসে থাক, কোথাও উঠিস না, আমি একটু দুচোখ ভরে তোকে দেখি।” আমি বললাম, “তোর কি মাথাটা একদম চলে গেল? তুই সোফায় উঠে বোস, আমি দেখি মায়ের স্টকে কি আছে, নিয়ে আসি।” বলে উঠতে যেতে আমায় হাত ধরে সোফায় বসিয়ে আমার বোনকে বলল, “দেখেছিস তোর দিদিকে কি অসাধারণ লাগছে, আমি তো চোখ ফেরাতে পারছি না।” আমার বোন নেহাতই ছোট তখন, ও চুপ করে সুদীপকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। এই পাগলামি আরো কতক্ষন চলতো জানিনা, এমন সময় মা বাপি ফিরল। মাকে দেখে সুদীপ খুব উৎসাহ নিয়ে বলল, “দেখেছেন কাকিমা, কি সুন্দর

লাগছে পম্পাকে।” মা একঝলক আমাকে দেখে নিয়ে বলল, "জানিস তো সুদীপ, আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে, “যৌবনে কুক্কুট ধন্যা” মানে যৌবন আসলে কুক্কুট মানে মুরগিকেও মানুষ সুন্দর দেখে। আর এ তো জলজ্যান্ত একটা সুশ্রী মেয়ে, এ আর বেশী কথা কি যে তোর চোখে ওকে সুন্দর লাগবে!!! “সুদীপ খুব আশাহত হল মা ওকে সেভাবে সমর্থন করল না দেখে।”

সুদীপের একটা সাদা রঙের এল এম এল ভেসপা স্কুটার ছিল, সেটায় চড়িয়ে একদিন আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। বাড়িতে সুদীপ দেখলাম পুরুষ সিংহ, ওকে একেবারে আকাশে তুলে রাখে ওর বাবা মা, ওর একটা বোন আছে দেখলাম, সে আমাকে খুব সহজেই আপন করে নিল। সেই সময় আমিও বেশ কয়েকবার গেছি ওদের বাড়িতে, আর ও প্রায় রোজই আসতো।

স্বভাবে একটু ভীতু সুদীপের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিছু একটা হতে হবে ওকে জয়েন্ট এন্ট্রেন্স দিয়ে। আমরা যারা সায়েন্স পড়তাম সকলেরই এটা একটা লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সুদীপের একেবারে ধনুর্ভাঙা পণ ছিল ওকে জয়েন্টে চান্স পেতেই হবে। যথারীতি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেল, জয়েন্টও হল। এবার জয়েন্টের রেজাল্ট যেদিন বেরোলো, দেখা গেল আমি বা সুদীপ কেউই চান্স পাইনি(পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম জয়েন্টে দূর্গাপুরের ৫৭৫টা খাতা হারিয়ে গেছিল সেবছরে, তার মধ্যে আমার খাতা ছিল), দুঃখ হল খুব। সুদীপের সঙ্গে বসে ঠিক করলাম আমরা দুজনেই তাম্বলা ব্রীজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে সুইসাইড করব। একদিন সকালে আমি বোনকে স্কুলে পৌঁছে আর ও বাড়ির বাজার করে দিয়ে চললাম সেই অভিযানে। সেই মতো তাম্বলা ব্রিজেতে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা।

BANGLADARSHAN.COM

এবার আমি সুদীপকে বললাম, “তুই বল তুই কেন সুইসাইড করবি?” সুদীপ বলল, “জানিসতো, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না হলে কোনো মেয়ে পাত্তা দেবে না। তাছাড়া দেখ, বাবা কত পয়সা খরচা করেছে আমাকে জয়েন্টে চান্স পাওয়ানোর জন্য, সেটা তো সফল হলো না বল?” আমি বললাম, “এবারে হয়নি, পরের বারে তো হতে পারে, পরের বারে চেষ্টা কর না।” সুদীপ বলল, “তোর কি মনে হয় পরের বারে আমি পেয়ে যাব?” আমি বললাম, “না পাওয়ার কিছু নেই, তুই তো ভালো স্টুডেন্ট, চেষ্টাটা ঠিক হলে পেয়ে যাবি দেখিস।” সুদীপ বলল, “তোর আমার ওপরে এতটা কনফিডেন্স?” আমি বললাম, “না হবার কি আছে? কোনটা ভুল বলেছি বল, তুই ভালো স্টুডেন্ট সেটা, নাকি পরের বারে চেষ্টা করলে চান্স পেয়ে যাবি সেটা?” ও তাড়াতাড়ি বলল, “না না, ভুল কেন বলবি, আমি শুধু দেখছিলাম তুই মন থেকে বলছিলি কিনা, দেখলাম মন থেকে বলছিস। তাহলে আর সুইসাইড করে কাজ নেই, চল ফিরে যাই. তুইও সামনের বারে জয়েন্ট দিবি?” আমি বললাম, “না রে, আমি একবার উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে গেলে আর সায়েন্সই পড়ব না, নেহাত মা বাবার মন রাখতে পড়েছি, প্রচুর খেটেছি, আমার স্ট্রিম হিউম্যানিটিজ, ওটাই পড়ব। চল তাহলে ফিরি, বোনকে আনতে হবে স্কুলের থেকে।” বলে দুজনে ফিরলাম, বোনকে স্কুলের থেকে নিয়ে বাড়িতে ফিরতে সুদীপও আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে ফিরল।

মা দুই মূর্তিকে একসঙ্গে দেখে জিজ্ঞেস করে সব শুনে আঁতকে উঠল, সুদীপকে জিজ্ঞেস করল, “তোকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে কে বলেছে? সুদীপ বলল, "জানো তো কাকিমা, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না হলে কোনো মেয়ে

আমাকে ইয়ে টিয়ে করবে না।” মা বলল, “কে বলেছে তোকে একথা? ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও মেয়েরা ইয়ে টিয়ে করে, দেশের সব ছেলেই কি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, তাদের কি ইয়ে টিয়ে হয় না?” সুদীপ খুব আশ্বস্ত হল এবং বাড়ি চলে গেল। মায়ের কাছে সুদীপও বলল না বিয়ে টিয়ে, মাও বলল না বিয়ে টিয়ে, কিন্তু বার্তা বিনিময় হয়ে গেল। সুদীপ চলে যেতে মা আমাকে নিয়ে পড়ল, “কি ডাকাত মেয়ে তুই, তুই তো ডাকাবুকো, না হয় ঝাঁপ দিয়েই দিতিস, বেচারা সুদীপটা ভীতু, তোর ওই অবস্থা দেখে হয়তো কেঁপে ঝেঁপে অজ্ঞান হয়ে যেত ও, তোর খুনের দায়ে পুলিশ ওকে এসে ধরত।” আমি হাসতে হাসতে বললাম, “এসব কিছুই হত না, ও দেখতে বসে বসে হাপুস নয়নে কাঁদত।”

দুর্গাপুর ছেড়েছি বহুদিন, সুদীপের খবর জানিনা, কেমন আছে, জয়েন্ট পেল কিনা সেটাও জানিনা, কিন্তু সেই সময়ের স্মৃতিতে ও রয়ে গেছে অমলিনভাবে। ভালো থাকুক ও, আজ এতো বছর পরেও এই অকৃত্রিম বন্ধুদের জন্যই মনে হয় জীবনটা সরস, সজীব, সহজ হয়েছে এদের জন্য। যেখানেই থাকিস সুদীপ তোকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালাম আজকে।

BANGLADARSHAN.COM

॥টানাপোড়েন॥

যাদবপুরের আইসিসিতে সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে অপু, নতুন চাকরি, সর্বকনিষ্ঠ কর্মী সে এখানকার, মাঝে মাঝে নাইট শিফটও থাকে, সদ্য স্ট্যাটিসটিক্স নিয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করা ছেলেটার মনটা কিন্তু এখনো কৈশোরেই আটকে আছে। ভীষণ খেলাধুলো ভালোবাসে সে, ফুটবল, ক্রিকেট দুটোই সেকেন্ড ডিভিশনে খেলে আর যে জিনিসটা করতে ভালোবাসে সেটা ঘুড়ি ওড়াতে। অদ্ভুত একটা নেশা আছে ওর ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতি। সকালে জলখাবার খেয়ে হোক কি না খেয়ে, সেই স্কুল বেলার সময় থেকে ঘুড়ি লাটাই মাঞ্জা সুতো নিয়ে ছাদে উঠল তো বেলা চারটে পাঁচটা পর্যন্ত চলল তার ঘুড়ি ওড়ানো। স্নান,খাওয়া রইল পড়ে, বিকেলে দিনের আলো কমে এলে যখন ছাদ থেকে নামল, চোখে কেমন আলো আঁধারি দেখছে, তবু পরের দিন আবার সেই এক কাজ। স্কুল থাকলে ফিরে এসে বইয়ের ব্যাগ রেখেই দৌড়োয় ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে। মা কত বারণ করেন, বোঝান ছেলেকে, কিন্তু কে শোনে কার কথা। ঘুড়ি ওড়ানোর অপুর যোগ্য জুটি দুবছরের বড়ো দাদা অবন। দুইভাই এই ঘুড়ি ওড়ানো আর খেলাধুলোর ব্যাপারে একেবারে মানিকজোড়।

বাবা মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, বছরের খুব কম সময়ে বাড়ি থাকেন, বাড়ি থাকলে তিনি কিন্তু বাধা দেননা ছেলেদের বরং সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নিজে দেখে শুনে ঘুড়ি, মাঞ্জা, লাটাই কিনে দেন। গতবছর থেকে বাবার হার্টের সমস্যা হওয়ায়, বাবা কলকাতাতেই শোর জব নিয়ে চলে এসেছেন অনেক কম পারিশ্রমিকে। আর তাই বাবার পাশে দাঁড়ানোর জন্যই আরো অপু চাকরিটা নিয়েছে। দাদা লেখাপড়ায় একটু পিছিয়েই আছে, আর চাকরি জোগাড় করার এলেমও তার নেই। ছোটবোনের বিয়ে আছে, অপুর পরের ভাই রবিন বাইরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, এতসবের সঙ্গে সংসারের খরচ মিলে বাবার ওপরে খুবই চাপ পড়ে যাচ্ছিল। তাই কেউ মুখে কিছু না বললেও সংসারের সুরাহার জন্য অপু পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেই পরীক্ষা দিয়ে চাকরি নিল।যদিও এখনো সে ট্রেনি, কিন্তু চাকরির দায়বদ্ধতা তো আছেই।

BANGLADARSHAN.COM

কাল বিশ্বকর্মা পুজো, অফিসে প্যান্ডেল করে ঠাকুর আনলো আজ অপু অফিসের সহকর্মীদের সাথে। তারপরে বাড়ি ফেরার সময়ে বেশ কিছু ঘুড়ি, লাটাই কিনে আনল কালকের ওড়ানোর জন্য। মনে মনে ভেবে রেখেছে কাল অফিসে গিয়ে একটু থেকে সিনিয়রদের বলে তাড়াতাড়ি বাড়ি আসবে, এসে ঘুড়ি ওড়াবে। দাদাকেও বলে রাখল তৈরী থাকতে কালকে। কালকের কথা ভাবতে ভাবতে ফুরফুরে মন নিয়ে রাত্রে ঘুমোল।

সকালে উঠে একটু তাড়াতাড়িই বেরোলো বাড়ি থেকে, বাড়ি ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি যে আজকে। অফিসে গিয়ে দেখে হৈহৈ ব্যাপার, একপাশে পুজোর জোগাড় হচ্ছে আর একপাশে মাংস, মাছ,ভাত, চাটনি রান্না হচ্ছে জমিয়ে। পুজোর জোগাড়ে হাত লাগালো অপু। পুজো শেষ হল বারোটা নাগাদ। এইবার ও বাড়ি যাবে বলে সিনিয়র দেবুদাকে বলতে গেল। দেবুদা শুনে বললেন যে ওকে আরসিসি প্রধান ড. অনঙ্গ মোহন দাস সকাল থেকে খুঁজছেন, ও যেন দেখা করে যায় একবার ড. দাসের সঙ্গে। অপু খুঁজে খুঁজে ড. দাসকে পেল কম্পিউটার সেন্টারের একটা কোণের ঘরে, বসে অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে গল্প করছেন। ও অনুমতি নিয়ে ঢুকল

ঘরে। ড. দাস ওকে দেখে বললেন, "এই যে অপু, আজকে এই আমাদের যাঁরা অতিথি এসেছেন বা আসছেন, তাঁদের দায়িত্ব কিন্তু তোমার। অপু বলল, “স্যার, সবাই তো আছে, আজকে বিশ্বকর্মা পুজো, একটু যদি আগে ছাড়েন মানে বাড়ি গিয়ে ঘুড়ি ওড়াবো আর কি।” ড. দাস শিথিল ভাবে এতক্ষন কথা বলছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসে বললেন, “কি?ঘুড়ি ওড়াবে? মনে রেখো এখন আর তুমি ইউনিভার্সিটিতে নেই, চাকরি করছো।এইসব ছেলেমানুষি আর তোমায় মানায় না। যাও, গিয়ে গেষ্টদের খাবারের তদারক করো। বিকেলে পাঁচটার পরে বেরিয়ে যেও।”

অপু ড. দাসের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো চোখে জল আর ভাঙা মন নিয়ে। সারাদিন কিচ্ছু খেল না, কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাও বলল না। অফিস থেকে বেরোলো ছটা নাগাদ। ভগ্ন মন আর ক্লান্ত শরীরে বাড়ি আসতে আসতে অনুভব করল হাতের ফাঁক দিয়ে সময়টা গড়িয়ে গেছে, সে এখন কর্মী, তার ভালোলাগাগুলো এবার থেকে বাইরে প্রকাশ করা যাবেনা। আর সত্যি চাকরি মানে তো চাকরগিরি। একবুক হতাশা আর চোখে জল নিয়ে হঠাৎই একদিনে অপু বড়ো হয়ে গেল।সংসারের ঘানিতে জুতে গেলে তখন ভো কাট্টা সকল ভালোবাসা, শুধুই পাক দিয়ে যাওয়া।

BANGLADARSHAN.COM

॥ঋণশোধ॥

আজ কয়েকবছর হল এপাড়ায় ভাড়া এসেছেন প্রণতি দেবী। দুই মেয়ে শ্রী আর পরা দুজনেই লেখাপড়া করে, স্বামী বাইরে চাকরি করেন। বড়ো মেয়ে শ্রী কলেজে পড়ে, ছোট মেয়ে পরা পড়ে স্কুলের নিচু ক্লাসে। প্রণতি দেবীর বাপের বাড়ি এই পাড়াতেই। মাঝে মাঝে ভাই, জ্যাঠতুতো দাদা, বৌদি, ভাইপো এঁরা আসেন দেখা করতে, প্রণতিদেবীও যান। প্রণতি দেবী মানুষটা ভীষণ প্রাণবন্ত, উচ্ছল, কর্মঠ, আত্মীয় বৎসল, সহানুভূতিশীল এবং স্পষ্টবাদী। একদম রেখে ঢেকে কথা বলেন না আর একটা বিষয়ে প্রণতিদেবীকে সকলেই একটু সমঝে চলে, সেটা তাঁর কথার ধারের জন্য। সামনাসামনি অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। স্বামী, মেয়ে কাউকেই এই ব্যাপারে রেয়াত করেন না তিনি। তারই কিছু এখানে তুলে ধরব।

ছোট মেয়ে পরার চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, ফলে পড়ায় সে ভীষণ অমনোযোগী। স্কুলের ক্লাসে বোর্ড দেখতে পায় না বলে অর্ধেক ক্লাসের কাজ তার হয় না. তাই বাড়িতে তাকে চেপে ধরে পড়ান প্রণতিদেবী। সে পড়তে পড়তে নিজের অন্যমনস্কতা ঢাকতে হাঁ করে মায়েরই মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে। প্রণতিদেবী তাকে বলেন, “এখন পড়ে নে, তোর পরীক্ষার পরে আমি সেজে গুজে বসবো, তখন সারাদিন ধরে দেখিস, কেউ বারণ করবে না।” শুনে বড়ো মেয়ে শ্রী খুব হাসতে থাকে, আর ছোটমেয়ে রেগে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

মাসতুতো বোনের ছেলে সোমু দিদি শ্রীর খুব নেওটা। আসলে সারাক্ষন দিদির গা ঘেঁষে গল্প, রাত্রে শুয়ে শুয়েও দিদির সঙ্গে তার গল্প চলে, মাসি প্রণতিদেবীর সঙ্গে কথা বলে, কিন্তু দিদির সঙ্গেই বেশী ভাব। একদিন সোমু এসে ঐরকম শ্রীর সঙ্গে গল্প করছে, প্রণতিদেবী এসে সোমুর সামনে দাঁড়ালেন, শ্রী চা করতে গেল, সোমু দিদির পেছনে যেতে উদ্যোত হলে প্রণতি দেবী নিজের হাত পা শুঁকতে লাগলেন সোমুর সামনে। সোমু জিজ্ঞেস করল, “মাসি, কি হয়েছে?” প্রণতিদেবী বললেন, “না, দেখছিলাম আমার গায়ে খারাপ গন্ধ বেরোচ্ছে কিনা, আমি এসে দাঁড়াতেই তুই উঠে শ্রীর পেছন পেছন চললি, তাই মনে হল আর কি।” সোমু এমন হঠাৎ আক্রমণে রেগেমেগে বলল, “আচ্ছা মাসি, তুমি কি রোজ সকালে উঠে কুরুনি দিয়ে তোমার জিভটা কুরোও, উফফ... কি ধার গো তোমার জিভের!!!”

প্রণতীদেবীর স্বামী অলকেশ বাবুর মাথায় টাক নেই, কিন্তু চুলের একটা আলতো আবরণ যেন, ভীষণ পাতলা চুল তাঁর, প্রণতি দেবী বলেন অলকেশবাবুর মাথায় চুল “আছি আছি নেই নেই গোছের, মন খুলে আছি বলতে পারবে না, আবার নেইও বলতে পারবে না।”

অলকেশ বাবুর মা সুপ্রীতি দেবী ভীষণ দজ্জাল মহিলা, তাঁর তিন ছেলে একটু মেনিমুখো স্বভাবের আর তিন মেয়ে অবয়বে মহিলা কিন্তু স্বভাবে পুরুষ, ফলে ছয় ছেলে মেয়েদের যাঁরা জীবনসঙ্গী তাঁদের প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। অলকেশবাবুকে প্রণতিদেবী সেই প্রসঙ্গে প্রায়ই বলেন, “তোমার মা সব ছেলেগুলোকে মেয়ে করে আর

মেয়েগুলোকে ছেলে করে বড়ো করে বাজারে ছেড়ে দিয়েছে যার ফলে বৌগুলোর আর জামাইদের জীবনের সাড়ে সব্বোনাশ হয়ে গেছে।”

কেউ বেশ গাবিয়ে কিছু বললে প্রণতি দেবীর মন্তব্য, "তুমি যদি পঞ্চানন, তোমার দুঃখের কি কারণ "। অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করতে হলে বলবেন, “উফঃ... শিবের মাথায় ফুল ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি তো আছি, কখন ফুল পড়বে।” কোনো জিনিস না পাওয়া গেলে বলবেন, “শিয়ালের ইয়ের দরকার তো, তাই শিয়াল পর্বতে গিয়ে ইয়ে করেছে।”

শ্রীর বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে অশান্তি হলে শ্রী ফিরে আসে। একদিন শ্রীকে নিয়ে ফিরছেন প্রণতিদেবী, একটি দোকানে কেনাকাটা করার সময়ে পাড়ার ছেলে গৌরাঙ্গ জিজ্ঞেস করল, “মাসিমা, শ্রী কি এখন আপনার কাছেই আছে?” প্রণতিদেবী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “কেন, আর কোথায় থাকার কথা ছিল, তোমার কাছে?” গৌরাঙ্গ তুতলে টুতলে একাকার, সে এমনিতেই প্রণতীদেবীকে খুব সমঝে চলে তাঁর গাম্ভীর্যের জন্য, তবু সে বলল, “না, মানে জিজ্ঞেস করছিলাম আর কি।” প্রণতি দেবী বললেন, “এটা জিজ্ঞেস করার কি আছে, মেয়ে মায়ের কাছে থাকবে না তো আর কোথায় থাকবে, হ্যাঁ?” গৌরাঙ্গ পালাতে পথ পায় না।

BANGLADARSHAN.COM

শেষে একটি ঘটনা বলি, পাড়াতে লক্ষ্মী ঘোষের ময়রার দোকান, ঘিয়ের ব্যবসা। প্রণতি দেবীর বাবা বিনয়বাবু প্রণতি দেবীর ভায়ের বিয়ের সময় লক্ষ্মী ঘোষের কাছ থেকে বিয়ের মিষ্টি, দই আর ঘি নিয়েছিলেন পঁচিশ বছর আগে। সব টাকা শোধ হয়ে গেলেও লক্ষ্মী ঘোষের খালি মনে হয় বিনয় বাবুর কাছে ওঁর ন টাকা বারো আনা আজও পাওনা, যেটা আদৌ সত্যি নয়। বিনয়বাবু মারা গেছেন কুড়ি বছর, প্রণতি দেবীর ভাই প্রণবেশের মেয়েরই তখন আঠারো বছর বয়স। প্রণবেশকে বলতে গিয়েছিলেন, সে এক ধমকে চুপ করিয়ে দিয়েছে। সারাগায়ে শ্বেতী ভর্তি নিঃসন্তান লক্ষ্মী ঘোষকে পাড়ার ছেলেরা দেখলেই পেছনে লাগে তাঁর এই অকারণ অর্থগৃধ্নুতার জন্য। জীবনে তাঁর একটাই বেঁচে থাকার কারণ অর্থ একত্রিত করা, বৌ মারা গেছে বিনা চিকিৎসায়, বাড়িতে আর কেউ নেই, কিন্তু তবু তাঁর এই অর্থপিপাসার শেষ নেই। এহেন অশীতিপর লক্ষ্মী ঘোষ একদিন প্রণতিদেবী আর তাঁর মা বাজারে যাচ্ছেন, রাস্তায় ধরলেন, “অ প্রণতি, অ প্রণতি, একটু কথা ছিল মা। বিনয়বাবুর কাছে আমি ন টাকা বারো আনা পাই আজও, তুমি একটু দেখবে?” প্রণতিদেবী বললেন, “আপনি ভাইকে বলেছেন?” লক্ষ্মী ঘোষ বললেন, “হ্যাঁ, বলেছিলুম বৈকি, সে বলল পঁচিশ বছর আগের ওই টাকা এখন তামাদি হয়ে গেছে। তাছাড়া বাবা কারুর কাছে ঋণ রেখে যাবার লোকই ছিলেন না, আমি যখন বাবার কাছ থেকে শুনিনি, তখন ঐরকম কিছু বাকি নেই আপনার কাছে। এখন তুমি বল, তা বললে হয়, প্রায় দশ টাকার মত বাকি আছে।” এই লেনদেনের ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৭২ সালে, আর বিনয়বাবু ভীষণ সৎ লোক ছিলেন, কখনো ধারে কোনো কিছু করার মানুষ ছিলেন না। তবুও প্রণতি দেবী দশটা টাকা লক্ষ্মী ঘোষের হাতে দিয়ে বাজারে চলে গেলেন।

কয়েকদিন পরে আবার লক্ষ্মী ঘোষ প্রণতি দেবীকে ধরলেন, তিনি নাকি তাঁর হিসেবের খাতা খুলে দেখেছেন ওটা তিরিশ টাকা ছিল। প্রণতি দেবী বললেন, “আমি এইসব কিছুই জানিনা, তবুও দশ টাকা আপনাকে দিয়েছি সেদিন, আর পারব না।” বলে চলে গেলেন, কিন্তু নাছোড়বান্দা লক্ষ্মী ঘোষ এতো সহজে ছাড়লে তো!!! দেখা

হলেই সেই বিনয়বাবুর তাঁর কাছে ঋণ রেখে মরেছেন, টাকা শোধ না হলে ওঁর আত্মা শান্তি পাবে না, এইসব বলে কাঁদুনি গাইতে থাকেন। পাড়ার লোকজন লক্ষ্য করেছে, একদিন ভাইপো এসে বলল, “আমি একটু কড়কে দেব নাকি পিসি?” প্রণতি দেবী বললেন, “আর একটু দেখি বুঝলি।” পাড়ার ছেলেদের হাতে লক্ষ্মী ঘোষের কয়েকবার হেনস্থা হয়েছে তাঁর এই স্বভাবের জন্যে। কিন্ত তাঁর একদম “স্বভাব যায় না মলে।”
এরপরে একদিন আবার প্রণতিদেবীর সঙ্গে রাস্তায় লক্ষ্মী ঘোষের দেখা, সেদিন ভাইপো কাছেই দাঁড়িয়ে, পাড়ার ছেলেরাও সবাই মোটামুটি কাছাকাছি রয়েছে, লক্ষ্মী ঘোষ এগিয়ে এসে প্রণতিদেবীকে বললেন, “তা প্রণতি আমার টাকা কটার ব্যাপারে কি ভাবলে? কবে দেবে ভাবছো?” প্রণতিদেবী খুব সহজ স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দিলেন, “ভাবছি, আপনার তো শিগগিরি বাবা সঙ্গে দেখা হবে, তখন চেয়ে নেবেন বাবার কাছ থেকে, তাতে বাবাও শান্তি পাবেন, আপনিও আপনার টাকা পেয়ে যাবেন।” লক্ষ্মী ঘোষ হতবাক হয়ে বললেন, “মানে?” প্রণতি দেবী বললেন, “মানে আপনি তো শিগগির ওপরে যাবেন, তখন ওখানেই এই লেনদেনটা করে নেবেন, আমাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন কেন অযথা।” লক্ষ্মী ঘোষ ধপ করে রাস্তার মাঝখানে বসে পড়লেন হতাশ হয়ে আর পাড়ার ছেলেরা তাঁকে ঘিরে নাচতে রইল,

“হেই হেই লক্ষ্মী ঘোষের দই,
হেই হেই কিনতে গেলেই নেই,
লক্ষ্মী ঘোষের টাকা চাই,
আর কিছুই নেই।”

BANGLADARSHAN.COM

এইসব ছড়া সুর করে বলে।

প্রণতি দেবী গট গট করে হেঁটে চলে গেলেন, ভাইপো হাসতে হাসতে বাড়িতে এসে দুই বোনকে এই ঘটনা ব্যক্ত করলে তারাও হাসতে লাগল। বলাই বাহুল্য, আর কখনো লক্ষ্মী ঘোষ প্রণতি দেবীকে বিরক্ত করেনি।

॥অনন্তের ডাক॥

পুণ্যতোয়া এবং দিব্যজ্যোতির্ময়ী মা নর্মদার কথা ও মাহাত্ম্য প্রথম কীর্তিত হয় ঋষি মার্কণ্ডেয়ের ভাবনায় যা মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হয়। ঋষি মার্কণ্ডেয় হলেন সেই মহাত্মা যাঁর লিখিত শ্রীশ্রীচন্ডী আমাদের দেবীপূজার প্রধান মন্ত্র ও স্তব। আম বাঙ্গালী নর্মদা মাহাত্ম্য জানতে পারেন শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রীর আট খণ্ডের নর্মদা পরিক্রমার কাহিনী তপোভূমি নর্মদা পড়ে। যে সপ্তনদীর আবাহন আমরা করি যে কোনো পুজোতে বসে জল শুদ্ধির সময়-

‘ওঁম গঙ্গে চ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী,
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেস্মিন সন্নিধিঙ কুরু’

মন্ত্রোচ্চারণ করে সেই সাতটা নদীর মধ্যে অন্যতম নর্মদা। মা নর্মদার মাহাত্ম্য কীর্তনে বাবা লোকনাথ এক জায়গায় বলেছেন যে একদিন তিনি দেখলেন একটি কালো মলিন গাভী এসে নর্মদার জল স্নান করতে নামল এবং যখন উঠল দেখা গেল গাভীটির ধবধবে সাদা রং, ঋষিবর ধ্যান দৃষ্টিতে দেখলেন ওই গাভীটি আসলে মা গঙ্গা যাঁর সর্ব অঙ্গ সকলের কলুষ মোচন করে করে কালো মালিন্যময় হয়ে গেছিল, যিনি নর্মদায় অবগাহন করে কলুষমুক্ত হলেন।

BANGLADARSHAN.COM

আমার মাসতুতো দেওর বাবুদা, ভালো নাম শ্রীমান সুব্রত মুখার্জী। বয়সে আমার চেয়ে বড়ো, কিন্তু সম্পর্কটা আমার সঙ্গে আন্তরিক, নিজের ছোট দেওরের চেয়ে বাবুদা আমার অনেক কাছের। বিয়ের পরে আমার স্বামীর পরে অবশ্যই বাবুদা আমার শ্বশুরবাড়ির একমাত্র লোক যার কাছে আমি অকপটে আমার মনোভাব ব্যক্ত করতে পারতাম। বিয়ের প্রথম বছরে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে দেখি হৈ হৈ ব্যাপার। আমার ছোট দেওর, যাকে ছোড়দা বলি, সে পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। সেদিন সে লোকজন নিমন্ত্রণ করেছে তার অফিসে চাউমিন, চিলি চিকেন আনুষাঙ্গিক পানীয়ের সঙ্গে খাওয়াবে বলে, আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেখলাম শাশুড়ি মা পেঁয়াজ কাটছেন বসে, বাবুদা রান্নাঘরে কি খুটখাট করছে, আমার আসার শব্দ পেয়ে বেরিয়ে এসে বলল চা করে নিয়ে রান্নাঘরে যেতে, আমি সেইমতো গিয়ে দেখি বাবুদা সাত প্যাকেট চাউ সেদ্ধ করেছে, কেজি তিনেক চিকেন পিস করে রাখা রয়েছে,এবার সেগুলো তৈরী করার জন্য আমাকে বলল সাহায্য করতে, আমি চা টা শেষ করে সবে সেই আনাজগুলো কাটতে আরম্ভ করেছি, বাবুদা 'আসছি' বলে হাওয়া। তখন সন্ধে সাড়ে সাতটা, আমি চাউমিন চিলি চিকেন তার আগে বানিয়েছি, কিন্তু এইরকম পরিমাণে ‘নৈব নৈব চ।’

আমি আস্তে আস্তে সব জোগাড় করে নিয়ে যখন রান্না করছি, আমার কর্তা এসে আমাকে ওই অকুল পাথারে পড়া অবস্থায় আবিষ্কার করল, ও সব শুনে বলল, “খাবার সময়ের আগে আর বাবু এসেছে!!!!” এদিকে নটা বাজতেই ছোড়দা এসে তাড়া দিল সবাই এসে গেছে, তখনো ছোড়দার বিয়ে হয়নি, আমার ততোক্ষণে রান্না সারা,আমি যা যা হয়েছে নিয়ে যেতে বললাম। নিয়ে গেল আমার কর্তা আর ছোড়দা মিলে কিন্তু অধিক পানীয় গ্রহনের কারণে কেউই তেমন খেতে পারল না।

বাবুদা এলো রাত সাড়ে এগারোটায়, অত খাবার পড়ে আছে দেখে আমায় বলল ফ্রিজে তুলে দিতে এবং সাতদিন ধরে চারজনে, আমি, আমার কর্তা, ছোড়দা আর বাবুদা মিলে সেই চাউমিন আর চিলি চিকেন খেয়ে তবুও রয়ে গেছে দেখে আমার শ্বশুরমশাই তো বাবুদা আর ছোড়দাকে খুব বকুনি দিলেন, শাশুড়ি মাও ওদের দুজনকে যাচ্ছেতাই বললেন আমাকে ঐভাবে বিনা নোটিসে ঝামেলায় ফেলার জন্য। আমরা তারপর বছর দুয়েক আর চাউমিন, চিলি চিকেন খাইনি। কিন্তু অতো কিছুর পরেও আজও ওই ঘটনার কথা উঠলেই আমরা খুব মজা পাই আর ওই ঘটনার ফলশ্রুতি বাবুদা সব আত্মীয় মহলে, পাড়াতে সবার কাছে আমার খুব সুখ্যাতি করে দিল। আমি একরকম আদর্শ বৌয়ের তকমা পেয়ে গেলাম বাবুদার কল্যাণে।

অদ্ভুত বৈপরীত্যে ভরা এই অকৃতদার বাবুদার জীবন, পড়াশোনায় যথেষ্ট ভালো হওয়া সত্ত্বেও বাবুদা গ্রাজুয়েশন শেষ করল না, সেই সময়েই বাবুদা বক্রেশ্বরে গিয়ে গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে কালো বস্ত্র পরে সাত বছর কাটাল, তারপরে হঠাৎ সব ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল। এসে কিছুদিন ব্যবসা করল, কিছুদিন চাকরিও করল। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে বেড়িয়ে পড়ত, খারাপ ভালো সব রকমের জায়গায় বাবুদার অবাধ যাতায়াত ছিল। ফিরে এসে গল্প করত সেসব আমাদের সাথে, একটা সহজ সখ্যতা আছে আমাদের সঙ্গে বাবুদার।

BANGLADARSHAN.COM

আমার মেয়ের এক বছরের জন্মদিনে শ্বশুর বাড়িতে বেশ অশান্তি হয়, এদিকে সেই বছর আলাদা বাড়ি ভাড়া করে বড়ো করে জন্মদিন করা হয়েছিল মেয়ের, অফিসের প্রচুর লোকজন বলা হয়েছিল।বাড়ির সকলে অসহযোগিতা করলেও বাবুদা কিন্তু আমার আর আমার কর্তার সঙ্গে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল এবং সবরকম সাহায্য করেছে। আমার মেয়েকে বাবুদা খুব ভালোবাসে, ছোটবেলায় প্রতি পুজোয় ওকে নতুন জামা দিত, পুজোর একদিন আমি মেয়েকে সাজিয়ে দিলে সঙ্গে নিয়ে বেরোত।

তারপরে হঠাৎ একদিন শুনলাম বাবুদা আবু ধাবিতে গিয়ে চাকরি করছে ওর মায়ের দেখাশোনার জন্য, যখন আসত আমাদের সাথে দেখা করে যেত, টুকটাক ইমপোর্টেড জিনিস উপহার হিসেবে দিত। অনেক গল্প করত আমাদের সঙ্গে, ওর আধ্যাত্মিক দিকটা আমায় খুব টানত। আবু ধাবিতে শরীর খারাপ হয়ে হার্টের সমস্যা শুরু হল ওর, তিনটে স্টেন্ট বসল ওর বুকে। শুনে খুব মনখারাপ হয়েছিল। ফিরে এল ওখান থেকে, এসে একটা কোন কনস্ট্রাকশন সাইটে চাকরি নিল। মাঝে মাঝে আসলে পাড়ায় দেখা হত, আত্মীয় পরিচিতের কোনো অনুষ্ঠানে গেলে দেখা হত, তখন আবার গল্প জুড়ে দিত। পাড়ায় কখনো রিক্সায় যেতে যেতে হাত নেড়ে যেত, কখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলত। সবচেয়ে বড়ো কথা, বাবুদা যখন কথা বলে মনে হয়না একবারও যে দীর্ঘদিন পরে ওর সাথে কথা হচ্ছে, একটা আদ্যন্ত সহজ আন্তরিকতা আছে ওর ব্যবহারে।

বাবুদার আরেকটা গুণ না বললে বাবুদার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, সেটা হল ওর জ্যোতিষচর্চা। আমার শ্বশুরমশাই খুবই ভালো জ্যোতিষী ছিলেন, আমার বড়ো ভাসুরও জ্যোতিষ চর্চা করেন, আমার কর্তাও খুব অনায়াসে অনেক কিছু বলতে পারেন তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির জন্য, আমি নিজেও একটু একটু বুঝি

ব্যাপারটা কারণ এ বিদ্যেটি আমায় একটু শিখিয়ে গেছেন আমার শ্বশুর মশাই। কিন্তু বাবুদা জন্মসময়, স্থান জেনে কোষ্ঠী করে তার দারুণ বিচার করে। আমি যখনি প্রয়োজন হয় বাবুদাকে গিয়ে ধরি, ও ঠিক বলে দেয়।

এহেন বাবুদার অনেকদিন কোনো খবর পাই না, আমার কর্তাকে জিজ্ঞেস করলে সেও বলতে পারেনা। করোনার আবহে কেউই বাড়ি থেকে বেশি বেরোচ্ছে না, তাই কারুর কোনো খবর পাচ্ছি না।হঠাৎ আজ সকালে আমাকে এসে আমার কর্তা বলল, “কার সঙ্গে কথা হয়েছে জানো আজ? বাবুর সঙ্গে।” আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “ভালো আছে তো?” বলল, “হ্যাঁ, ভালো আছে, ও এখন নর্মদা পরিক্রমায় চলে গেছে। ফিরবে ২০২৪ এ।” শুনেই আমি লাফিয়ে উঠেছি, কারণ জীবনে যে কটা জায়গায় যাবার ইচ্ছে আমার আছে তার একটা ওই নর্মদার তটে। আমি বললাম, “দেখ, মা নর্মদা ওকে টেনেছে, তাই যেতে পেরেছে।” আমার কর্তা আমাকে বাবুদার এরণ্ড সঙ্গম, কমণ্ডলু সঙ্গম, কিছু নর্মদাতীরস্থ সাধকদের আর কপিল ধারার ছবি দেখাল। একদম একবস্ত্রে একটা কম্বল, একসেট জামা নিয়ে কপর্দকশূন্য হয়ে বাবুদা পরিক্রমায় বেরিয়েছে, এখন ওর আটান্ন বছর বয়স, বুকে তিনটে স্টেন্ট বসানো আছে হার্টের সমস্যার জন্য, রোজ দশ বারো কিলোমিটার করে হাঁটছে নর্মদার দক্ষিণ তট ধরে। মাঝে মাঝে ছবি পাঠাচ্ছে। বাবুদাকে ফোন করল, আমিও কথা বললাম এবং বাবুদাকে বললাম, “তোমার চোখ দিয়ে আমিও দেখব।” শুনে বাবুদা আমাকে আশ্বস্ত করল।

BANGLADARSHAN.COM

সেই মা নর্মদা পরিক্রমায় বাবুদা গেছে মানে আমি বুঝলাম বাবুদাকে মা নর্মদা ডাক দিয়েছেন, ওর কাছে অনন্তের আহ্বান এসে পৌঁছেছে। ওকে ইউ ব্রতে ব্রতী হতে মা ডেকে niyechen। আগামী চার পাঁচ বছর বাবুদার লাগবে এই পরিক্রমা শেষ করতে।জীবন থেকে মহাজীবনে উন্নীত হবার সোপান ওর তৈরী হচ্ছে। আমি খুব উচ্ছ্বসিত এই কারণে যে আমার খুব নিজের জন এই পথটা বেছেছে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়। ওর সার্বিক কুশল এবং এই পথে ঈশ্বরের কৃপায় ওর পূর্ণ সফলতা কামনা করছি আমরা সপরিবারে। আমার কর্তা একটা কথা খুব বলেন যে জীবন যেন গতানুগতিক না হয়, জীবনে বৈচিত্র্য না থাকলে বেঁচে থাকার আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়, জীবন ছোট হোক কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ হোক। বাবুদার ক্ষেত্রে ও যে এই বাঁধাগতের বাইরে একটা জীবন বেছেছে তার জন্যই ওকে সাধুবাদ জানাই। আর নর্মদার কৃপা না হলে ওই পরিক্রমায় যাওয়া হয় না। এই দীর্ঘ পরিক্রমার সময়ে মা নর্মদার অনেক লীলা ও অনেক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও লাভ করবে, অনেক অদ্ভুত ঘটনা ওর জীবনে ঘটবে যা ওর বোধের জগৎকে আরো ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দেবে। তাই অন্তর থেকে ওকে বললাম, "চরৈবেতি"।কবিগুরুর ভাষায়: “শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান।”

“নেই”

খুব মন খারাপ পাঁচ বছরের তিতাসের। রাত্রে শুয়ে ছিল মায়ের কাছে, সকালে তাদের দিদুর বাড়িতে যাবার কথা, কতদিন যায়না তারা, তিতাসের উইকলি টেস্টের চক্করে ওদের আজকাল শনি রবিবারগুলো একেবারে বিষিয়ে গেছে। সারা সপ্তাহে মা বাবা অফিস আর তিতাসের স্কুল নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর সোমবার উইকলি টেস্ট থাকে বলে শনিবার রবিবার ওর ব্রেন স্টরমিং (এটা মা বলে) চলে পড়া নিয়ে। সামনের সোমবার কোনো কারণে উইকলি টেস্ট নেই বলে ঠিক ছিল ওরা দিদুর কাছে যাবে।

দিদুর বাড়ি মানে দিদু, মাসি আর দাদু। দাদুর সঙ্গে অত ভাব ওর নেই, কিন্তু দিদুকে ও খুব ভালো বাসে। দিদু ওর সঙ্গে খেলে, গল্প বলে, ওকে নিয়ে বেড়াতে যায়, ওকে পেলে দিদু যেন কি করবে খুঁজে পায়না। সেই দিদুর কাছে কালকে যাবে বলে মনে কত আনন্দ নিয়ে ঘুমোল ও, সকালে উঠে দেখে ও ওর তান্নার মানে ঠাকুমার কাছে শুয়ে আছে। মা বাবা কেউ নেই, বিন্দু পিসি যে ওকে দেখে বাড়িতে, সে আর তান্না দুজনেই কেমন গম্ভীর। ও বুঝতে পারে না ঠিক কি হল ব্যাপারটা। মা তো মরে গেলেও শনিবার অফিস যায়না, বাবা যায় কখনো কখনো। আজ তবে ওরা কোথায় গেল?

BANGLADARSHAN.COM

ঘুম থেকে উঠে চান করে একটু কিছু খেয়ে ও নিজে নিজেই নিজের বই খুলে বসল, মা অন্যদিন পড়ায়, আজ মা না থাকলেও ওর পড়াটা একটু দেখে রাখবে, সোমবার স্কুলে টেস্ট না থাকলেও ক্লাসের পড়া তো ছুটির দিনেই তৈরী হয় (এটাও মা বলে), অন্যদিন তো শুধু হোম ওয়ার্ক শেষ করা, পরেরদিন ক্লাসের পড়া এগিয়ে রাখা এইসব হয়। তাই তিতাস আজ নিজেই বই নিয়ে বসল। যখন বেলা একটা বাজে শুনল সিঁড়িতে মা বাবার গলার আওয়াজ, কিন্তু মায়ের গলাটা এমন শোনাচ্ছে কেন? কেমন কান্নাভেজা, জড়ানো লাগছে কথাগুলো মায়ের? তিতাস ছুটলো মায়ের কাছে, কিন্তু গিয়ে যা দেখল আর শুনল ও একদম চুপ করে গেল। গিয়ে শুনল বাবা তান্নাকে বলেছে যে ওর দিদু নাকি আর "নেই", আচমকা শরীর খারাপ হয়ে কাল রাত্রে নাকি চলে গেছে না ফেরার দেশে, ডাক্তার ডাকারও নাকি সময় পাওয়া যায়নি।

দিদু...ওর দিদু....যে নাকি সবসময়েই হাসতো, তিতাসকে মায়ের বকুনি মারের থেকে আড়াল করে রাখতো, খাবার হাতে নিয়ে ওকে কোলে করে ঘুরে ঘুরে নানান গল্প বলে খাওয়াতো, ও কখনো দুষ্টুমি করলে বা চুল টেনে দিলেও কিছু বলতো না, বরং মা কিছু বলতে গেলে মাকে বকতো। কি সুন্দর একটা মশলা দেওয়া কালো কালো টক টক ঘুগনি করত দিদু, যে ঘুগনি ও আর কোথাও খায়নি, ওর খুব পছন্দ ছিল ওই ঘুগনিটা, দিদু যে ওকে তান্নার চেয়ে অনেক অনেক বেশী ভালোবাসতো, মায়ের কাছে কক্ষনো ওর কোনো দুষ্টুমি বলতই না নালিশ করে।তান্না আর বিন্দু পিসি তো রোজ মা অফিস থেকে সন্ধ্যেবেলায় ফিরলে ওর চিপস খাওয়া নিয়ে, টিভি দেখা নিয়ে, পুতুল খেলা নিয়ে নালিশ করে।তিতাসরা অনেকদিন দিদুর বাড়িতে যেতে না পারলে দিদু শুধু তিতাসের জন্য মন কেমন করছে বলে ওকে দেখতে চলে আসতো.... সেই দিদু “নেই?” তিতাস ঠিক বুঝতে পারেনা “নেই” হয়ে যাওয়া মানেটা কি।

কিছুদিন আগে ওর দাদার মানে ঠাকুরদার হঠাৎ শরীর খারাপ হল, সেদিন দাদা মাকে রান্না করতে বলল তাড়াতাড়ি, মা রান্না করেও দিল, ওরা একসঙ্গে সবাই মানে দাদা, তান্না, কাকা, মা, বাবা, ও দুপুরে খেল একসাথে বসে, ও খেয়ে উঠে বাথরুমে মজা করে জল নিয়ে খেলছিল, দাদা খেয়ে উঠে দেখতে পেয়ে ওকে তুলে আনল। ব্যাস, তারপরে দাদা শুয়ে পড়ল, পিসিরা এল, দাদার কেমন চোখটা বুজে রইল, বাবা, কাকা, পিসেমশাই সবাই অক্সিজেন, অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার বলে দৌড়োল, ডাক্তার নীলুকাকা পাঁচিল টপকে পাশের বাড়ি থেকে এসে ইনজেকশন দিল, তারপরে সবাই মিল দাদাকে স্ট্রেচারে করে নামালো, হসপিটালে নিয়ে গেল, কিন্তু একটু পরেই আবার ফিরে এলো সবাই কাঁদতে কাঁদতে। সেদিন সারারাত বাড়িতে সকলে জেগে ছিল, সেই প্রথম ওর জেঠু জেঠিমা এল, দাদার ওপর রাগ করে নাকি জেঠুরা চলে গেছিল বাড়ি ছেড়ে,পরেরদিন সকালে বাবা, কাকা সবাই কাঁদতে কাঁদতে কোথায় যেন গেল দাদাকে নিয়ে, কিন্তু দাদাকে নিয়ে ফিরল না, জেঠু,বাবা, কাকা সবাই কয়েকদিন ধুতি পরে মেঝেতে শুল, মাটির হাঁড়িতে ইঁট দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ওরা কি যেন খেত, ওদের মানে ছোটদের সেই সময় ওই ঘরে ঢোকা বারণ ছিল, ওই সময় নাকি ওরা কথা বলতে পারবে না খাবার সময়। তাই তিতাস ওর পিসির দুই ছেলে ছোড়দা বাবুল, দাদান বুবাই, জ্যাঠতুতো দাদা টুবাই, তিতাসের খুড়তুতো বোন দীপু ওরা তিতাসদের ঘরেই, খেত,খেলা করত।

তারপরে ওদের বাড়িতে একটা পুজো হল দাদার ছবি রেখে তাতে মালা পড়িয়ে, অনেক লোকজন এল ওই পুজোর দিনটাতে, পুরুত কি সব মন্ত্র বলে পুজো করল, কিন্তু দাদা আর এল না, ও তারপরে কতদিন রাস্তার দিকে, সিঁড়ির দিকে চেয়ে থাকত দাদার জন্য, অপেক্ষা করত দাদার ফিরে আসার, কিন্তু দাদা আজও এলোনা। দাদা ওকে খুব ভালোবাসতো, রোজ বাজারে যাবার আগের জিজ্ঞেস করত ওকে ও কি খাবে, ছাদেতে চৌকিতে বসে ও আর দাদা মুড়ি আর মিষ্টি কড়াইশুঁটি খেত, পুজোর সময় ওকে রিক্সাতে বসিয়ে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেত, বেলুন, বাঁশি, চকলেট কিনে আইসক্রিম হাতে ওরা ফিরত, সেই দাদাও শুনেছিল তিতাস "নেই।"

সেই রকম "নেই" তার মানে দিদুও? ও ঘরে এসে মায়ের গা ঘেঁষে বসতেই মা ওকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কাঁদতে লাগল। মাকে কিছু খাওয়ানো গেল না, শুধু কাঁদছে মা, কখনো জোরে, বেশিরভাগ সময় নিঃশব্দে দুচোখে জল পড়ছে। বাবা মাকে কত বোঝাচ্ছে, তাতে সাময়িক মা চুপ করছে, আবার চোখ জল ভরে যাচ্ছে মায়ের। এরপরে কদিন মা অফিসে গেল না, রোজ সকালে দাদুর বাড়িতে চলে যেত, সারাদিন ওখানে থেকে ঠিক বিকেলে ফিরে আসতো ওর কাছে, ওখানে গিয়ে মা নাকি মাসি আর দাদুকে রান্না করে দিত। কয়েক দিন পরে তিতাস শুনল দিদুর নাকি আজ "কাজ।" ওকে স্কুলের জন্য তৈরী করতে করতে মা, বাবাও তৈরী হল, ওকে বাবা গেল ছাড়তে স্কুলে, মা চলে গেল কালীঘাটে। সেদিন স্কুল থেকে ওকে নিয়ে বাবা গেল দিদুর বাড়িতে। তিতাস ঢুকে দেখল ঘরে অনেক লোক, শিবুমামা, মাইমা, মামীদিদা, মামাদাদু, মাসিদিদা, বড়োমাসি যাকে মা আর ওর মাসি দিদি বলে, দাদু, আরো পাড়ার লোকজন। মা আর মাসি সবাইকে খেতে দিল, কিন্তু দুজনেরই চোখে জল, দিদুর একটা ছবিতে মালা দেওয়া রয়েছে। তিতাস দিদুর বাড়িতে ঢুকে সব জায়গা খুঁজে এল দিদুকে।নাহ, বাড়িতে কোথাও দিদুকে দেখতে পেল না। তিতাসের হঠাৎই ভীষণ কান্না পেল, তিতাস নিজের বোধ দিয়ে উপলব্ধি করল দিদুর "নেই" হয়ে যাওয়াটা আর মায়ের গলা জড়িয়ে মায়ের বুকে মুখ রেখে দিদুর আর দাদার জন্য ওর দুচোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। "নেই" হয়ে যাওয়া মানে তাহলে কোনদিন না ফিরে আসা।

BANGLADARSHAN.COM

॥শক্তিরূপেণ॥

তখন সদ্য গ্রাজুয়েট হয়েছি। কর্মক্ষেত্র, এমপ্লয়মেন্ট নিউজ, খবরের কাগজ দেখে বিভিন্ন ব্যাংক, এসএসসি, পিএসসি, রেলে চাকরির পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত করছি, মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি পরীক্ষা দিতে বাপির সঙ্গে। বেশিরভাগ পরীক্ষার সিট পড়ে কলকাতায়, দুর্গাপুর থেকে এসে পরীক্ষা দিয়ে আবার সেদিনই ফিরতে হবে, কারণ পরেরদিন বাবার অফিস আছে আর আমার ছাত্র পড়ানো আছে। এরকমই একটা ব্যাংকের পরীক্ষার সিট পড়ল বেহালাতে।

সকাল দশটা থেকে পরীক্ষা, এদিকে বাড়িতে বোনের জ্বর আর মায়ের খুব শরীর খারাপ, অথচ পরীক্ষাটা দেওয়াও জরুরি, তাই ঠিক হল আমি আর বাপি বিধান এক্সপ্রেসে আসব, এসে পরীক্ষা দিয়ে ময়ূরাক্ষী প্যাসেঞ্জার ধরে ফিরব। পরীক্ষার দিনটা রোববার, সাধারণতঃ তাই হয়। আমরা ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঠিক সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে গেলাম, ট্রেনে টোস্ট ওমলেট দিয়ে বাপি, আমি দুজনেই ব্রেকফাস্ট করেছি। বাপির সেদিন বুকে একটা ব্যথা হচ্ছে, আমি পরীক্ষা দিতে ঢোকার আগে বাপিকে বলে ঢুকলাম কোনো একটা জায়গায় চুপচাপ বসে বিশ্রাম নিতে। তিন ঘন্টার পরীক্ষার পরে বাইরে বেরিয়ে দুজনেই কিছু খেলাম। তারপরে সাড়ে তিনটে চারটে নাগাদ বাস ধরে পৌঁছলাম হাওড়া। তখন বর্ষাকাল, স্টেশনের বাইরে রজনীগন্ধার গুচ্ছ বিক্রি হচ্ছিল, চার ডজন কিনে ফেললাম। অন্যসময় হলে কিনতাম না, কারণ হাতে লাগেজ থাকত, এবারে যেহেতু কোনো লাগেজ নেই, তাই কিনলাম। বাপিকে জিজ্ঞেস করলাম যে শরীর কেমন, বললেন বুকের পেনটা রয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

এবারে ট্রেনে উঠব, ট্রেন প্লাটফর্মে দেবার পরে দেখি সব জেনারেল কম্পার্টমেন্টের সিট এমাথা থেকে ওমাথা দুদিকের জানলায় সুতো দিয়ে বাঁধা, কোনো জায়গায় প্রতিটা সিটে একটা করে দেশলাই কাঠি ফেলে রাখা, লোকজন তেমন তখনো নেই। আমি এইরকম দুটো দেশলাই কাঠি সরিয়ে আগে একটায় বাপিকে বসালাম প্যাসেজের পাশে, আর একটায় নিজে বসলাম, সেটাও প্যাসেজের পাশের সিট। আমাদের পরের কামরাটা ছিল লেডিস কম্পার্টমেন্ট।

ট্রেন ছাড়ার আধঘন্টা আগে সেসব লোকজন হাজির হল যারা দেশলাই কাঠি ফেলে হাওয়া খেতে গেছিল, এসেই সিটের দাবি নিয়ে হুজ্জুতি শুরু করল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে একজনকে জায়গা ছেড়ে দিলাম, কিন্তু ওরা বাপীকে বসতে দেবে না, বরং আমি বসলে ওরা জায়গা ছাড়বে, অল্পবয়সি তরুণী তো!! আমি মোলায়েম ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে বাপির শরীর খারাপ, কিন্তু তারা শুনলে তো!!! একজন চট করে গিয়ে ট্রেনের গার্ডসাহেবকে ডেকে আনল, সেই গার্ড ভদ্রলোক আবার ভীতু মানুষ, আমাকে বললেন, “দেখুন দিদিভাই, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, ডেলি প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে লাগলে কি থেকে কি হবে কে জানে!!!! আপনি ওদের সাথে মিটিয়ে নিন।” বলে তিনি প্রস্থানোদ্যত হলেন। আমিও নিরুপায়, বাপিকে না বসালে আরো যদি বাপির শরীরের অবস্থা খারাপ হয়? আমি গার্ডের কোটের কলার পেছন থেকে ধরে আটকালাম, এবারে ভদ্রলোক কেঁদেই ফেললেন। হাতজোড় করে বারবার তাঁর অপারগতা বলতে লাগলেন আমাকে, আমি ছেড়ে দিলাম ভদ্রলোককে। এদিকে ডেলি

প্যাসেঞ্জাররা মজা পেয়েছে, নানা কুরুচিকর মন্তব্য করতে লাগল।আমি শেষে ওদেরকে বললাম, “আপনারা তো আমাকে বসতে দিচ্ছিলেন, আমি লেডিস কামরায় যাচ্ছি, আমার জায়গাতে বাপিকে বসতে দিন।” এবারে ওরা বাপিকে বসতে দিল কিন্তু আমাকে নামতে দেবে না।

দরজা থেকে প্যাসেজটা পুরো আটকে রেখে নানারকম উল্টো পাল্টা কথা বলে যাচ্ছে, একজন হঠাৎ বলল, “নামতে দেব না আপনাকে, যা করার আছে করে নিন।” বহুক্ষণ ধরে ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছিলাম, আর হল না। হাতে রাজনীগন্ধার গোছাটা ছিল, সেটাই ধরে এলোপাথাড়ি চালাতে চালাতে এগোলাম দরজার দিকে। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে ওরা হকচকিয়ে গেল, তারপরে কার গায়ে ওই রজনীগন্ধার গোছার বাড়ি পড়ে ভেবে মুহূর্তে প্যাসেজটা খালি হয়ে গেল। এদিকে ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে গেছে, আমি বাপিকে বসে থাকতে বলে ধীরে সুস্থে নেমে পাশের লেডিসে উঠে পড়লাম, জায়গাও পেয়ে গেলাম।

বর্ধমানে যখন ট্রেন দাঁড়ালো দেখি সেই ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল আমাকে প্লাটফর্মে নেমে হাতজোড় করে বলছে, “বাব্বাঃ মেয়ে তো নয়, একেবারে শক্তিরূপেণ!!!” দূর্গাপুরে ট্রেন থেকে নেমে বাপি বলল, “জানিস ওরা আমাকে কি বলেছে? বলেছে বাবা কি মেয়েই মানুষ করেছেন, একেবারেই সিংহের পিঠে সওয়ার সিংহবাহিনী, তার আবার সিংহটাও লাগে না।” আর সেই গার্ডসাহেব দুর্গাপুর স্টেশনে নেমে এসে নিজের অকর্মণ্যতা স্বীকার করে আমাকে আন্তরিক অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন, “মা, আমি অন্যায় জেনেও প্রতিবাদ করতে পারিনি ওদের আচরণের, আমার ব্যক্তি স্বার্থ বাঁচাতে। কিন্তু আমারও ঘরে মেয়ে আছে, আমি তাকে আপনার মতো করে গড়ে তুলব।” বাসে ফিরতে ফিরতে মনে পড়ল রবি ঠাকুরের দুটো লাইন,

“ক্ষমা যেথা হীন দুর্বলতা,
হে রূদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি সেথা।”

BANGLADARSHAN.COM

এই ঘটনা আমি একটুও লিখতে ইচ্ছুক ছিলাম না, কারণ তাতে নিজের ঢাক নিজে পেটানো হবে, আমার সহোদরা এবং আত্মজার জোরাজুরিতে লিখলাম। কারুর খারাপ লাগলে বা অজ্ঞাতে কারুর অনুভূতিকে আঘাত দিয়ে থাকলে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে রাখছি তাই।

॥হেমন্ত রাগ॥

মধ্যপ্রদেশের উসবাই গ্রামের থেকে তিন কিলোমিটার এগিয়ে সোনাডহর গ্রাম, এখানে এসে পৌঁছল পরিক্রমাবাসী গৌরীশঙ্কর নর্মদার কিনারা ধরে, এসে উঠল একদম সোনাডহর ঘাটে।বেলা সাড়ে তিনটে বাজে, সদাব্রত থেকে চাল ডাল নিয়ে খিচুড়ি রাঁধবার সময় এসে দাঁড়ালো সেখানে সোনাডহর গ্রামের বৃদ্ধ সুজনরাম। তিনি বিকেলে নর্মদার তীরে মা নর্মদাকে দর্শন করতে এসেছেন। তিনি গৌরীশঙ্করকে বললেন বিকেলে সোনাডহর ঘাটের ধর্মশালায় ওখানকার আধিকারিক বিদ্যানন্দজী এলেই সে আশ্রয় পেয়ে যাবে ধর্মশালাতে। কথায় কথায় উনি জানালেন খাড়েশ্বরী মহারাজের কথা যিনি বিদ্যানন্দজীর গুরু ছিলেন।

এই সোনাডহর নর্মদা পরিক্রমাবাসীদের কাছে জনপ্রিয় তার স্বর্ণলিঙ্গের জন্য যা এখন মা নর্মদার গর্ভে। সিদ্ধসাধকগণ এইখানে ওই লিঙ্গের দর্শন পান মা নর্মদার কৃপা হলে। শেষ এই লিঙ্গের দর্শন পেয়েছিলেন ধুমানন্দ অবধূত যিনি খাড়েশ্বরী মহারাজ নামে এই অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন, তাঁর ছিল অতুল যোগ ঐশ্বর্য যা তিনি লোককল্যাণের কাজে লাগাতেন। নর্মদা মায়ের এই ঘাটে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক ঘাট আছে, স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলোনীয়। গৌরীশঙ্কর ঘাটের সিঁড়িতে বসে ভাবতে থাকে সুজনরামজির বর্ণিত খাড়েশ্বরী মহারাজের কথা। একটু পরে এসে যান বিদ্যানন্দজী অবধূত। এসে তিনি ওকে ডেকে নিয়ে ধর্মশালার ঘর খুলে ওর থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। গৌরীশংকর শোনে খাড়েশ্বরী মহারাজের কথা।

মধ্যপ্রদেশ আয়োগের নরসিংহাপুর জেলার সেচ বিভাগের সরকারি আধিকারিক ছিলেন শ্রীউমাশঙ্কর দুবে। ভীষণ বলিয়ে কইয়ে, পশ্চিমী ভাবধারায় বিশ্বাসী দুবেজী সর্বদা কোট-প্যান্ট-টাইতে শোভিত হয়ে চলাফেরা করতেন সাহেবী কায়দায়। নর্মদা পরিক্রমাকারী ও নর্মদাতীরের সাধু মহাত্মাদের তিনি মনে করতেন অলস, নিষ্কর্মা। একবার সরকারের সেচের কাজ গ্রামে পরিদর্শনের জন্য তাঁর আগমন ঘটে সোনাডহরে ষাটের দশকে। সেইসময় এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন উচ্চকোটির সাধক অমিতানন্দজী ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ। তাঁরা তখন সাতদিনের জন্য এখানে অধিষ্ঠান করছিলেন নর্মদা পরিক্রমা কালে। সময়টা পুজোর ঠিক পরে। অমিতানন্দ অবধূতের পরিক্রমাকারি দলের সঙ্গে দেখা হয় দুবেজীর এবং দুবেজী তাঁদের দেখে প্রচন্ড বিরক্ত হয়ে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করলেন। অমিতানন্দজীকে বললেন পরেরদিন যেন তিনি পরিদর্শনে এসে এই নিষ্কর্মা সন্ন্যাসীদের দলকে এখানে না দেখেন। অমিতানন্দ মুচকি হেসে সম্মতি দিলেন । অমিতানন্দজী তাঁর শিষ্যদের বললেন “তোমরা এবারে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবে একটা পরিবর্তন।”

পরেরদিন সরকারি সার্কিট হাউসে বসে আছেন উমাশঙ্কর দুবে, এমন সময় তাঁর কানে আসে একটা ভজন “কাহে রে বন খোঁজন যায়, সর্বনিরন্তরী সদা আলেপা তোহী সঙ্গ সমাই”, হেমন্ত রাগে গাওয়া এই গানটা হেমন্তের সায়াহ্নে বসে শুনতে শুনতে হৃদয়ে কেমন যেন একটা অপ্রাপ্তির বেদনা চারিয়ে গেল দুবেজীর। গানটা শুনতে শুনতে দুবেজী ভেতরে যেন কেমন একটা অদ্ভুত টানাপোড়েন শুরু হল, সারারাত্রি তিনি ঘুমোতে পারলেন না, তাঁর জীবনের এই সময়টা যেন দাঁড়িয়ে গেছে থমকে ওই ক্ষণে। পরেরদিন ভোরের আলো ফোটার আগে দুবেজী হাজির হলেন গিয়ে সোনাডহর ঘাটে, কিন্তু ঘাটে বা তার আশেপাশে কেউ নেই। সোনাডহর ঘাটের নর্মদা

মন্দিরের পুরোহিত জানালেন অমিতানন্দজী ও তাঁর শিষ্যরা ভোররাত্রে উঠে তাঁদের যাত্রার সূচনা করে এগিয়ে চলে গেছেন। দুবেজী প্রথমে খুবই মুষড়ে পড়লেন আর গ্রামের লোক ভাবলো আবার কোনো অপমান বা শাস্তি দেওয়ার জন্য দুবেজী ওই সন্ন্যাসীদের খুঁজছেন। কিছুক্ষন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি ফিরে এলেন সার্কিট হাউসে, বিমর্ষ হয়ে বসে রইলেন বেলা একটা পর্যন্ত চুপচাপ, একটা চিঠি লিখে চৌকিদারকে বলে দিলেন তাঁর উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দিতে, তারপরে জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

অমিতানন্দজী সশিষ্য চলেছেন এগিয়ে নিমাবার, বরিয়া ঘাট হয়ে পাশি ঘাটের দিকে। আপন ভজনানন্দ ডুবে আছেন আপনাতে, শিষ্যরা শিবস্তোত্র গাইতে গাইতে চলেছেন। তাঁরা পাশি ঘাটে পৌঁছে ডেরাডান্ডা রেখে নিজেদের আসন লাগিয়ে মা নর্মদার পূজন সেরে ভোজন প্রসাদী প্রস্তুত করলেন এবং মা নর্মদাকে নিবেদন করে প্রসাদ পেলেন। বেলা চারটে নাগাদ হঠাৎ একটা জিপ এসে থামলো পাশি ঘাটে। দুবেজী নেমে তখন গিয়ে বসলেন অমিতানন্দজীর কাছে, তাঁকে দেখে অমিতানন্দজী সানন্দে অভ্যর্থনা করলেন এমনভাবে যেন তাঁর আসবার কথাই ছিল। তাঁকে ভোজন প্রসাদী দিয়ে ভোজন করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কি ব্যাপার? আমি তো আপনার আদেশ মেনে ছেড়ে চলে এসেছি সোনাডহর, আবার কি অপরাধ হল যে আপনি এখানেও চলে এলেন শাস্তি দিতে?” দুবেজী কিছুক্ষন চুপ করে থেকে অমিতানন্দজীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন এবং বারংবার অনুরোধ করতে লাগলেন তাঁকেও তাঁদের পরিক্রমাকারীর দলে নিতে। অমিতানন্দজী অনেক বোঝালেন এই পথচলার কঠিন ব্রত সম্পর্কে কিন্তু দুবেজী অনড় রইলেন তাঁর পরিক্রমার সংকল্পে এবং বার বার পায়ে পড়ে সাশ্রু নয়নে নিজের আগের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইতে লাগলেন। অবশেষে অমিতানন্দজী সম্মতি দিলেন তাঁর নর্মদা পরিক্রমার যাত্রায়। পরেরদিন ওই চল্লিশজন অবধূত সন্ন্যাসীদের দলের সঙ্গে পরিক্রমার চলা শুরু হল দুবেজীর কোট প্যান্ট পরে কিন্তু কপর্দকশূন্য অবস্থায়।

আস্তে আস্তে দিন পনেরো চলার পরে তাঁর কোট প্যান্ট ভীষন বোঝা মনে হতে লাগল দুবেজীর, মাস দেড়েক তবু রইলেন ওই বস্ত্রে, তারপরে একদিন কোট আর প্যান্ট দুটোকেই নর্মদার গর্ভে নিঃক্ষেপ করলেন, এখন তাঁর পরনে শুধু অন্তর্বাসটুকু। দেখতে দেখতে তিনশো কিলোমিটার চলার পরে দুমাসের মাথায় তিনি কৌপিন মাত্র সার করে চলতে চলতে এসে পৌঁছলেন হোসেঙ্গাবাদের আগে নর্মদার ঘাটে । সেখানে বসে আছেন একদিন দুপুরে, একটি ছোট মেয়ে তাঁর বাবাকে ডাকতে এসেছে ঘাটের নৌকো থেকে, তাঁর বাবা নৌকোর মাঝি, সে এসে বলল, “বাবা, বেলা শেষ হয়ে এলো, আর সময় নেই, এইবেলা শিগগির আপন ঘরে চলো, অনেক দেরী করেছো, আর বিলম্ব করো না নিজের কাজে।” খুবই সাধারণ কথা, কিন্তু দুবেজীর মনে হল যেন মেয়েটির মুখ দিয়ে মা নর্মদা এই বিলম্ব না করার আদেশ দিলেন, মনে করিয়ে দিলেন যেন আর সময় নেই তাঁর হাতে। আনমনা হয়ে ঘাটের কিনারে বসে তিনি শুনলেন কোথা থেকে যেন বড়ে গোলাম আলী খাঁয়ের ঠুংরী “ইয়াদ পিয়াকি আয়ে” যেটি হেমন্ত রাগে আধারিত ভেসে আসছে আশ্চর্য এক মনকেমন করা আবহ নিয়ে, সময়টা যেন থমকে গেছে। এক অদ্ভুত নির্লিপ্তি ও বৈরাগ্যে অন্তর ছেয়ে গেল তাঁর। অনুপম অনাবিল না পাওয়ার বেদনায় মন তাঁর ভারাক্রান্ত হয়ে গেল, চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল, একটু পরে অমিতানন্দজী তাঁকে ডাকলেন আর তিনি গিয়ে আপনার মন বুদ্ধি অহংকারকে তাঁর পায়ে সমর্পণ করতে চেয়ে দীক্ষা চাইলেন তাঁর কাছে। অমিতানন্দজী তাঁর মস্তকে হাত রেখে আশ্বস্ত করলেন, কয়েকদিনের মধ্যে দুবেজী দীক্ষিত হলেন শিবমন্ত্রে।

ক্রমে ক্রমে পথ চলতে চলতে নর্মদা মায়ের তোয় মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিব্যসত্তার অনুভব হতে লাগল দুবেজীর। গুরু সান্নিধ্যে ধীরে ধীরে তাঁর চেতনার স্তর উন্নীত হতে লাগল, পাঁচ বছর পরে তাঁদের পরিক্রমা শেষ হল সেই সোনাডহরে এসে।এখানে ব্যাসদেবের শিষ্য, শ্রীমদভাগবতের অন্যতম প্রবক্তা ঋষি ও বেদের প্রতিশাখ্য রচয়িতা ঋষি শৌনক তপস্যা করেছিলেন। তাই এই স্থান ভীষণ জাগ্রত। সংকল্প সিদ্ধির পুজো দিয়ে তিনি অমিতানন্দজীর সাথে গেলেন ওমকারেশ্বর, সেখান থেকে গুরুর সঙ্গে শেষ করলেন দ্বিতীয়বারের পরিক্রমা। দ্বিতীয়বার পরিক্রমা শেষে তাঁকে অমিতানন্দজী দিলেন সন্ন্যাস দীক্ষা, বিরজা হোম করে তিনি হলেন সন্ন্যাসী ধুমানন্দ অবধূত। শুরু হল তাঁর সোনাডহরে নর্মদা তীরে পিপল গাছের নিচে এক পায়ে দাঁড়িয়ে সাধনা, টানা এগারো বছর তাঁর এই সাধনা চলল, এই এক পায়ে দাঁড়িয়ে সাধনা করার জন্য স্থানীয় লোকজনের কাছে তাঁর নাম হল খাড়েশ্বরী মহারাজ, এই এগারো বছর সময় তিনি এক অদ্ভুত নির্লিপ্ত অবস্থায় ছিলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন তিনি অমিত যোগবিভূতির অধিকারী হয়ে। অমিতানন্দজীর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য তিনি, অমিতানন্দজী তাঁকে আপন সন্তান মনে করেন। একদিন নর্মদায় নেমে গুরুকৃপায় তিনি দর্শন পেলেন স্বর্ণলিঙ্গের আর স্বয়ং মহাদেবের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হলেন। ক্রমে নর্মদা মা ও মহাদেবের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন আশ্রম, মন্দির ও ধর্মশালা।

তাঁর অলৌকিক বিভূতির কথা এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল, সন্তানহীনের হল সন্তানলাভ, মৃত্যুপথযাত্রী পেল জীবন, দরিদ্রের হল ধনপ্রাপ্তি, আশ্রয়হীন পেল বাসস্থান তাঁর করুণায়, বহু অনাথ, আতুরের তিনি হলেন আশ্রয়স্থল। তাঁর যোগবিভূতিতে বহু মানুষ উপকৃত হলেন ওই সময়ে। একদিন তিনি বসে আছেন আশ্রমে এক গায়ক এসে তাঁকে গান শোনাতে চাইল, তাঁর শিষ্য বিদ্যানন্দ সেই গায়ককে নিয়ে গেল খাড়েশ্বরী মহারাজের কাছে, সে বসে শুরু করল গান হেমন্ত রাগে “তুম বিন জীবন কেয়সা জীবন”, আবার মহারাজের ভেতরে নাড়া পড়ল, আবার মনে হল অনেক সময় ধরে তিনি রয়েছেন পৃথিবীতে নিজের ইষ্ট, নিজের গুরুকে ছেড়ে। তখন তাঁর পঁচাত্তর বছর বয়স, পরেরদিন তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর ব্রহ্মলীন হবার দিন। ১৯৮৬ সালে দিন সময় বলে তিনি বসলেন যোগমুদ্রায় এবং সেই নির্দিষ্ট ক্ষণে তাঁর প্রাণবায়ু ব্রহ্মতালু ভেদ করে উর্ধলোকে বিলীন হল, পড়ে রইল তাঁর নশ্বর দেহ, তিনি ব্রহ্মলীন হলেন। এখন সেই আশ্রম, ধর্মশালা ও মন্দির দেখাশোনা করেন তাঁর শিষ্য বিদ্যানন্দ অবধূত। এখনো তাঁর যোগ ঐশ্বর্যের কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে।

হেমন্ত রাগ একটা এমন রাগ যা অন্তর ও বাহিরকে শান্ত করে মনকে এক অপার প্রশান্তিতে ভরে দেয়, অনন্তের প্রতি যেন আহ্বান করে অন্তরাত্মাকে, সময়ের কালস্রোত যেন থমকে যায় ওই রাগের সময়। বার বার তিনবার জীবনের তিনটি সময়ে এই হেমন্ত রাগ উমাশঙ্কর দুবেজীর প্রবৃত্তির প্রেয় জীবজীবনকে বিভিন্ন সময়ে প্রভাবিত করে নিবৃত্তির শ্রেয় শিবজীবনে উন্নীত করে তাঁকে উচ্চকোটির মহাত্মা খাড়েশ্বরী মহারাজ বা ধুমানন্দ অবধূতের এক জ্যোতির্ময় জীবন দান করল যা এখনো সেই অঞ্চলের লোক শ্রদ্ধাবনত হয়ে স্মরণ করে। সময়ের স্রোত সতত বহমান, কিন্তু সেই স্রোতে মানুষের সুকর্ম আর সাধনার ফল মিশে মানবজীবনকে করে তোলে মহাজীবন, মানবতার সেবাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড়ো সেবা।

॥মিড সি ব্লু কাঞ্জিভরম॥

ব্যাঙ্গালোরে চলছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান, গাইছেন এক প্রোথিতযশা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত মহিলাশিল্পী। স্নিগ্ধ শান্ত সৌন্দর্যের অধিকারিণী সেই ভক্তিমতী শিল্পী বেহাগ আর জৌনপুরী রাগ গাওয়ার পরে ধরলেন ভজন "অধরং মধুরং", সমস্ত শ্রোতারা অভিভূত, আপ্লুত, মানসচক্ষে সবাই যেন প্রত্যক্ষ করছেন শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ তাঁর সুরলহরীতে ভেসে গিয়ে, একসময় তাঁর ভজন শেষ হল। শ্রোতারা নির্বাক, স্তব্ধ। শিল্পী শ্রীলক্ষ্মীদেবী বিনম্র প্রণাম জানিয়ে মঞ্চ ত্যাগ করলেন।

মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসছেন তিনি, সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্বামী ভেঙ্কট আয়েঙ্গার। তিনি আগলে নিয়ে বেরোচ্ছেন স্ত্রীকে এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন উদ্যোক্তাদের সভাপতির সঙ্গে এক ভদ্রলোক, নাম বললেন শ্রীরামন, তিনি দক্ষিণভারতের অঙ্গদি রেশম তাঁতিদের কর্ণধার। তিনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর একনিষ্ঠ সংগীতরসিক। তিনি তাঁর প্রিয় শিল্পীর জন্য উপহারস্বরূপ এনেছেন একজোড়া মিড সি ব্লু কালারের বডি আর রানী কালারের পাড়ের কাঞ্জিভরম শাড়ি। পঞ্চাশের দশক তখন, ভারতবর্ষে তখন ব্যবহার হয় প্রাকৃতিক রঙ কাপড় ডাই করার জন্য। যেহেতু প্রাকৃতিক রঙ, তাই রঙের বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকটি রঙের মধ্যেই। তাই শাড়ির রঙ্গে বৈচিত্র্য কমই ছিল। এরপরে ষাটের দশকে দক্ষিণভারতীয় জনৈক বস্ত্রব্যবসায়ী শ্রীরমন প্রথম সুইজারল্যান্ড থেকে আনলেন রাসায়নিক রঙ এবং আমাদের বস্ত্রশিল্পে রঙের বিপ্লব ঘটিয়ে ফেললেন তিনি। না, না, আমি ভারতে রাসায়নিক রঙের ব্যবহারের ইতিবৃত্ত লিখতে বসিনি, এটুকু লিখলাম পাঠকের অবগতির জন্য।

শ্রীলক্ষ্মী দেবী নিজেকে ভীষন সাবেকি এবং রুচিশীল শাড়িতে সাজাতে ভালোবাসতেন,তিনি ঘটিহাতা ব্লাউস আর ট্রাডিশনাল দক্ষিণী শাড়ি পড়তে এমনিতেই ভালোবাসেন, কখনো সেটা ডাবল কালারের পাড়ের শাড়ি তো কখনো একরঙা পাড়ের শাড়ি। এই মিড সি ব্লু কাঞ্জিভরম, তার সঙ্গে তাঁর হীরের নাকছাবি, হীরের আংটি, হীরের কানের টপ আর হীরের পেন্ডেন্ট আর তাঁর ঐশ্বরিক কণ্ঠ এই চারের মেল বন্ধনে এক দিব্য সুষমা যোগ করল তাঁর ব্যক্তিত্বে, এটা হয়ে গেল তাঁর লিগ্যাসি, তাঁর ব্র্যান্ড। এই নতুন রংটিতে ঐ কাঞ্জিভরম জোড়া বুনিয়ে শ্রীরামন এনে প্রথম তাঁর শ্রদ্ধার স্মারক হিসেবে দিলেন শিল্পীকে। তিনি প্রথম যেদিন ঐ শাড়ির একটি পরে জনসমক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন সেদিন ঐ অনন্য রংটির রহস্য সম্পর্কে জানতে সবার প্রচন্ড কৌতূহল হল।সেদিন তিনি মনপ্রাণ ঢেলে নিবেদন করলেন আদি শঙ্করাচার্যের পদ "ভজ গোবিন্দম", তাঁর অনুপম কণ্ঠ মাধুর্যের সুষমায়, হৃদয়ের সমর্পণের অতুলনীয় ভক্তিতে ও স্নিগ্ধ দিব্য রূপের অপূর্ব মিলনে আরেকটা পালক যোগ করল তাঁর সেই মিড সি ব্লু কাঞ্জিভরম। শ্রোতারা বাকরুদ্ধ হয়ে শ্রদ্ধায় নতজানু হল তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্বের কাছে, তাঁর গুণের কাছে।

এই অদ্ভুত ব্লু বা নীল রঙ নিয়ে পঞ্চাশের দশক থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন শ্রীরামন ভদ্রলোক। শেষ পর্যন্ত তাঁর আকাঙ্ক্ষিত রংটি পেতে তিনি প্রথম সেই রঙের শাড়ি জোড়া বানালেন তাঁর প্রিয় এই অভিজাত শিল্পীর জন্য, তাঁকে উপহার দিলেন ১৯৮৬ সালে এবং তাঁর নামেই কাঞ্জিভরমের ওই ব্রান্ডের নাম দিলেন "এস এল ব্লু" বলে কারণ সেই সময় শ্রীলক্ষ্মীদেবী যত প্রোগ্রাম করতেন, বেশিরভাগ প্রোগ্রামে এই শাড়ি পরেই

প্রোগ্রাম করতেন আর সেই কারণেই এই ব্র্যান্ডের জনপ্রিয়তা পৌঁছল তুঙ্গে। অঙ্গদি তাঁতিরা নিজেদের গর্বিত মনে করতেন ওই অনন্য ব্লু রঙের শাড়ির জন্য যেটি শ্রীলক্ষ্মীর মতো একজন কিংবদন্তী শিল্পী ব্যবহার করছেন সর্বদা। শ্রীলক্ষ্মী নিজেও ছিলেন এই অঙ্গদি পরিবারের একনিষ্ট পৃষ্ঠপোষক।

প্রায় ছশো বছরের রেশম বয়নের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অঙ্গদি, তাঁদের সুনিপুন প্রস্তুতকারক সুবিধা ও সূক্ষ্ম ক্লায়েন্টেলে রেখেছিল প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, জয়পুরের মহারানী গায়ত্রীদেবী, মাইসোরের মহারানী প্রমোদা দেবী, চিত্রতারকা নার্গিস প্রমুখ সম্মানিত এবং অভিজাত মহিলাদের।

এহেন শ্রীলক্ষ্মীদেবীর চতুর্থ প্রজন্মের গায়িকা গায়ত্রীর আজ প্রথম সর্বভারতীয় সঙ্গীতের মঞ্চে অভিষেক হবে, প্রতিযোগী হিসেবে যারা আসছে তারা এক এক জন তরুণ কিন্তু দিকপাল সংগীতসাধক। গায়ত্রী শাড়িতে একদম স্বচ্ছন্দ নয়, তাই সে অন্য কোনো পোশাকে গাইতে বসবে ঠিক করে রেখেছে যদিও তার মা বারবার তাকে “এস এল ব্লু” কালারের তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী অঙ্গদির শাড়িটাই পরে স্টেজে উঠতে বলেছেন। সকাল থেকে সে অনেক পোশাক বেছে চলেছে কিন্তু কোনোটাই তাঁর মনোমত হচ্ছে না। শেষে তার আলমারিতে একদম নিচে রাখা সেই শাড়িটাই সে বের করল এবং নিজের গায়ে ফেলে আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কেমন মোহগ্রস্ত হয়ে গেল। সে যেন মানসচক্ষে দেখতে পেল সেই প্রপিতামহীকে যিনি স্টেজে বসে গাইছেন তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ কিন্নর কণ্ঠে “ভজ গোবিন্দম”, ঘটনার সমাপতন এমনই যে গায়ত্রী নিজেও আজকে রাগসঙ্গীতের সাথে পরিবেশন করতে চলেছে “ভজ গোবিন্দম।” আয়নার মধ্যে দিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে শেষ মুহূর্তে সে ঠিক করল আজকে সে শাড়ি পড়েই গাইবে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে।

বিকেল পাঁচটায় প্রতিযোগিতা শুরু হল, আটটার সময় গায়ত্রীর নাম ঘোষিত হবার পরে সে মঞ্চে উঠল যখন মঞ্চকে প্রণাম করে, তখন শ্রোতারা সবিস্ময়ে দেখল তার পরনে সেই মিড সি ব্লু কাঞ্জিভরম, তার সঙ্গে মানানসই হীরের গহনা আর তার অপূর্ব স্নিগ্ধ অনুপম সৌন্দর্য। সে শুরু করল সর্বমঙ্গলময় রাগ ইমন দিয়ে, আলাপ, তান, বিস্তারের পরে যখন সে তার পরিবেশনা শেষ করল ওই রাগের, শ্রোতারা ততোক্ষণে ভেসে গেছে সুরলোকে, এরপরে ভৈরবীতে একটা ঠুংরী গেয়ে সে ধরল তার শেষ নিবেদন “ভজ গোবিন্দম।” একসময় শেষ হল সেই পরিবেশনা, শ্রোতারা স্তব্ধ, আপ্লুত, অভিভূত। সে নেমে এসে বসলো পরের শিল্পীদের পরিবেশনা শুনতে, সারারাত ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে আরো অনেকেই গাইলেন, অপূর্ব গাইলেন তাঁরা প্রত্যেকে। প্রতিযোগীতা শেষ হল, দুদিন পরে ফলাফল প্রকাশের দিনে অনুষ্ঠান শুরু হল শ্রীপুর্বিত চট্টোপাধ্যায়ের সরোদবাদন দিয়ে, পুর্বিত চট্টোপাধ্যায়ের সরোদবাদন ভারী মন কাড়লো গায়ত্রীর। তারপরে ঘোষিত হল ফলাফল, গায়ত্রী প্রথম স্থান অর্জন করে “শ্রীলক্ষ্মী স্মারক সম্মানে” সম্মানিত হল যেটি তারই প্রপিতামহীর স্মরণে দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত সব নির্বাচক ও বিচারকেরা একবাক্য স্বীকার করলেন গায়ত্রীকে দেখে, তার পরিবেশনা শুনে তাঁরা বার বার মনে করেছেন শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে। আরো বেশী সেই স্মৃতি নাড়া দিয়েছে সেই একই মিড সি ব্লু কাঞ্জিভরম শাড়ি পরে একইভাবে পরিবেশিত হওয়া তার “ভজ গোবিন্দম” শুনে। পুরস্কৃত ও সম্মানিত গায়ত্রী পুরস্কার নেওয়ার সময়ে সিদ্ধান্ত নিল এরপর থেকে যেখানেই সে যখন গাইবে ওই মিড সি ব্লু কাঞ্জিভরমেই ওইভাবে গাইবে। তার সেই প্রপিতামহী সঙ্গীতের জয়যাত্রা এভাবেই সে এগিয়ে নিয়ে যাবে তার মধ্যে দিয়ে তার গায়কি,

শিক্ষা, পারিবারিক ঐতিহ্য, সৌন্দর্য ও সেই অনন্য শাড়িখানি দিয়ে। পরবর্তীকালে সে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হল পুর্বিতের সঙ্গে।

॥আনন্দ দিন॥

দুই ভাইয়ের এক বোন মহুয়া। দাদা জয়দীপ আর ছোড়দা সন্দীপের তো বটেই মা সুষমাদেবীর আর বাবা সুখময় বাবুরও ভীষণ আদরের মেয়ে সে। ওদের ভাই বোন সকলেরই পড়াশোনা বাংলা মিডিয়ামে, কিন্তু সবাই পড়াশোনায় ভালো। জয়দীপ তো এক্সট্রা অর্ডিনারি, স্কুলের থেকে রেকর্ড মার্কস নিয়ে পাশ করল মাধ্যমিক, এগারো বারো ক্লাস পড়ল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন,সমস্ত কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় চান্স পেল, ষ্টার নিয়ে পাশ করল উচ্চ মাধ্যমিক। পড়তে গেল খড়্গপুর আই আই টিতে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, সেখানেও ভালো রেজাল্ট করে চাকরি পেল আমেরিকার আটলান্টায়, ছমাস সেখানে থাকবে, ছমাস ভারতে। এরপরে প্রেম করা হয়নি বলে প্রেমে পড়ল বন্ধুর বোন চন্দ্রিমার যে ফিজিক্সে এম এস সি করেছে। চন্দ্রিমাকেই বিয়ে করে আমেরিকাতে রয়ে গেলেও বোন মহুয়ার জন্য তার প্রাণের টান একই রকম আছে। ছোড়দা সন্দীপও ভালোই পড়াশোনায়, সেও ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে দুর্গাপুরে ভালো চাকরি করছে। আর মহুয়া, সেও পড়াশোনায় ভালোই, পুতুল পুতুল মিষ্টি দেখতে মহুয়াকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

এহেন মহুয়ার জন্য দেখে শুনে বাবা মা বিয়ের ঠিক করলেন নাগপুরের ব্যাংকের ম্যানেজার নিলয়ের সাথে। দাদা জয়দীপ প্রচুর খরচ করল একমাত্র বোনের বিয়েতে। সন্দীপও তার সাধ্যমতো খরচ করল, রীতিমতো নগদ টাকা পয়সা, নমস্কারী, গয়না গাটি, দানের বাসন দিয়ে মহুয়ার সঙ্গে নিলয়ের বিয়ে হয়ে গেল। নাগপুরের বাড়িতে নিলয় থাকে তার মা বাবা আর খুড়তুতো বোনের সাথে। নিলয়ের বাবার চার পুরুষের কাঠের ফার্নিচারের ব্যবসা, নাগপুরের অত্যন্ত ধনী পরিবার তারা। মহুয়ার সঙ্গে বিয়ের পরে পরেই নিলয়ের একটা প্রমোশন হল। মহুয়া লক্ষ্য করল নিলয়ের সে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী হলেও নিলয়ের খুড়তুতো বোন রুমির সঙ্গেই বেশী ঘনিষ্ঠতা যেন নিলয়ের। ঘুম থেকে উঠে অফিসে যাবার আগে পর্যন্ত নিলয় রুমির ঘরেই কাটায়, আবার ফিরে এসে শোয়ার আগে পর্যন্ত রুমির ঘরেই কাটায়। মহুয়া ভাবল ভাই বোনের এতদিনের সম্পর্ক, সেটা এমন হওয়াই স্বাভাবিক, ওরও তো ছোড়দার জন্য মনকেমন করে। তেমন অমল দিল না সে। এদিকে নিলয়ের ড্রিঙ্ক করার অভ্যেস আছে, একমাত্র মহুয়া ছাড়া ওর শ্বশুড়বাড়ির সকলেই ড্রিঙ্ক করে, সেটাই নাকি হাই সোসাইটির দস্তুর। মহুয়া চুপচাপ শোনে, এমনিতেও সে স্বভাবে খুবই শান্ত আর মিতভাষী। তাই সে শোনে আর দেখে বেশি, বলে কম। এভাবেই মাস দুয়েক গেল।

এক ছুটির দিনে দুপুরে শাশুড়ি ডাকতে বললেন নিলয়কে শাশুড়ির কী একটা দরকারে। মহুয়া রুমির ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখল দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ অথচ ভেতরে নিলয়ের উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছে তার ছেড়ে রাখা চটিজোড়া দিয়ে। সে ইতস্তত করে ডাকতে যাবে এইসময় শুনল তীব্র আশ্লেষের সঙ্গে মিলনের শিৎকারের আবছা আওয়াজ, তার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল, সে দরজার ফ্রেমটা ধরে নিজেকে সামলে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল একবুক হতাশা নিয়ে। এবার কী করবে সে? মাথাটা পুরো খালি লাগছে তার। এদিকে শাশুড়ি ছেলেকে না পেয়ে কিছু একটা আঁচ করেছেন। তিনি ঘরে এসে নরম সুরে বললেন, “কী ব্যাপার রে তোর? বাবুকে পেলি না বুঝি, ঠিক আছে তুই বিশ্রাম নে, আমি দেখি পরে কথা বলব ওর সাথে।” বলেই তাঁর চোখ পড়ল মহুয়ার মুখের দিকে, চোখে জলের দাগ আর হতাশ মুখ দেখে তিনি মাথায় হাত রেখে বললেন, “আমি এবার বুঝেছি, তুই মন খারাপ

করিস না, আমাদের যা আছে তোর কোনো অভাব থাকবে না, শুধু একটু মানিয়ে নে।” বলে বেরিয়ে গেলেন। মনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হোল মহুয়ার, বাপের বাড়িতে ফিরে যাবে না এখানেই থেকে যাবে, ভীষণ দোটানায় পড়ল ও? এমন সময় দাদাভাই জয়দীপ একদিন ফোন করল বোনের খোঁজ নিতে আমেরিকা থেকে। ‘বলব না’ ‘বলব না’ করেও বলে ফেলল ও এই ঘটনা। দাদাভাই সব শুনে ওকে বলল মুখে কোনো কথা আর প্রকাশ না করে স্যুটকেস গুছিয়ে ট্রেনে উঠে বসতে, কারণ নাগপুরে নিলয়দের প্রভাব প্রতিপত্তি আছে ভালোই, তাই ওকে পালাতে হবে ওদের মুঠো থেকে ওদের বিন্দুমাত্র জানতে না দিয়ে, আর পারলে যেন ও ওর যাবতীয় গয়নাগাটি নিয়ে চলে আসে।

একটা রবিবার রাত্রে মহুয়া সব গয়নাগাটি ভরে রাখলো স্যুটকেসে,আর একটা ব্যাগে ভরল নিলয়ের আলমারিতে থরে থরে সাজানো নোটের বান্ডিলের বেশ কয়েকটা, সেদিন রাত্রে নিলয় রুমির ঘরে শুয়ে পড়েছে। পরেরদিন সোমবার মহুয়া ভোরের আলো ফোটার আগে এসে দাঁড়ালো নাগপুর স্টেশনে। ভাগ্যক্রমে দুর্গাপুর হয়ে যাবে যে বোম্বে মেল সেই ট্রেন পেয়ে গেল, জেনারেল কম্পার্টমেন্টেই উঠে বসল সে। ট্রেন ছেড়ে ঘন্টা দুয়েক যেতে সে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। পরেরদিন সন্ধ্যেবেলায় নামল দুর্গাপুরে।

কোনোরকমে গিয়ে যখন মা বাবা ছোড়দার সামনে দাঁড়ালো তখন ওর আর শরীরের আর মনের ওপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। মা বাবা আগেই শুনেছিলেন সব জয়দীপের কাছে, ওকে কাছে পেয়ে তারাও স্বস্তি পেলেন। তারপরে বেশ কিছুদিন কোর্ট কাছারির চক্করে ওর কাটল। দুবছর পরে ডিভোর্স হোল, নিলয়রা কিছুই ফেরত দিল না, মহুয়ার বাপের বাড়ি থেকেও খুব কিছু জোর করল না কারণ মহুয়া ওর গয়নার সঙ্গে প্রায় কুড়ি লাখ টাকা নিয়ে এসেছিল ভরে ব্যাগে যেটা আসলে ব্ল্যাক মানি নিলয়দের। তাই সেই টাকার কথা ওরাও আর উল্লেখ করল না। তবু নিলয়ের বাবা খোরপোষ বাবদ মোটা টাকা দিতে চেয়েছিলেন, সুখময়বাবু সবিনয়ে তাঁর অক্ষমতা ব্যক্ত করলেন সে ব্যাপারে। মহুয়ার ডিভোর্স হয়ে গেল যেটার জন্য ও বিন্দুমাত্র দায়ী নয়। রাতারাতি জীবনটা যেন কেমন পাল্টে গেল ওর। অথচ মহুয়ার চাকরি করার মানসিকতা কোনোদিন নেই। সে বরাবরই ভেবে এসেছে গুছিয়ে সংসার করবে, বাড়িতেও সেই চিন্তা ধারতেই বড়ো হয়েছে।

বাবা মায়ের ভালোবাসায় কোনো খামতি নেই, কিন্তু তাদের বুকে কে যেন পাথর চাপিয়ে দিয়েছে, মায়ের সুগার ধরা পড়ল, বাবার হার্টের সমস্যা শুরু হোলমহুয়া ফিরে আসার ছ মাসের মধ্যে। মহুয়া নিজের কাছেই নিজে অপরাধী হয়ে আছে মা বাবার এই হঠাৎ অসুস্থতার জন্য। একমাত্র ছোড়দা সন্দীপ খুব খুশি বোনকে আবার কাছে পেয়ে, নানান মজার কথা বলে, সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে, এটা সেটা এনে ওকে দিয়ে ওর মনটা অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করে। বেচারা কিছুতেই বুঝতে পারে না কী করলে বোনটা আবার আগের মত হয়ে যাবে। এরমধ্যে বড়দাদা জয়দীপ এসেছে, বোনকে বলে গেছে কোনো চিন্তা না করতে, ও আমেরিকায় ছেলে দেখছে, সেখানে বোনের বিয়ে দেবে, বোন একদম চোখের সামনে থাকবে।

সেদিন খুব গরম, এমনিতেই দুর্গাপুর শুকনো জায়গা, গরমটা বেশিই পড়ে, সেদিন একেবারে সকাল থেকে বাইরেটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। বাবা আর ছোড়দা অফিসে চলে গেছে, মহুয়া আর সুষমাদেবী খেয়ে দেয়ে ঘর অন্ধকার

করে শুয়েছে মেঝেতে ভালো করে ধুয়ে মুছে। তারপরে ঘুমিয়ে গেছে মহুয়া। বেশ কিছুক্ষন পরে সুষমাদেবী উঠেছেন বিকেলে জলের আওয়াজ পেয়ে, মহুয়া ঘুমের মধ্যে অনুভব করছে একটা ঠান্ডা কিছু তার মাথার নীচে, অনুভূতিটা প্রবল হতেই উঠে বসে ও আলো জ্বালাল আর দেখেই শিউরে উঠল, মহুয়া শুয়ে ছিল বালিশের নীচে কুন্ডলি পাকানো একটা গোখরো সাপ নিয়ে যেটা মেঝের ঠান্ডা পেয়ে কুন্ডলী পাকিয়ে তখনো শুয়ে আছে। মহুয়া মাকে ডাকল, সুষমাদেবী তো ভয় পেয়েই অস্থির, কিন্তু ওরা কিছু করার আগেই সেটা চলে গেল আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে।

দেখতে দেখতে দুটো বছর আরো গেল মহুয়াদের পরিবারের। জয়দীপ ঠিক মনোমত ছেলে পাচ্ছে না বোনের জন্য, তাই কিছুতেই এগোতে পারছে না । তায় তারা ঘর পোড়া গরু, অনেক ভাবনা চিন্তা করতে হচ্ছে জয়দীপকেও। সন্দীপের সব বন্ধুরা চেনে মহুয়াকে ছোট থেকে, সবাইয়ের খুব সহানুভূতি আছে মহুয়ার ব্যাপারে। এরমধ্যে সুদর্শন অমিতাভ কবে যেন নিজের অজান্তেই মহুয়াকে নিজের মন দিয়ে ফেলেছে। মহুয়া টের পায় অমিতাভর মুগ্ধতা কিন্তু তার বড়ো ভয় করে, তাছাড়া মহুয়ারা ব্রাহ্মণ, অমিতাভরা কায়স্থ, তাই তার ভালোলাগা সে বুঝতে দেয় না।

সেদিন পয়লা জানুয়ারী, নতুন বছরের প্রথম দিন, সেদিন সকাল থেকে ছোড়দা কারণে অকারণে মহুয়ার পেছনে লেগে যাচ্ছে সমানে আর হেসে যাচ্ছে। বেলা দশটা নাগাদ দুটো রিক্সা থামল ওদের বাড়ির সামনে, আর তার থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা, অমিতাভ আর ওর ভাই অসিতাভ। চারজনেই ওদের বাড়িতে ঢুকল। সেদিন মহুয়ার বাবার ই সি জি হবে বলে তিনি বাড়িতে আর ছোড়দা সন্দীপ নিয়ে যাবে বাবাকে তাই সেও ছুটি নিয়েছে। বাবা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন অমিতাভর বাবা সুবিমলবাবুর দিকে। এবারে সন্দীপ এগিয়ে এসে ওঁদের ভেতরে এনে বসালো। তারপরে সুবিমলবাবু সুখময় বাবুর কাছে হাত জোড় করে বললেন, “আমি অমিতাভর বাবা, আমাদের সবায়ের মহুয়া মাকে খুব পছন্দ কিন্তু যেহেতু আপনারা ব্রাহ্মণ তাই বলতে সংকোচ হচ্ছে, তাছাড়া আমার ছেলে যদিও ভালোই চাকরি করে এ এস পিতে কিন্তু আপনার ছেলেদের মত উচ্চ শিক্ষিত নয়, সাধারণ এম এস সি পাশ অংক নিয়ে। আমরা মহুয়ার সব ঘটনা জেনে শুনেই এসেছি , যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে আমরা আজই পাকা কথা বলে দিন স্থির করে যেতে চাই। এবারে আপনারা বলুন আপনাদের অভিমত।” সুখময়বাবু আর সুষমাদেবী দুজনেই অভিভূত হয়ে গেলেন সুবিমলবাবুর মহানুভবতায় আর ব্যবহারে, সুখময়বাবু জয়দীপকে ফোন করলেন সঙ্গে সঙ্গে, একদম পরিচিত পরিমন্ডলের পরিবার বলে আর অমিতাভকে খুব ভালো ভাবে অনেকদিন ধরে চেনে বলে জয়দীপ এক কথায় রাজি হোল এই প্রস্তাবে।

অনেকদিন পরে বাড়িতে খুশির বান ডাকল । ঠিক হোল ফেব্রুয়ারীর পাঁচ তারিখে বিয়ে হবে। বিয়ে হোল, মহুয়া খুব সুখেই কাটাতে লাগল জীবন, এক বছর পরে মহুয়ার মেয়ে হোল সেটাও পয়লা জানুয়ারিতে। মেয়ে, অমিতাভ শ্বশুর শাশুড়িকে নিয়ে দিন কাটতে লাগল ওর। দেখতে দেখতে মেয়ে বড়ো হোল, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে গেল, সেটাও পয়লা জানুয়ারি। দুবছর পরে ফিরে হায়দরাবাদে চাকরিতে ঢুকল সেটাও পয়লা জানুয়ারি। তাই মহুয়ার জীবনে পয়লা জানুয়ারী বেশিরভাগ সময়ে হ্যাপিই হয়েছে, আনন্দ দিন হয়ে রয়েছে।

॥সোলমেট॥

মামারবাড়ি বেড়াতে এসেছে সৃজনী ছুটিতে মায়ের সঙ্গে বারো ক্লাসে পড়ার সময়ে। এসেই আশেপাশের জায়গায় ঘুরতে ব্যস্ত হয়ে গেছে মামাতো দাদা দিদিদের সঙ্গে। একদিন সন্ধেবেলায় ফিরে এসে দেখল বাড়িতে মা, দিদা কেউ নেই, মায়ের ছোটমামার বাড়িতে গেছে দেখা করতে। মা আর দিদা ফিরলেন রাত সাড়ে নটায়। ফিরে এসে মা খুব খুশি, কিছুদিনের মধ্যে মায়ের ছোট ভাই চন্দনের প্রাণের বন্ধু পীযুষ যাচ্ছে তিন মাসের ট্রেনি হয়ে সৃজনীর বাবার অফিসে।পীযুষ যাদবপুরের কেমিকাল ইঞ্জিনারিং এর ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট, ভীষণ ভালো পড়াশোনায়। মা আর দিদা দুজনেই পীযুষকে খুব স্নেহ করেন কারণ পীযুষকে ওঁরা ছোটোর থেকে চন্দনের সঙ্গেই বড়ো হতে দেখেছেন।

যথাসময় সৃজনী, ওর বোন সৃষ্টি আর মা ফিরে এলো ওদের বাবার কর্মস্থলে ভাইজাগে। তার কয়েকদিন পরে এক রবিবার ওরা সকালের জলখাবার খাবে, সৃজনী লুচি বেলছে আর মা ভাজছেন এমন সময় তাদের ফ্ল্যাটের বেল বাজল। সৃজনীই উঠে দরজা খুলল, খুলে দেখে একজন অপরিচিত অল্পবয়সী ছেলে মাকেই খুঁজছে। সৃজনী মাকে ডেকে দিল, মা এসে “ওমা তুই,আয় আয় ভেতরে আয়” বলে হাত ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে একেবারে তাদের ডাইনিং হলের টেবিলে এনে বসালো। সাধারণতঃ বাইরের লোক এলে তাঁকে ড্রয়িং রুমেই বসানো হয়। একে ওইভাবে সমাদরে ভেতরে নিয়ে আসতে সৃজনী আর ওর বাবা দুজনেই অবাক হল। মা কিন্তু সৃজনী আর ওর বাবা অমিতকে আলাপ করালো “এই সেই পীযুষ” বলে। তার আগে মা অনেকবার সুখ্যাতি করেছেন পীযুষের আর বলেছেন “কোলকাতার ছেলে, তায় ইঞ্জিনিয়ার, ও এখানকার কাউকে পাত্তাই দেবে না দেখিস।” মা আলাপ করানোর পরে সৃজনীকে বললেন সবাইকে খাবারটা দিয়ে দিতে। সৃজনী দিল, মা আর বাবা দুজনেই অনেক গল্প করল সারাদিন পীযুষের সঙ্গে, শেষে ঠিক হল পীযুষ প্রতি শুক্রবার ট্রেনিংয়ের সেরে চলে আসবে সৃজনীদের বাড়িতে আর সোমবারে ওখান থেকেই অমিতবাবুর সঙ্গে চলে যাবে অফিসে। সৃজনীর মাকে পীযুষ বলে ছোড়দি যেহেতু মায়ের মামাতো ভাই সৃজনীর মাকে ছোড়দি বলে আর অমিতবাবুকে ডাকে জামাইবাবু। সৃজনী শুনলো পীযুষ ওর থেকে মাত্র বছর চারেকের বড়ো।

এর মধ্যে কথায় কথায় বেরোলো যে পীযুষ বহুদিন গণনাট্য সংঘের সাথে যুক্ত আছে, ভালো গান করে, আবৃত্তি করে, ভীষণ ভালো সেন্স অফ হিউমার। সৃজনীদের বাড়িতে সবার সঙ্গে একদম মিশে গেল পীযুষ, কিন্তু যেহেতু মামার বন্ধু তাই সৃজনীকে মা বললেন পীযুষকে পীযুষের ডাকনাম ফুচু সেই ফুচুমামা বলতে। সৃজনী পিওর সায়েন্স নিয়ে পড়ছে মা বাবার ইচ্ছেয়, ওর ফিজিক্স আর অংক তেমন সড়গড় নয়, তাই শুনে পীযুষ দায়িত্ব নিয়ে নিল ওকে এই দুটো সাবজেক্ট দেখিয়ে দেবে বলে আর দেখাতেও লাগল। ক্রমে এমন হল পীযুষ সৃজনীর সঙ্গেই ঘন্টার পর ঘন্টা রাত জেগে গল্প করতে লাগল, সৃজনীর টিউশন থাকে যেদিন সেদিন পীযুষ এসে অপেক্ষায় থাকে ওর সঙ্গে চা বা ডিনার খাবে বলে। সৃজনী নিজে ভালো গান করে, শিখেছেও বহুদিন,রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদ, লোকগান খুবই ভালো গায়,আবার ভীষণ রকমের সাহিত্যপ্রেমী, বাংলা, ইংরেজি

সাহিত্য দুটোই নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা আছে ওর, ফলে পীযুষের সঙ্গে গান, সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে বসলে দুজনেরই সময়ের খেয়াল থাকে না।

গানে, গল্পে, আড্ডায়, ঘোরায় দেখতে দেখতে তিনমাসের ট্রেনিং পিরিয়ড কেটে গেল ফুচুর। যেদিন ফুচুর লাস্ট ট্রেনিং ডে ছিল, ওকে বেস্ট পারফরমেন্সের সার্টিফিকেট দিল অমিতবাবুর অফিস থেকে। ফুচু সেদিন এলো একদম ওর লাগেজ নিয়ে, ওদের বাড়ির থেকেই ও কলকাতায় ফিরবে, এর মধ্যে ওর ক্যাম্পাস সিলেকশন হয়ে গেল হিন্দুস্থান পলিমারে। পরেরদিন বিকেলে মা বাবা বোন সৃষ্টিকে নিয়ে গেল স্থানীয় বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে। বাড়িতে পীযুষ বা ফুচু আর সৃজনী রইল। ফুচুর হঠাৎ খেয়াল হল ওর ব্যাগের চেনটা কাজ করছে না, সৃজনী সেই শুনে বলল, "চল আমার সঙ্গে, কাছেই একটা দোকান আছে, ওরা এইসব সারায়", দুজনে গিয়ে চেন সারিয়ে ফিরে এলো। সৃজনী গেল কিচেনে চা করতে। চা করে এনে ফুচুকে দিল, সৃজনী দেখল ফুচু একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে। ও তাড়া লাগালো ফুচুকে চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে বলে, হঠাৎ ফুচু চেয়ার ছেড়ে এসে ওর হাতটা ধরে বলল, "আমায় ছেড়ে থাকতে তোর কষ্ট হবে না, না রে? আমি এতদিন এখানে নিয়ম করে আসতাম শুধু তোর জন্য, সোমবার ফিরে গিয়ে দিন গুনতাম কবে শুক্রবার বিকেলটা আসবে আর তোর সাথে দেখা হবে?" সৃজনী ভীষণ অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ খারাপ লাগবে তো, কিন্তু তুমি তো এখন চাকরিতে ঢুকবে, কী আর করা যাবে বল, তাছাড়া তুমি কোলকাতার ছেলে, আমার মত প্রবাসী বাঙ্গালী মেয়ের কথা তোমারই কী মনে থাকবে ফুচুমামা ?" ফুচু আরো কাছে এসে ওর কাঁধে দুটো হাত দিয়ে বলল, "আমায় বিয়ে করবি? আমি তোকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। এতো বছর কলকাতায় পড়াশোনা করেছি, প্রচুর মেয়ে দেখলাম তো, তুই একদম আলাদা, তোর মধ্যে আগুন আছে। তুই কী আমাকে তোর সারাজীবনের পথ চলার সঙ্গী হতে দিবি?" সৃজনী এতটা অবাক হয়েছে যে ওর কথা বলার অবস্থা নেই, কিন্তু এটাও ঠিক যে ফুচুকে ও কখন নিজের সবচেয়ে কাছের জন ভেবে বসে আছে। কিছুক্ষন চুপ করে থেকে ও বলল, "আমিও যে তোমার মাঝেই আমার সবটুকু দেখেছি, কিন্তু তুমি চাকরি পেয়ে গেলেও আমার এখনো হায়ার সেকেন্ডারিটাও হয়নি আর আমি কিন্তু পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে চাই ।" ফুচু বলল, "তুই 'হ্যাঁ' বল, আমি তাহলে একটু শান্তি নিয়ে ফিরতে পারি।" সৃজনী নিজের আরেকটা হাত রাখল ফুচুর হাতের ওপরে। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কতক্ষন দাঁড়িয়ে ছিল জানে না, ওদের সংবিৎ ফিরল মা বাবার বেলের আওয়াজে। ফুচু গিয়ে দরজা খুলল।

সৃজনীর মনে বাজতে রইল, "আমারও পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো।" সদ্য সতেরোর সৃজনী তার অপরিণত মনে প্রথমে বুঝতেই পারেনি কখন সে মনে মনে ফুচুর কাছে সমর্পিত হয়ে বসে আছে আর সৃজনীকে প্রথম দেখাতেই ফুচু প্রেমে পড়েছে কিন্তু প্রকাশ করেনি পাছে সৃজনী বা সৃজনীর বাড়ির লোক বাধা দেয়। ভীষণ টেনশনে ছিল ফুচু। আজকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সৃজনীকে প্রপোজ করে ওর সম্মতি পেয়ে ওর মনে হচ্ছে "ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে।" সেদিন রাত্রে সারারাত দুজনের কেউই ঘুমোতে পারল না। নতুন প্রেমের উচ্ছলতায় দুজনেই নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে নানান আকাশকুসুম ভেবে ভেবে রাত কাটিয়ে দিল। পরেরদিন যাবার আগে একটু অবসর দেখে ভালোবাসার চিহ্নস্বরূপ গভীর চুম্বন করল দুজনে দুজনকে।

ফুচু চলে গেল। সৃজনীর সমস্ত পৃথিবীটা মনে হল অন্ধকার হয়ে গেল, খাচ্ছে, পড়াশোনা নিয়ে বসছে, স্কুলে যাচ্ছে কিন্তু সব আনন্দ যেন চলে গেছে ফুচুর সঙ্গে। বার বার কারণে অকারণে গাইছে, "হৃদয়ের একুল ওকুল দুকূল ভেসে যায়, হায় সজনী, উথলে নয়নবারি" অকারণেই মাঝে মাঝে চোখে জল আসছে, মনে পড়ছে চন্ডিদাসের পূর্বরাগের পদ, "রাধার কী হইল অন্তরের ব্যথা।" ক্রমে ওর পরীক্ষা হল, রেজাল্ট বেরোল, ভালো রেজাল্টই হল সৃজনীর কিন্তু জয়েন্টে চান্স পেল না সৃজনী। ফুচু তাতে খুশি হয়ে বলল, "তুই ডাক্তারি পড়ে ডাক্তার হয়ে যখন বেরোতিস তোর চুলে পাক ধরে যেত, ভালো হয়েছে তুই জয়েন্টে চান্স পাস নি।" ফুচুর সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ আছে, কিন্তু সেখানে খুব সাবধানে চিঠি লিখতে হয় দুজনকেই, মা দুজনের চিঠিই পড়েন।এর মধ্যে কলেজে ইংলিশ অনার্স নিয়ে ভর্তি হল সৃজনী, ফুচু ততদিনে চাকরিতে জয়েন করে গেছে। মজার কথা, ফুচু যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ব্লু হয়ে চাকরিতে ঢুকে প্রথম ছুটি পেল এক বছরের মাথায়, ও কলকাতায় নিজের বাড়িতে না গিয়ে এলো ভাইজাগে সৃজনীদের বাড়িতে। সেখানে কথা প্রসঙ্গে জানালো যে ও ইন্ডিয়ান অয়েল আর ও এন জি সি দুটো জায়গাতেই ইন্টারভিউ দিয়েছে, দুটোতেই সিলেক্টেড, এখন ডিসাইড করতে পারছে না কোথায় জয়েন করবে। সৃজনীর মতামত চাইলে সৃজনী বলল ইন্ডিয়ান অয়েলে জয়েন করতে, তাই করল ফুচু।

দেখতে দেখতে আরো তিনটে বছর কেটে গেল, সৃজনীর এখন এম এ ফার্স্ট ইয়ার। এবারে মা বাবা উঠে পড়ে লেগেছেন মেয়েকে পাত্রস্থ করতে, সৃজনী সংকোচে বলে উঠতে পারেনি ফুচুর সাথে ওর সম্পর্কের কথা। এর মধ্যে বেশ কিছু পাত্র পক্ষ দেখে পছন্দ করে গেছে কিন্তু সৃজনী এম এর ফাইনাল পরীক্ষার নাম করে ঠেকিয়ে রেখেছে বিয়েটা। যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে সেও ইঞ্জিনিয়ার, আমেরিকায় সেটেলড। ওর ভীষণ ভয় করছে, যদি আর ফুচুর সাথে দেখা না হয় ওর, কয়েকটা বিনিদ্র রাত চিন্তায় কাটিয়ে শেষে ফুচুকে একদিন ফোন করে ফেলল এস টি ডি বুথ থেকে ফুচুর বালাসোরের পিজিতে এবং বলে ফেলল বাড়ির পরিস্থিতি।

সেদিন বড়দিন, বাড়িতে মা আর সৃজনী মিলে অনেক রকম খাবার বানিয়েছে কয়েকদিন ধরে, কেক, কুকিজ, প্যাটিস, চিকেন কাটলেট, ফিস ফিঙ্গার। বাড়িটা ষ্টার দিয়ে, আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে, সৃজনী সবই করেছে কিন্তু ওর মন ভালো নেই। সন্ধেবেলায় হঠাৎ বেল বাজল, সৃজনী দরজা খোলার আগেই মা গিয়ে দরজা খুললেন আর তারপরে ভেতরে এলেন ফুচুকে সঙ্গে নিয়ে। ফুচুকে আজকের দিনে বাড়িতে পেয়ে মা বাবা খুবই খুশি কিন্তু ফুচু আজকে ঢুকেই মা বাবাকে প্রণাম করে যে কথাটা বলল তার জন্য তাঁরা একদম তৈরী ছিলেন না। ফুচু ঢুকেই ওঁদের বলল, "আজকে বড়দিন দেখে এলাম তোমাদের কাছে একটা জিনিস চেয়ে নিতে তোমাদের কাছ থেকে। সৃজনীকে সারাজীবনের জন্য আমাকে দেবে? আমি তোমাদের জামাই হিসেবে হয়তো অযোগ্য হব না, কী বলেন জামাইবাবু?" প্রথমে অমিতবাবুর আর সৃজনীর মায়ের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল ফুচুর কথা, তাই তাঁরা বললেন, "তুই সৃজনীর মত নিয়েছিস?" ফুচু কিছু বলার আগে সৃজনী বলল, "আজ থেকে পাঁচ বছর আগেই নিয়ে রেখেছে মা, আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসি।" অমিতবাবু আর সৃজনীর মা দুজনেই ওদের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না, আমরা দুশ্চিন্তায় ছিলাম মেয়েটা আমেরিকায় চলে যাবে, কেমন থাকবে না থাকবে, এটা আমরা ভেবেই দেখিনি।" মা বাবার সম্মতি পেতে জানা গেল ফুচুর বাড়ির সবাই খুব খুশি এই বিয়েতে, ফুচু আগেই তাঁদের মতামত জেনে এখানে এসেছে। এবারের বড়দিনটা সত্যিই দুই পরিবারের কাছে খুবই আনন্দের দিন। বাইরে বাজীর আওয়াজ পেয়ে ওরা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো হাতে হাত ধরে, দুজনেই

উপলব্ধি করল এতদিনে সোলমেট মানে কী, সামনের চার্চের মাইকে বাজছে ক্রিসমাস ক্যারোল, “জয় টু দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য লর্ড হ্যাস কাম” ওদের জীবনে সারাজীবনের মত এই দিনটা স্মরণীয় হয়ে রইল।

॥পয়মন্ত॥

সকালে ঘুম থেকে উঠে সুমিতাদেবীর মনে পড়ল আর মাত্র এক মাস বাকী ছেলে অর্কর বিয়ের। এদিকে একা মানুষ সুমিতাদেবীর অনেক জোগাড়ই বাকী এখনো। ছেলে অর্ক মেরিনে আছে, সুমিতা দেবীর এক ছেলে এক মেয়ের মধ্যে অর্ক ছোট। সুমিতাদেবীর মনে পড়ছে নিজের বিয়ের সময়টা। জমিদার বাড়ির অতি আদরের মেয়ে সুমিতা দেবীর বিয়ে হয়েছিল ব্রিটিশ আমলের পুলিশের বেশ প্রভাবশালী দারোগা মনোতোষের সঙ্গে। বাপের বাড়ি থেকে সোনাতে আর দানসামগ্রীতে মুড়ে দিয়েছিল সুমিতাদেবীকে। বিয়ের পরে এসে উঠেছিলেন শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়। দুই বড়ো ভাসুর আর তাঁদের ছেলেমেয়েদের দিয়ে বিশাল যৌথ পরিবার।

ভালোই দিন কাটছিল সুমিতাদেবীর মনোতোষর সঙ্গে। একে একে দুই ছেলে মেয়ে হল, মেয়ের বয়স যখন ছয় আর ছেলের দুই , ঠিক সেই সময় হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলেন মনোতোষ। পুলিশের বাড়ি, খোঁজ খবরের খুব ধুম পড়ে গেল, কিন্তু কিছু লাভ হল না, কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না মনোতোষের। এদিকে দেখতে দেখতে একটা বছর কাটতেই সুমিতা দেবীর স্থান হল ছেলেমেয়েসহ বাড়ির আশ্রিতদের সাথে। বাড়ির ছোটবৌ থেকে রাতারাতি তিনি হয়ে গেলেন বাড়ির রাঁধুনি আর কাজের লোক। কিন্তু তিনি সহ্য করে চললেন।

তার পাঁচ বছরের মাথায় একদিন তাঁর ডাক পড়ল বড়ো ভাসুরের ঘরে। গিয়ে দেখলেন যে তাঁর নামে তাঁর বাপের বাড়ি থেকে দশ হাজার টাকার ড্রাফট এসেছে। সেটা তিরিশের দশক, দশ হাজার টাকা মানে অঅঅঅনেএএএএএক টাকা তখন, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে সুখ লেখা নেই। বড়ো ভাসুর যিনি তখন বৃটিশ পুলিশের আই জি ছিলেন পরিষ্কার বলে দিলেন যে সুমিতাদেবী যদি ওই টাকা নেন তবে তাঁকে ওই বাড়ি ছাড়তে হবে ছেলে মেয়ের হাত ধরে। একলা অনাথা মেয়েমানুষ সেই দুঃসাহস আর দেখাতে পারেন নি। সেই টাকা ফেরত গেল, কারণ টাকা নিলে তাঁকে দিয়ে আর বিনা মাইনের ঝিয়ের কাজটা করানো যেত না। মনোতোষের কোনো খবর নেই।

মেয়ের বছর ষোলো বয়েসে জ্যাঠারা বিয়ে দিল উত্তর কোলকাতার এক পড়তি বড়োলোক বাড়িতে যাদের বাকসর্বস্বতা ছাড়া আর তেমন বলার মত কিছু নেই। মেয়ে বরাবরই একটু জ্যাঠা জেঠিমার ধামাধরা, তাই তার অপরিণত বুদ্ধিতে সে বুঝতে পারল না প্রথমে কেমন বিয়ে হয়েছে, পরে বুঝল কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে ।তবু মেয়ে সেখানে স্থিতু হল। ছেলে অর্ক আই এ পাশ করে ঢুকল মেরিনে আশি টাকা মাইনের অ্যাপরেন্টিস হিসেবে, তারপরে কঠোর পরিশ্রম করে, মেরিনে পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে আজকে সে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার ফরেন শিপে। বিয়ে হচ্ছে তার পূর্ব রেলের চিফ একাউন্টস অফিসারের মেয়ে যে আবার সম্পর্কে বড়ো ভাসুরের স্ত্রীর বোনঝি অঞ্জলি তার সাথে, মেয়েটি সুশ্রী, ইন্টারমিডিয়েট পাশ, নম্র ভদ্র। বিয়ের ঠিক হয়ে যাওয়ার পরেরদিন খবর এলো অর্কর আরেকটা প্রমোশন হয়েছে। মনে মনে সুমিতাদেবী ভাবলেন, মেয়েটা পয়মন্ত তো বেশ!!! আহা তাই যেন করেন ভগবান, সব কিছু যেন এই মেয়ের আয়ে পয়ে স্বচ্ছল সুন্দর হয়!! ছেলে অর্ক এর মধ্যে নিজের বাড়ি করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে, কারণ সে বোঝে মায়ের দুর্দশাটা।

সুমিতাদেবী তাড়াতাড়ি গেলেন বড়ো জায়ের কাছে, বড়ো জা জানালেন সেদিনই বড়ো ভাসুর যাচ্ছেন কনেকে আশীর্বাদ করতে। বড়ো জায়ের বাপের বাড়ি বলে তিনিও গেলেন। একজোড়া মকরমুখী বালা দিয়ে কনের আশীর্বাদ করে এসে ওঁরা খুব প্রশংসা করলেন কনের ব্যবহারের। কিন্তু সুমিতাদেবী এক অজানা অনিশ্চয়তায় ভুগতে লাগলেন। এরপরে একদিন মেয়ের বাবা কাকারা এসে অর্ককে আশীর্বাদ করে গেল ঘড়ি, আংটি, বোতাম, সোনার গিনি দিয়ে।

ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল বিয়ের দিন। অর্ককে বেশ কিছু আত্মীয় স্বজন নেমন্তন্ন করে আইবুড়োভাত খাওয়ালো। বিয়ের দুদিন আগে হল আনন্দ নাড়ু, সব এয়োরা মিলে সেই আনন্দনাড়ু গড়ে ভাজল, বিলোলো, আবার কিছুটা সরিয়ে রাখল তত্ত্বের জন্য। বিয়ের আগের দিন আড়ম্বর করে আইবুড়োভাত দিল বড়ো ভাসুর, জা বাড়িতে বেশ কিছু আত্মীয় স্বজন বলে। সেদিন থেকে ভিয়েন বসে গেল বাড়িতে মিষ্টি তৈরির জন্য। মাছের মাথার ডাল, পোলাও, ঝুরো আলুভাজা, বেগুনি, পার্শে মাছের ঝাল, তোপসে ফ্রাই, চিংড়ি মালাইকারি, দই কাতলা, পাঁঠার মাংস, চাটনি, দই, মিষ্টি দিয়ে বিরাট কাঁসার বগি থালায় সাজিয়ে সঙ্গে বড়ো বড়ো কাঁসার বাটিতে সব সাজিয়ে গুছিয়ে আইবুড়োভাত খাওয়ালেন অর্কর বড়ো জ্যাঠা আর জেঠিমা অর্ককে যদিও রান্নাটা করলেন সুমিতাদেবীই। পরেরদিন বিয়ে। ভোরে উঠে দধিমঙ্গল করে অর্ককে চিঁড়ে দই খাওয়ালেন সুমিতাদেবী। তারপরে সব জায়েদের নিয়ে, ভাসুরপো বৌদের নিয়ে গেলেন জল সইতে। তারপরে ছেলের গায়ে হলুদ দিয়ে সেই হলুদ গায়ে হলুদের তত্ত্বের সঙ্গে গেল কনের বাড়িতে। বিকেলে মাকে প্রণাম করে বরযাত্রীসহ অর্ক গেল বিয়ে করতে, বরকর্তা হয়ে গেলেন বড়ো ভাসুর।

নির্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন করে পরেরদিন বেলায় বৌ নিয়ে আসবে যখন অর্ক দেখা গেল গোটা বাড়ি সেদিন জলহীন। আসলে রিসার্ভারের আউটলেট কেউ খুলে রেখে দিয়েছিল বৌকে অলক্ষুনে প্রমাণ করতে। বেলা বারোটায় অর্ক আসবে বৌ নিয়ে, ব্যাপারটা জানা গেল বেলা নটায়। সুমিতাদেবী তাড়াতাড়ি পাড়ার তিন চারজন ভারীকে বেশী টাকা দিয়ে আশেপাশের কল থেকে জল আনিয়ে ভর্তি করলেন রিসার্ভার। সাড়ে দশটায় কাজ সমাধা হতে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। বারোটায় বৌ এলে তাকে বরণ করে ঘরে তুললেন, চলল স্ত্রী আচারের পর্ব, কড়ি খেলা ইত্যাদি। আলাদা ডেকে অর্ককে জানালেন ঘটনা। অর্ক গম্ভীর হয়ে গেল, সেদিন ওদের কালরাত্রি, রাত্রে নতুন বৌ অঞ্জলীকে নিজের কাছে নিয়ে শুলেন এবং তাকে সহজ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

পরেরদিন বৌভাত, নতুন বৌকে বললেন পায়েসটুকু করতে, নিজে সঙ্গে রইলেন তার, এদিন বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর নিজের বৌভাতের দিনটা। বাকী রান্না হয়ে গেলে বৌ দুপুরে বাড়ির সবাইকে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। সন্ধেবেলায় বৌভাতের অনুষ্ঠানে প্রথমে ফুলের সাজের সঙ্গে এলো তত্ত্ব মেয়ের বাড়ি থেকে, সেটা দেখতে ভীড় জমালো আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশীরা । প্রচুর লোকজন আসছে, উপহার দিয়ে খেয়ে দেয়ে যাচ্ছে।

অর্ককে একদিনের জন্য তার বাবার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটা ছেড়ে দিয়েছে তার বড়ো জ্যাঠা, নাহলে এই ঘরে তার জ্যাঠার রাজত্ব। সেই ঘরে কনের বাড়ির থেকে দেওয়া খাট বিছানা ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে ফুলশয্যার জন্য

আর তার পাশের গেষ্ট রুমটাও পরিষ্কার করে খাট বিছানা ঝেড়ে ঝুড়ে রাখা হয়েছে, কেন সেটা সুমিতাদেবী জানেন না। সন্ধে থেকে আত্মীয় পরিজনের হাঁকডাকে, বহুবর্ণ প্রজাপতির মত বিভিন্ন লোকের সাজগোজ, সুখাদ্যের ঘ্রাণে জমে উঠল অনুষ্ঠান। প্রচুর উপহার পেয়েছে তাঁর ছেলের বৌ অঞ্জলি, তাছাড়া অনেক খাবার বাড়তি হয়েছে, সবাই খুব সুখ্যাতি করছে অঞ্জলির যে সে খুব পয়মন্ত বলে।

নিমন্ত্রিতরা চলে গেলে ছেলে অর্ককে ডেকে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গিয়ে স্ত্রী আচারের সেই চিঁড়ে দই খাওয়ানো হল, সেটা করল অর্কর দিদি আর জ্যাঠতুতো দিদিরা মিলে। ওদের তাড়া দিয়ে বের করে সুমিতাদেবী নিজে অর্কর ঘরের দরজা বন্ধ করতে যাবেন এমন সময় অর্ক আর অঞ্জলি বেরিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করে নিয়ে চলল সেই পাশের ঘরে। তারপরে তাঁকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে তারা দাঁড় করালো যার সামনে তাঁকে যে তিনি এজীবনে আর দেখতে পাবেন আশাই করেননি। সেখানে বসে আছে তাঁর জন্য অপেক্ষায় মনোতোষ যে এতো বছর ভবঘুরের জীবন কাটিয়ে রোগগ্রস্ত। অর্ক তাঁকে খুঁজে বের করে নিয়ে এসেছে কালীঘাটের দরিদ্রনারায়ণ সেবার পংতি থেকে। মনোতোষের সেই সময় একটা গাড়িতে ধাক্কা লেগে স্মৃতি লোপ পায়। তারপরে এক বছর আগে অর্ক তাঁকে খুঁজে পায়, তাঁর চিকিৎসা করে এখন তিনি অনেকটাই ভালো। মনোতোষ সুমিতার সামনে বসে পড়লেন আর তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সুমিতাদেবী, অর্ক, অঞ্জলি, অর্কর দিদি কারোর চোখ আর শুকনো রইল না। সুমিতাদেবী মনোতোষকে ফিরে পেয়ে প্রথমেই মনে হল সত্যি অঞ্জলি খুবই পয়মন্ত। আর অর্ক আর অঞ্জলিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, “তোদেরকে বিয়ের সেরা উপহারটা কিন্তু আমারই হল।” মুখে হাসি আর চোখে জল নিয়ে অর্ককে অঞ্জলির সঙ্গে সুমিতাদেবী পাঠালেন তাদের ফুলশয্যার জন্য আর নিজে এতো বছর পরে মনোতোষের সামনে বসে ঈশ্বরের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানালেন তাঁর দুঃস্বপ্নের দিন অবসান করার জন্য।

॥নষ্ট দাম্পত্য॥

বি এ ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক আগে আগে বিয়ের ঠিক হল সোহিনীর, মা বাবার দেখাশোনা পাত্র, পিসতুতো দিদি সম্বন্ধ আনলো। পিসতুতো দিদি রাখির বন্ধু অনিমাদির ভাই, পিসতুতো দিদির কাছে সোহিনীর ছবি দেখে ভালো লেগেছে। তিন ভাইয়ের বড়ো এই অনিমাদি রাখিদির বন্ধু ছিল,আর যার সাথে বিয়ের কথা হচ্ছে সেই মুরলীধর বা মুরলীর ছিল আবার তিন ভাইয়ের সকলের ছোট, বাবার বয়স হয়েছে ভালোই, মা মারা গেছেন বছর পাঁচেক। বড়ভাই ধীরেন্দ্র বিবাহিত এবং এক কন্যার বাবা, মেজভাই সমরেন্দ্রও বিবাহিত, তারও সবে একটি মেয়ে হয়েছে আর ছোটো এই মুরলীধর , এদের পারিবারিক রঙের ব্যবসা, আরমেনিয়ান স্ট্রিটে দোকান আছে আর মুরলীধর চেষ্টা করছে নিজের কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা দাঁড় করাতে। মুরলীর সাথে সোহিনীর প্রায় বারো বছরের বয়সের তফাৎ। মুরলীদের বেলঘরিয়াতে বাইশ কাঠা জমির ওপরে বাগান, পুকুর আর মন্দিরসহ নিজেদের বিরাট বাড়ি, যে বাড়ি দেখে এসে সোহিনীর বাবা অনিলবাবু একদম অভিভূত হয়ে গেছেন। মুরলী পড়াশোনা ব্যাপারটা একটু এড়িয়েই চলে, কারণ বহু চেষ্টা করেও বি কমের গাঁটটা সে পেরোতে পারেনি।

সোহিনীরা দুই বোন, সোহিনী বড়ো আর মোহিনী ছোট, সোহিনীর চেয়ে বারো বছরের ছোট। সোহিনী কিন্তু পড়াশোনা ভালোবাসে, নিজে ভালো গায়, একটু আধটু লেখালেখি করে।সোহিনীর কিন্তু এক্ষুনি বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে ছিল না, তার আরো পড়বার ইচ্ছে ছিল, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছে ছিল। সোহিনী বড়ো হয়েছে রাজ্যের বাইরের একটি শিল্প নগরীতে, পড়েছে কো এড স্কুলে, বেড়েছে স্বাধীন ভাবে আর মননে গড়ে উঠেছে একটি আদ্যন্ত পরিশীলিত মন। কো-এডে পড়ার দরুণ তার প্রচুর ছেলে বন্ধু আছে যারা প্রয়োজনে ওকে লেখাপড়ায় সাহায্য করা থেকে শুরু করে কোচিং এ বেশি রাত হয়ে গেলে বাড়িতে পৌঁছে পর্যন্ত দিয়ে যায়। তাই ছেলে বন্ধুদের সাথে ও ভীষণ সহজ, বরং মেয়ে বন্ধুদের অনেকের মধ্যেই ও সংকীর্ণতা দেখেছে, তাই মেয়েদের ও একটু এড়িয়েই চলে। কলকাতায় এসেছে সোহিনী স্নাতক স্তরে পড়তে ।ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়েছে সোহিনী , আবার ইলেক্টিভ বাংলা আর এডুকেশন তার পাসের বিষয়। বাংলাতে ও বরাবরই ভালো, উচ্চ মাধ্যমিকে মা বাবার ইচ্ছেতে সায়েন্স নিয়ে পড়তে গিয়ে ওর পছন্দের বিষয় বাংলা বা ইতিহাসে অনার্সটা ওর স্নাতক স্তরে নেওয়া হল না। পরীক্ষার প্রস্তুতির মাঝে ওর মুরলীর সঙ্গে বিয়ের আশীর্বাদ হয়ে গেল। তারপরে বার দুয়েক হবু বর মুরলীধর এসে ওদের বাড়িতে ঘুরে গেল, ওর কী ধরণের কসমেটিক্স চাই জানতে চেষ্টা করল, কিন্তু সোহিনী সাজতে ভালোবাসলেও কসমেটিক্স খুব কমই ব্যবহার করে, তার একটা বড়ো কারণ সোহিনীর কসমেটিক্স তেমন লাগে না। তাই সোহিনী বলেই দিল ওর কসমেটিক্স লাগবে না। তার দুধে আলতা গায়ের রং, দাগহীন মসৃণ ত্বক, রেশমের মতো লম্বা ঈষৎ বাদামি চুল আর লম্বা ছিপছিপে চেহারা আর কাটাকাটা চোখ মুখ এমনিতেই অনেকের মধ্যে তাকে আলাদা প্রাধান্য দেয়, আর সাজলে তো আর কারুর দিকে নজরই পড়ে না, শুধু তাকেই সবাই ঘুরে ঘুরে দেখে। কলকাতায় এসে ওরা যে বাড়িতে ভাড়া আছে, সেই বাড়ির ল্যান্ডলর্ডের স্ত্রীর সম্পর্কিত ছোট দেওর যে নিজে এস ডি ও তার সোহিনীকে দেখেই পছন্দ হয়ে গেছিল, ওরা কাঠবাঙ্গাল বলে মা বাবা এগোলোই না, অথচ সেই বাঙ্গাল বাড়িতেই বিয়ে দিচ্ছে এখানে।

বিয়ের আগে “কিছুই লাগবে না, কিছুই লাগবে না” বলে অনিলবাবুর কাছ থেকে সবই নিয়েছে এরা, খাট আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, কুড়ি ভরি সোনার গহনা, ফ্রিজ, টিভি সোফাসেট, তিরিশটা নমস্কারী শাড়ি। অনিলবাবু বড়োমেয়ের স্বাচ্ছন্দের কথা ভেবে সবই দিলেন সাধ্য মতো। বিয়ে হল শ্রাবণের একটা দিনে। বরবেশে মুরলীর সঙ্গে শুভ দৃষ্টির সময় সোহিনী মুরলীর চোখে মুখে লোভ দেখতে পেল। ফুলশয্যাতে ঢুকে মুরলী প্রথমেই নিজেকে অনাবৃত করে জিজ্ঞেস করল সোহিনীকে নিজের দিকে দেখিয়ে, “দেখো সব ঠিক আছে তো?” সোহিনী হতবাক হয়ে কিছু বলার সময় পেল না, মুরলী দখল নিল ওর কুমারী শরীরটার। সোহিনী নিজের ভালো না লাগাটা প্রাণপনে চেষ্টা করতে লাগল সাংসারিক কাজের মধ্যে ভুলে যেতে। কিন্তু রাত্রি আসলেই আর ছুটির দিনে দুপুরে চলে ওই শরীরের দখল নেবার প্রবণতার নামে পাশবিকতা। এর মধ্যে ওরা অষ্টমঙ্গলাতে গেল সোহিনীর বাবার কর্মস্থলে যেটা সোহিনীর বেড়ে ওঠার জায়গাও বটে। সেখানে অনিলবাবু একটা ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন মেয়ে জামাইকে সকলের সাথে পরিচিত করাতে। এই অনুষ্ঠানের আগে পরে সোহিনীর সব বন্ধুরা এলো দেখা করতে, স্কুলের বন্ধু দেবদীপ ওকে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে দেবদীপের মা ডেকেছেন বলে, সোহিনী নিজের সাইকেল নিয়ে গিয়ে দেখা করে এলো। আসার পর থেকে সোহিনী খেয়াল করল মুরলী যেন কেমন একটু বেসুরে বাজছে। ও বুঝতে চেষ্টা করতে লাগল কেন? মুরলীর সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে আলাপচারিতা করতে পারেনা সোহিনী, কারণ মুরলী ব্যবসা, খাওয়া আর শরীর ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের খবরই রাখে না। আসলে দেবদীপের সঙ্গে যে সোহিনী গেছিল দেবদীপের বাড়িতে এটা মুরলীর মনে রোপন করল সন্দেহের বীজ। মুরলী ধরে নিল নিশ্চয় দেবদীপ আর সোহিনীর মধ্যে কিছু একটা আছে, যেটা ওরা ওকে জানাতে চায় না। মুরলী ভুলে গেল দেবদীপ সোহিনী আর মুরলী দুজনকেই যেতে বলেছিল, কিন্তু মুরলী শরীর ঠিক না থাকার অজুহাতে যায়নি, মুরলী ভেবেছিল সোহিনীও যাবে না, কিন্তু সোহিনীর সাথে দেবদীপের মায়ের এমনই সম্পর্ক যে সোহিনী গেছে নিজের আত্মার আত্মীয় মনে করে দেবদীপের মায়ের আমন্ত্রণে। সত্যিই দেবদীপের মা সোহিনীকে নিজের মেয়ের মতোই দেখেন। পরেরদিন অনুষ্ঠান হল, তার পরেরদিন মুরলী অনিলবাবুর কাছে বলল যে তিনি যেন ওকে টাকা দিয়ে ওর কন্ট্রাক্টরী ব্যবসা দাঁড় করাতে সাহায্য করেন। চাকুরীজীবি অনিলবাবু খুব আতান্তরে পড়লেন, সদ্য ধার দেনা করে দিয়ে থুয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন, এহেন প্রস্তাবের জন্য উনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, তাছাড়া তাঁর এতটা আর্থিক সঙ্গতিও নেই, তাঁর ছোট মেয়ের ভবিষ্যৎও ভাবতে হবে। ছোট মেয়ে পড়াশোনার কথাটা তিনি বলতেই মুরলী বলল যে মোহিনীকে কনভেন্ট ছাড়িয়ে স্থানীয় মিডিয়ামের সরকারি স্কুলে দিলে তো খরচ কমে যাবে। এবারে অনিলবাবু উপলব্ধি করলেন যে সোহিনীর বিয়েটা অপাত্রে দেওয়া হয়ে গেছে কিন্তু প্রকাশ করলেন না পাছে সোহিনী কষ্ট পায় ভেবে।

অষ্টমঙ্গলা সেরে শ্বশুরবাড়িতে ফিরল সোহিনীরা। সারাদিন সোহিনী রান্নাবান্নায় সাহায্য করে বড়ো জাকে, রান্না করে রান্নার লোক, কিন্তু শ্বশুরকে খেতে দেয় সোহিনী, শ্বশুরমশাই দীনেনবাবু নির্বিরোধী ভালো মানুষ, রামঠাকুরের দীক্ষিত, বাড়ির সকলেই রামঠাকুরের কৈবল্যধামে দীক্ষিত, বাড়ির মন্দিরে তাঁরই পুজো হয়, কিন্তু লোকগুলো ভালো নয় বাড়ির। এদের দেখে সোহিনীর ধারণা হয়ে গেল রামঠাকুরের সব দীক্ষিতরাই বুঝি এমন হয়। সোহিনীর বারান্দায় বেরোনো বারণ, ছাদে ওঠা বারণ, নীচে নামা বারণ, সারাক্ষণ ঘোমটা টেনে থাকতে হয় বাড়িতে ওকে। বড়ো বৌয়ের ক্ষেত্রে নিষেধ কম, যেহেতু শাশুড়ি নেই,কিন্তু সোহিনীর ক্ষেত্রে নাকি ভাসুর, শ্বশুরের সামনে মাথার কাপড় ফেলে ঘুরে বেড়ানো অসভ্যতা। অষ্টমঙ্গলা থেকে ঘুরে এসে মুরলী সোহিনী বিয়েতে যা

ক্যাশ টাকা পেয়েছিল সেটা দিয়ে একটা জয়েন্ট একাউন্ট খুলল ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে কিন্তু তার চেক বই, পাসবই নিজের হেফাজতে রেখে দিল। আর সোহিনীর সমস্ত গয়না খুলিয়ে নিয়ে চলে গেল, লকারে রাখবে বলে। প্রথম মাসে সোহিনীকে দুশো টাকা হাত খরচের টাকা দিল, সেটা আবার সোহিনীর মা বাবাকে শুনিয়েও গেল। এর মধ্যে সোহিনীর গ্রাজুয়েশনের রেজাল্ট বেরোল, সোহিনী রেজাল্ট জানতে কলেজে যেতে চাইলে মুরলী বলল, "কী হবে রেজাল্ট জেনে? পাশ করলেও যা হবে, ফেল করলেও তাই হবে।" সোহিনী স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল।

এর মধ্যে সোহিনীর নজরে পড়ল বেশ কয়েকবার মুরলী কাজ সেরে বিকেলে ফিরলে সোহিনী খেতে দিতে চাইলে ওকে বলে যে তখন খাবে না, ঘর থেকে বেরিয়ে বৌদিকে বলে খেতে দিতে। বৌদির হাতের খাবারে নাকি স্বাদ বেড়ে যায়, অথচ খাবারটা করে রাখে সোহিনী। একদিন সোহিনী নীচের ঠাকুরের মন্দির থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেখল মুরলী ডাইনিং টেবিলে বসেছে, তার চোখে কিছু পড়েছে, আর তার বৌদি তার মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চোখে ফুঁ দিচ্ছে, দৃশ্যটা কেন যেন সোহিনীর ভালো লাগল না। মুরলীর বৌদি মুরলীর প্রায় সমবয়সী, তার সঙ্গে এহেন আচরণ দেখেও নিজের মনের সন্দেহ টাকে সে এড়াতে চাইল। আর একদিন ছুটির দুপুরে খাওয়ার পরে সোহিনী নিজের ঘরে বসে বইপত্র নাড়াচাড়া করছিল মগ্ন হয়ে , হঠাৎ জোরে হাসির আওয়াজে ওর মগ্নতায় চিড় ধরল, ও উঠে দেখতে গেল কোথা থেকে হাসির আওয়াজ আসছে, দেখল গিয়ে মুরলী বৌদির কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে কী কথায় দুজনেই হেসে যাচ্ছে। এবারেও সোহিনী ওদের জানতে না দিয়ে সরে এলো, ধীরে ধীরে খেয়াল করল সোহিনী মুরলী ওর রান্না, ওর পোশাক, ওর আচরণ সব কিছুতেই খুঁত ধরে আর তুলনাটা চলে হয় ওর বৌদির সঙ্গে নয় ওর বড়লোক শ্যামবাজারে থাকা কাকিমার সঙ্গে। দিনে দিনে এগুলো বাড়তে লাগল।

এর মধ্যে সোহিনীর মা বাবা এলেন একদিন পুজোর তত্ত্ব নিয়ে, মুরলী সোহিনীর মায়ের কাছে বলতে বসল সোহিনী কতটা নিষ্কর্মা আর নির্লজ্জ।সোহিনীর এবারে ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে লাগল। এর মধ্যে ওর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাকুর ভাসান দেখা নিয়ে প্রচন্ড অশান্তি শুরু করল মুরলী আর ওর দাদা বৌদি, তিনদিন ওকে খেতে দিল না, ওর জ্বর এসে গেল মানসিক চাপে। মুরলী আর সোহিনীর ঝগড়া হলেই মুরলী ওর দাদা বৌদিকে টেনে নিয়ে আসে ওর সালিসি করতে, সেদিনও তেমন ঘটতে সোহিনী সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল ওর বড়ো জাকে যে তাহলে কী ওরা ওকে চলে যেতে বলছে, ওরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, ওরা সঙ্গে সঙ্গে ওকে বলল চলে যেতে। ও প্রায় এক কাপড়ে ওর অনার্সের বই কটা স্যুটকেসে ভরে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে মুরলীকে বলল ওর গাড়ি ভাড়ার টাকা দিতে, মুরলী সিঁড়ি ওপর থেকে কুড়িটা টাকা অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভরে ছুঁড়ে দিল।

সোহিনী ফিরে গেল অনিলবাবুর কর্মস্থলে, গিয়ে দেখল তারা সবাই কলকাতায় এসেছে। ও যখন ভাবছে ফিরে যাবে তখন পাড়ার মধ্যেই থাকা দেবদীপের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, ওকে দেবদীপ ওদের বাড়িতে নিয়ে গেল। দেবদীপদের বাড়িতে সেদিন রাতে থেকে পরেরদিন কলকাতায় আসার আগে সোহিনী ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখল বাবা অনিলবাবু ফেরত এসেছেন । ওর স্যুটকেস দেবদীপ পৌঁছে দিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। ও বহুদিন পরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল অনিলবাবু অফিসে বেরিয়ে গেলে ফ্রিজে মায়ের রান্না করা যা ছিল তাই খেয়ে।

ফিরে আসার একমাসের মধ্যে সোহিনীর কোনো খোঁজ করল না মুরলীদের বাড়ি থেকে, একমাস পরে এলো একটা চিঠি মুরলীর কাছ থেকে যেখানে মুরলী লিখেছে যে সোহিনী নাকি ওর বয়ফ্রেন্ডের সাথে প্লেজার ট্রিপে যাবে বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। অনিলবাবুর উকিল বন্ধু চিঠিটা দেখেই বললেন যে মুরলীরা সোহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ আনবার জন্যই এমন চিঠি দিয়েছে। দীর্ঘ টানা পোড়েনের পরে সোহিনীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেল মুরলীর কারণ মুরলীর মনে সন্দেহের সেই যে বিষটা ঢুকেছিল দেবদীপ আর সোহিনীকে জড়িয়ে, সেটাকেই ও সত্যি ধরে তিল থেকে তাল ভেবে কল্পনায় সোহিনীর সঙ্গে দেবদীপের অনৈতিক সম্পর্ক তৈরী করে ফেলল যদিও এই আড়াই মাসে সোহিনীর সাথে দেবদীপের দেখা হয়েছে শুধু সেই অষ্টমঙ্গলার সময়ে আর সোহিনীর সঙ্গে মুরলীর কালচারের ভেদ তো ছিলই, সোহিনীও কিন্তু মুরলীর সঙ্গে ওর বৌদির অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতাকে স্বাভাবিক ভাবতে পারেনি, ভাবা সম্ভবও ছিল না, ফলে কুটিল সন্দেহের বিষের জ্বালায় নষ্ট হয়ে গেল ওদের দাম্পত্য। সোহিনীর গয়না, শাড়ি কোনো কিছুই ফেরত দিল না মুরলী আর বিচ্ছেদের ছমাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করল, এইবারে জিনিসপত্রের সঙ্গে দুলাখ টাকা ক্যাশ নিয়ে। আর সোহিনী স্নাতক স্তরে ভালো রেজাল্ট করেই ছিল, এরপরে এম এ পাশ করে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ঢুকল ইনকাম ট্যাক্সের আধিকারিক পদে। কিন্তু সেই সন্দেহের বিষে শেষ হয়ে যাওয়া নষ্ট দাম্পত্য মুরলী আর সোহিনীর জীবনের একটা অমীমাংসিত অধ্যায় হয়েই রয়ে গেল আজীবন।

(**এক আত্মীয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে আর আমার কল্পনার মিশেলে লেখা)

॥সিলেক্টেড॥

অয়ন্তিকা ভীষণ ভেঙে পড়েছে। অয়ন্তিকা স্নাতক স্তরে পড়ে একটা নামী কলেজে মনোস্তত্বে অনার্স নিয়ে। অয়ন্তিকার আজকে মনস্তত্ত্বের প্রাকটিক্যাল হবার কথা ছিল পার্ট ওয়ানের। একদম সাদাসিধে সরল মেয়ে অয়ন্তিকা। একটা নামকরা মিশনারি কনভেন্ট থেকে আই সি এস ই পাশ করে শুধুমাত্র মনস্তত্ত্ব ভালোবাসে বলে আরেকটা কনভেন্টে ভর্তি হল এবং সেখানে স্কুলে টপ করে ৯৬% মার্কস পেয়ে পাশ করে ভর্তি হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি খুবই নামকরা কলেজে। অয়ন্তিকা খুবই সুন্দরী কিন্তু যেহেতু সহজ সারল্যে ভরা ওর ব্যবহার আর স্বভাব তাই বহু ছেলে পতঙ্গের মত আকর্ষিত হয় ওর দিকে কিন্তু ওর সেসব দিকে বড়ো একটা আকর্ষণ নেই। পড়াশোনা, গান, একটু লেখালেখি এইসব নিয়েই ও মেতে আছে, অন্তর্মুখী স্বভাবের বলে মা বাবা ছাড়া কারুর সঙ্গে তেমন সখ্যতা গড়ে ওঠেনি ওর।

একটা ব্যান্ডের ফিমেল লিড সিঙ্গার অয়ন্তিকা, স্কুলের সব বন্ধুদের নিয়ে এই ব্যান্ডটা তৈরী হয়েছিল, ওরা দূরদর্শনে প্রোগ্রাম করেছে, ওদের ব্যান্ড একটা অল ইন্ডিয়া কম্পিটিশনে জিতেছেও দুবার, কিন্তু সবাই পড়ছে বলে আর ঘন ঘন প্রোগ্রাম করা হয়ে ওঠেনা ওদের। কলেজে ঢোকার সময় তিয়ান এগিয়ে এসে কথা বলেছিল, তিয়ান অয়ন্তিকাকে চেনে ওর ব্যান্ডের মাধ্যমে, ব্যান্ডের মেল লিড প্রিয়ব্রতর সঙ্গে ম্যান্ডোলীন বাজায় তিয়ান। প্রিয়ব্রত অয়ন্তিকার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ভাইয়ের মতো। সে কিন্তু অয়ন্তিকাকে প্রথমেই বলেছে তিয়ান ভালো ছেলে নয়। তারপর অয়ন্তিকা জানতে পারল তিয়ান ওদের বাড়ির দিকেই থাকে, আবার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের কাছে একই ব্যাচে ওরা টিউশন নেয়। তিয়ান সারাক্ষণ অয়ন্তিকার সঙ্গে লেপ্টে থাকার চেষ্টা করছে যে সেটা অয়ন্তিকা বুঝতে পারছে, কিন্তু ক্লাসমেট বলে কিছুতেই এড়াতে পারছে না। হঠাৎ একদিন টিউশনের বাইরে তিয়ান প্রপোজ করে বসল অয়ন্তিকাকে হাতে গোলাপ ফুল নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে, অয়ন্তিকা রিফিউজ করল বটে কিন্তু পুরো ঘটনাটা দেখেছেন ওদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট দীপা ম্যাম। তিনি আবার ডিভোর্সি, কিন্তু সকলের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলিয়ে দেন যখন তখন আর সেটার বিরোধিতা কেউ করলে একদম প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে ওঁর। তাই তিনি যখন অয়ন্তিকাকে বললেন যে সে কেন তিয়ানকে রিফিউজ করল, অয়ন্তিকা তাঁকে বলল যে এটা যেহেতু ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই এটার কোনো এক্সপ্লানেশন ও দীপা ম্যামকে দেবে না। উনি বিলক্ষণ চটলেন আর তিয়ান তো রিফিউজড হয়ে একদম ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। এবারে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার আগে ও তিয়ানকে যখন জিজ্ঞেস করল প্রাকটিক্যাল খাতাগুলো নিয়ে যেতে হবে কিনা পরীক্ষার সেন্টারে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার দিন, তিয়ান বলল যে না নিয়ে যেতে হবেনা। অয়ন্তিকার প্রাকটিক্যালের পার্টনার ছিল যে অলিপা সেও বলল যে প্রাকটিক্যাল খাতা নিয়ে যেতে হয় না। বেরোনোর সময় ওর মা বলল যে প্রাকটিক্যাল খাতা ও নেবে কিনা, ও বলল নিতে হবে না। ও নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দিতে গেল, ওর মনস্তত্বের সাবজেক্ট হয়ে গেল ওর আরেক বন্ধু অদিতি, পরীক্ষার সেন্টার পড়েছে লোরেটোতে, সঙ্গে মা বাবা গেছেন। অয়ন্তিকা সেন্টারে গিয়ে শুনল যে প্রাকটিক্যাল খাতা ছাড়া পরীক্ষায় অবসেন্ট মার্ক হয়ে যাবে, লোরেটো কলেজ থেকে ওদের কলেজের ডিপার্টমেন্টাল হেড দীপা ম্যামকে ফোন করল, তিনি বললেন যে তিনি দেখছেন কি করা যায়। এদিকে সারাদিন সেন্টারে থেকে বিকেলে অয়ন্তিকা বাড়ি এলো, এসে থেকে গুম মেরে আছে, মা বাবাকে বলতে পারেনি যে ওকে অবসেন্ট মার্ক করবে বলেছে। পরেরদিন ডিপার্মেন্টাল হেড দীপা ম্যাম ফোন করে ওর মা বাবাকে বললেন সব

আর বললেন যে উনি ফোন করে দেখতে চাইছিলেন যে পরীক্ষায় অবসেন্ট মার্ক হয়ে অয়ন্তিকা মেট্রো রেলে সুইসাইড করেছে কিনা কারণ সেদিনই পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে একটি মেয়ে সুইসাইড করেছে। বলে বললেন তিন দিনের মধ্যে একুশটা খাতা তৈরী করে ওদের কলেজে জমা দিলে উনি কন্ট্রোলারের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন কিছু করা যায় কিনা। তিনদিন অয়ন্তিকার আর ওর মা বাবার সর্বস্ব মাথায় উঠল, তৃতীয় দিন বেলা দুটোয় খাতাগুলো শেষ করে ও ওর মায়ের সঙ্গে কলেজের জন্য বেরোনোর আগে ফোন করল ডিপার্টমেন্টাল হেডকে, উনি বললেন যে ওর খাতা জমা দিয়ে লাভ নেই, কারণ উনি কিছু করতে পারবেন না। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় বসে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল অয়ন্তিকা কারণ ওর সেই বছরটা নষ্ট হয়ে গেল। পরের বছরে ও ক্যাজুয়াল ক্যান্ডিডেট হয়ে ক্লাস করতে গিয়ে শুনল যে ডিপার্টমেন্টাল হেড অন্য অনেকের এমন প্রাকটিক্যাল খাতা না নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় অন্য দিনে ডেট দিয়ে পরীক্ষা নিইয়েছেন, এটা করা যায়, এর জন্য করো কাছে পারমিশন নিতে হয় না, এটা সম্পূর্ণ ওর ইচ্ছাধীন ব্যাপার। ওই যে সেদিন টিউশনে অয়ন্তিকা ওকে ওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক না গলাতে বলেছিল তার প্রতিশোধ উনি এইভাবে নিলেন, অসম্ভব ভিন্ডিক্টিভ মহিলা উনি।

পার্ট ওয়ানের রেজাল্ট বেরোলে দেখা গেল সেবছরে অয়ন্তিকা শুধু ওই প্রাকটিক্যাল বাদে সব পেপারে সত্তর শতাংশ নম্বর পেয়েছে। আর তিয়ান ওকে মিসগাইড করে ওর বছর নষ্ট করে রিভেঞ্জ নিল। অয়ন্তিকা হাতের শিরা কেটে আত্মহননের রাস্তা নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মায়ের সজাগ নজরে শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায়। ওদের ডিপার্টমেন্টাল হেডের কাছে ও থ্রেট হয়ে গেছিল ওর মেধা আর জ্ঞানের গভীরতার জন্য কারণ উনি নিজে ছ ছটা বছর নষ্ট করেছেন এই স্নাতক স্তর ডিঙোতে আর শেষে ক্ষমতাসীন দলের লোকজনকে ধরে আজকে অযোগ্য হয়েও পার্টি লেভেলের যোগাযোগের কারণে অনেককে কপটতা করে মেরে, অনেক সিনিয়রকে টপকে ওই জায়গায় গিয়ে বসেছেন এবং এইভাবে ছেলে মেয়েদের বছরের পর বছর ধরে সর্বনাশ করে চলেছেন ওঁর কথামতো না চললে।

শুরু হল অয়ন্তিকার কলেজে সবসময় অপমানিত হবার সময়। ওকে ওদের ডিপার্টমেন্টাল হেড এবং অন্য শিক্ষকরা সারাক্ষন ক্যাজুয়াল ক্যান্ডিডেটদের এটা ভালো না, এই সাবজেক্ট ওদের জন্য নয়, এরা এই স্নাতকস্তরের যোগ্য নয় বলতে থাকে সর্বদা, অথচ যখন ইউজিসি থেকে সার্টিফিকেশনের ব্যাপার থাকে ওর ঘাড় দিয়ে প্রেসেন্টেশন করিয়ে নেয়, ওকে দিয়ে ক্লাসকে, ডিপার্টমেন্টকে রিপ্রেসেন্ট করায় কিন্তু কোথাও ওর নামে কিছু স্বীকৃতি দেয় না। ওদের সাইকো থেরাপি ইউনিটে রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে সিলেকশন হয়ে ও থেরাপি দিল টানা একবছর যার জন্য ওদের ডিপার্টমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেল কিন্তু ওকে কোনো স্বীকৃতি দিল না. শেষে হতাশ হয়ে ও ছেড়ে দিল থেরাপিষ্টের কাজটা। একটা সময় এমন গেছে ওর যে ও কলেজে যেতে চাইত না অপমানিত হবার ভয়ে, কেউ একটুও সহানুভূতি নিয়ে ওর পাশে দাঁড়ায়নি শুধু মা বাবা ছাড়া। দেখতে দেখতে আবার পার্ট ওয়ান পরীক্ষা হল, ও ভালোভাবে পাশ করল, পার্ট টুও পাশ করল।

ফাইনাল ইয়ারের একটা প্রাকটিক্যাল হয়ে করোনার কারণে লকডাউন হয়ে গেল মার্চ মাসের পরে। দীর্ঘ সাত মাস নানান চাপান উতোর চলল ওদের ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে। কখনো রাজ্য সরকার বলল পরীক্ষা না দিয়ে আগের বছরের রেজাল্টের ভিত্তিতে ওদের পাশ করিয়ে দেবে। বাদ সাধল ইউজিসি, তারা বলল না পরীক্ষা নিতেই হবে, সেই নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ইউজিসির ঝামেলা শুরু হতে মামলা হল সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম

কোর্ট পরীক্ষা নেবার সপক্ষে রায় দিল। শেষে পয়লা অক্টোবর থেকে চারদিন ধরে অনলাইনে ওদের পরীক্ষা হল। এর মধ্যে এম এ পড়ার এন্ট্রান্স হল বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, সব কটা জায়গায় ফার্স্ট লিস্টে অয়ন্তিকা নির্বাচিত হল। কিন্তু ওদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা না হওয়াতে ও ভীষণ অনিশ্চয়তায় ভুগতে লাগল, কারণ পরীক্ষা হয়ে তার রেজাল্ট না বেরোলে ও কোথাও ঢুকতে পারবে না উচ্চশিক্ষার জন্য। ভীষণ ডিপ্রেসেড হয়ে পড়ল ও। ওর খালি মনে হতে লাগল যে ওর পড়াশোনার আকাশটা দুঃস্বপের কালো মেঘে ঢেকে গেছে।

শেষে ওদের রেজাল্ট বেরোল মহাঅষ্টমীর দিন, অয়ন্তিকা ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে পাশ করল মনোস্তত্ত্বতে আর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বাইরের ইউনিভার্সিটি ওকে তাদের এম এ ক্লাসের জন্য সিলেক্ট করে ক্লাসে জয়েন করার মেল পাঠিয়ে দিল। এই সিলেক্টেড হবার মেলটা দীর্ঘ চার বছর সময় পরে অয়ন্তিকার কাছে যেন এক মুঠো রোদ হয়ে ওর জীবনের এল ওই কালো মেঘে ঢাকা দিনগুলোর অধ্যায়ের পরে। ও জয়েন করল ওই ইউনিভার্সিটির অনলাইন ক্লাসে এবং ভীষণভাবে সমাদৃত হল সেখানে, এখন সামনে ওর এম এর ফার্স্ট সেমিস্টার পরীক্ষার প্রস্তুতি যেটা ফেব্রুয়ারীতে হবে, তারপরে এম ফিল, ডক্টরেট করে পোষ্ট ডক্টরেট করবে ও, এর মধ্যে নেট দিয়ে একটা চাকরি নিতে হবে, নিজের প্রতি আস্থা যেন ফিরে পাচ্ছে ও। এই চারবছরের সময়টা ওকে সারাজীবনের জন্য অনেক শিক্ষা দিয়ে গেল। আজ জীবনের এই সময়টায় দাঁড়িয়ে ভাবছে অয়ন্তিকা সত্যিই তাহলে ওর জীবনে কালো মেঘের দিন কেটে গিয়ে এই সাফল্যের সূর্যোদয় হল এক মুঠো রোদের উষ্ণতা ছড়িয়ে!!!

॥নিয়তির গতি॥

বহু বছর আগের কথা। ঢাকার হাইকোর্টে ওকালতি করতেন শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঢাকার ধানমন্ডিতে তাঁর পৈতৃক বাড়ি, স্ত্রী সুলোচনা, দুই মেয়ে সুচন্দ্রা আর সুছন্দা আর ছেলে সুবিকাশকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার ছিল। ছেলে বড়ো, তার পরে তাঁর দুই মেয়ে। ঘরে তাঁর নিত্য পূজিত রাধামাধবের বিগ্রহ যাঁর তিনি নিজের হাতে পুজো করতেন রোজ। স্ত্রী সুলোচনাও খুবই ভক্তিমতী কিন্তু মনের দিক থেকে বেশ আধুনিকা। বড়ো মেয়ে সুচন্দ্রা বি এ ফাইনাল দিল এবার, ছোট সুছন্দা কলেজে ঢুকেছে সদ্য, দুই মেয়েই তাঁর সুশ্রী, কিন্তু ছোট মেয়ে রীতিমতো নজরকাড়া সুন্দরী, বড়ো মেয়ের সৌন্দর্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার শান্ত কাজলকালো দুটো চোখ আর ছিপছিপে লম্বা চেহারা। মেয়েরাও মায়ের মত আধুনিকতায় বিশ্বাসী এবং আলোকপ্রাপ্তা। ছেলে সুবিকাশও সুপুরুষ, কালোর মধ্যে একহারা লম্বা বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, একমাথা কালো ব্যাকব্রাশ করা কোঁকড়ানো চুলে আর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বে তাকে একটা অন্য মর্যাদা দিয়েছে।

সুবিকাশ ডাক্তারি পাশ করে বাঁকুড়ার হাসপাতালে চাকরি পেল। সুজলা সুফলা পদ্মার পাড় ছেড়ে সে রাঢ় বঙ্গের লাল মাটির দেশে এসে পড়ল ।সেখানে সে কোয়াটার পেয়েছে, প্রায় দুবছর হতে চলল সে বাড়ি আসতে পারেনি। এমন সময় সুবিকাশের চিঠি এলো বাড়িতে, সঙ্গে একটা ছবি। সুবিকাশ জানিয়েছে যে সে বাঁকুড়াতে ওই হাসপাতালেরই নার্স খ্রিস্টান মেরি দাসকে বিয়ে করেছে ভালোবেসে, তারই ছবি সে পাঠিয়েছে এবং মা বাবার অনুমতি চেয়েছে বৌকে নিয়ে বাড়ি আসার। শশীবাবু রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছেলেকে তৎক্ষণাৎ ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করলেন আর সেই কথাটা জানাতে ছেলেকে,যে বাবা মা সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন সেটা বলবার জন্য, সুলোচনা দেবী সুচন্দ্রাকে পাঠালেন সুবিকাশের কর্মস্থল বাঁকুড়াতে। মেয়েকে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে বহুদিনের বিশ্বস্ত মুহুরী গগনবাবুকে সঙ্গে পাঠালেন। গগনবাবু দায়িত্ব নিয়ে সুচন্দ্রাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। সুচন্দ্রা হাওড়া থেকে কিছুটা পথ ট্রেনে, কিছুটা বাসে করে পৌঁছলেন বাঁকুড়াতে। একে তাকে জিজ্ঞেস করে তিনি যখন সুবিকাশের কোয়াটারে পৌঁছলেন, তখন সন্ধে হয় হয়। সুবিকাশের হাসপাতালের একজন লোক তাঁকে বাড়িটা চিনিয়ে দিয়ে চলে গেল। শাল পিয়ালের গাছে ঘেরা ছোট্ট সুন্দর কোয়াটারটা দেখে সুচন্দ্রার বেশ ভালো লাগল।

বাড়ির গেটের পরে সামনে একটুকরো ফুলের বাগান পেরিয়ে সুচন্দ্রা যখন বাড়িতে পা দিলেন, তিনি দেখলেন একটি সুদর্শন গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহী তরুণ বাইরের ঘরে বসে বই পড়ছেন। সুচন্দ্রা তাঁকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হলেন যে এটাই দাদা সুবিকাশের বাড়ি। এদিকে সুচন্দ্রাকে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভেতরে যে নিয়ে গিয়ে তুলল সে সুবিকাশের বৌ মেরি। মেরি অসাধারণ সুন্দরী এবং খুব মিষ্টি তার ব্যবহার। বাইরের ঘরের তরুণটি মেরির ভাই এন্টনি। এন্টনি একটি শিল্পনগরীতে চাকরি করেন, সপ্তাহান্তে মাঝে মাঝে এসে বোনের সাথে দেখা করে যান।মেরির আন্তরিক আচরণ আর সহজ ব্যবহারে সুচন্দ্রা মুগ্ধ হলেও, তিনি চেষ্টা করলেন যে কাজে তিনি এসেছেন সেই বার্তাটি সঠিক পরিবেশন করে দিতে এবং তাই বৌদির কাজের সমালোচনা করতে, খুঁত ধরতে কিন্তু সেভাবে খুঁত পেলেন কই? ঈশ্বরের ইচ্ছে একটু অন্যরকম ছিল। সুবিকাশ রাত্রে ফিরল হাসপাতাল থেকে, বোনকে দেখে খুব খুশি হল সে, এদিকে সুবিকাশকে বাবা মায়ের মত বললেন সুচন্দ্রা। সুবিকাশ মনে মনে আহত

হলেও বোনকে বললেন কয়েকদিন থেকে যেতে ওখানে। মেরি খুব উৎসাহ নিয়ে সুচন্দ্রাকে বলল ওখানকার আশে পাশের দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখে নিতে, এন্টনি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে এসেছিল, তার ওপরে দায়িত্ব পড়ল সুচন্দ্রাকে সব ঘুরিয়ে দেখানোর।

এন্টনির একটা বাইক ছিল, তার পেছনে সুচন্দ্রাকে বসিয়ে তিনি বাঁকুড়া আর তার আশেপাশে কদিন ঘোরালেন, তারপরে তার ছুটি শেষ হলে তিনি কর্মস্থলে ফিরে গেলেন। এদিকে সুচন্দ্রা হঠাৎই জ্বরে পড়লেন, তিনিও ভেবেছিলেন ঢাকায় ফিরে যাবেন, তাঁরও যাওয়া হলো না। বৌদি মেরির সেবায়, শুশ্রূষায় আর দাদা সুবিকাশের চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হলেন দিন পনের পরে। সুবিকাশ ঢাকার বাড়িতে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিল যে সুচন্দ্রা অসুস্থ। পনের দিনের দিন জ্বর ছেড়ে সুচন্দ্রা যখন উঠে বসেছেন সবে, আবার এন্টনি এলেন বোনের কাছে। এন্টনিকে দেখে সুচন্দ্রা অনুভব করলেন ওঁর খুব ভালো লাগছে এন্টনির সঙ্গ। এন্টনিও তাঁকে বিয়ে করতে চায়, সুচন্দ্রার তাতে মত আছে, কিন্তু তিনি বাবামায়ের কথা ভেবে নিজেকে সংযত করলেন। দুদিন আরো থেকে এন্টনি সুবিকাশ আর মেরির কথায় ওঁকে কলকাতায় পৌঁছতে এলেন। সেখানে ঢাকার জন্য রওনা হবার সময় এন্টনি একরকম জোর করে আগে চলে গেলেন। সুচন্দ্রাকে ছেড়ে দিতে গিয়ে নিজের যে কষ্ট হচ্ছে সেটা ঢাকতে তিনি পালালেন আর সুচন্দ্রা গোটা পথ চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরলেন।

বাড়িতে আরো কিছু অপেক্ষা করছিল সুচন্দ্রার জন্য, বাড়িতে গিয়ে শুনলেন ছোটবোন সুছন্দার কাছে সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব এসেছে আর সে তাতে সানন্দে রাজি হয়েছে। সুচন্দ্রা ভেবেছিলেন এন্টনির কথা মা বাবাকে জানাবেন কিন্তু সংকোচে আর পর পর ঘটে যাওয়া ঘটনায় তিনি আর তখুনি কিছু বললেন না। সুছন্দা সিনেমাতে যোগ দিল আর সেখানকার এক পরিচালককে বিয়ে করে সংসারী হল পরে।সুছন্দার সঙ্গে বাবামায়ের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল।

এর দুমাসের মাথায় সুবিকাশের একটা ছোট এক্সিডেন্ট হল, মেরি ঢাকার বাড়িতে টেলিগ্রাম করে জানাল। সুচন্দ্রা দাদাকে দেখতে এলেন বাঁকুড়ায়, এসে দেখলেন এন্টনির মা এসেছেন জামাইয়ের ওই বিপদ শুনে। তিনি সুচন্দ্রাকে একদম আপন করে নিলেন, তিনি থাকেন পুরুলিয়াতে এন্টনির পৈতৃক বাড়িতে এন্টনির বাবার সাথে।সেখানে তাদের বাড়ি, জমিজায়গা সব আছে। সুবিকাশ সুস্থ হলে এবার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন এন্টনি আর সুচন্দ্রা। বাবামা জানতে পেরে সুচন্দ্রাকেও ত্যাজ্য করলেন। দাদার খ্রিস্টান মেয়েকে বিয়ে করায় বাবামায়ের অসন্তোষ আর অসম্মতি জানাতে এসে সুচন্দ্রা নিজেই খ্রিস্টান পরিবারের বৌ হয়ে গেলেন।

কিন্তু সুচন্দ্রা প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি এন্টনির পরিবারকে পুরো হিন্দু করে দেবেন। সুচন্দ্রা এন্টনির সঙ্গে এলেন তার কর্মস্থলে জামশেদপুর । কোয়াটার পেয়ে গুছিয়ে সংসার করতে লাগলেন। সুচন্দ্রা আর এন্টনির পর পর পাঁচটা মেয়ে হয় ছেলে হবে এই আশা নিয়ে কারণ এন্টনির মায়ের একটি নাতির খুব শখ। ষষ্ঠবারে সন্তানসম্ভবা হওয়ার পরে সুচন্দ্রা এন্টনিকে নিয়ে, মেয়েদের নিয়ে ছুটলেন মা কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরে। সেখানে মা কল্যাণেশ্বরীর কাছে মানত করে এলেন ছেলের জন্য, আটমাসের শেষে ভীষণ অস্থির হয়ে ডাক্তারকে বলল “আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছিনা, আপনি সিজার করে বাচ্ছা বের করুন, তারপরে না হয় ইনকিউবেটরে রেখে

বাঁচাবেন।” ডাক্তার অনেক বুঝিয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে সিজার করলেন। এবারে সত্যিই ছেলে হল।আবার গিয়ে মা কল্যাণেশ্বরীর কাছে কল্যাণেশ্বরীতে মানতের পুজো দিয়ে এলেন, মাঝে মাঝেই চলে যেতেন সেখানে। ছেলেকে ভালোবাসতেন, কিন্তু মেয়েদেরকেও চোখে হারাতেন। একে একে পাঁচ মেয়ের বিয়ে হল, বড়ো দুজনে দুটি খ্রীষ্টান পরিবারেই বিয়ে করল, বাকি তিনজন হিন্দু পরিবারে। পরে এন্টনি সেই শিল্পনগরীর কংগ্রেসের বড়ো নেতা হন, অনেক রাজ্যস্তরের এবং জাতীয় স্তরের নেতাদের সঙ্গে ওঠাবসা ছিল তাঁর। আজ এন্টনি পরলোকে, সুচন্দ্রার বয়স আশির ওপরে। সব ছেলেমেয়েরাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত, আজ জীবনের উপান্তে এসে সুচন্দ্রা ভাবেন কি লাভ হল বাবামায়ের তাঁদের পছন্দ অস্বীকার করে আর সারাজীবন আপন সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে!! নিশ্চয় তিনি খুবই ভালো জীবন কাটিয়েছেন একদম নিজের শর্তে, সেটা তাঁর সবচেয়ে জোরের জায়গা, এন্টনি যে নিজে দেখে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন, একটা দিনের জন্যও তাঁর অমর্যাদা করেননি। বরং সুচন্দ্রার কথাই ছিল তাঁর কাছে শেষ কথা, তাই এন্টনিকে জীবনসঙ্গী করে তাঁর কোনো ক্ষোভ নেই। নিয়তির বিচিত্র গতি মেনে তাঁর ভালোই হয়েছে।

॥পলায়ন॥

অনেকদিন পরে গ্রীষ্মের ছুটিতে ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়িতে এসেছে মৈথিলী। বর প্রদীপ্ত ছমাসের প্রজেক্টের অনসাইট এসাইনমেন্ট নিয়ে জার্মানি গেছে, পাঁচ বছরের ছেলে রঙ্গিত আর সাত বছরের মেয়ে রঞ্জনার স্কুলের সামার ভ্যাকেশন শুরু হতেই আর দেরী করেনি মৈথিলী। একেবারে দুটো ট্রলি নিয়ে ট্রেনে চড়ে বসেছে হাওড়া থেকে ভোরে দুই ছানাদের সামলে নিয়ে। মা বাবার বয়স হয়েছে, এবারে বাবার হার্টের সমস্যা দেখা দেওয়ায় তিনি একটু দমে গেছেন। মা বাবার কাছে অনেকদিন গিয়ে থাকা হয় না বাপেরবাড়ি বালাসোরে। ভাই অনিকেত চাকরিতে ঢুকেছে সবে, সে মা বাবাকে সেভাবে সময় দিতে পারেনা। তাছাড়া একটা জিনিস মৈথিলী বোঝে, সে মা বাবাকে যতটা যেভাবে বোঝে সেভাবে ততটা বোঝা অনিকেতের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ মেয়েরা মনের দিক দিয়ে মা বাবার অনুভূতির অনেক নিকটের হয়, এটা অনিকেতের দোষ নয়, ছেলে আর মেয়ের মানসিক গঠনের তফাৎ।

যথাসময়ে ট্রেন ওদের বালাসোরে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল, বাবার বিশ্বস্ত লোক প্রকাশদা ওদের নিতে এসেছিল স্টেশনে। ছেলে রঙ্গিত আর মেয়ে রঞ্জনা সারা রাস্তা বকবক করে নানান প্রশ্নে মৈথিলীকে ব্যতিব্যস্ত করে খেয়েছে। বালাসোরে নেমে প্রকাশদাকে দেখেই দুজনে দৌড়ে গিয়ে তার দুদিকে ঝুলে পড়ল, ধমকে ওদের সংযত করে মৈথিলী উঠে বসল ওদেরকে নিয়ে বাবার পুরোনো ওয়াগনার গাড়িটাতে। স্টেশন থেকে ঘন্টা খানেকের রাস্তা ওর বাপেরবাড়ি। একসময় পৌঁছেও গেল, বাগান পেরিয়ে ঢোকার মুখে হঠাৎই ওর দৃষ্টি আটকে গেল বাগানে ঝুলন্ত দোলনাটাকে দেখে। ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, ওর মনের অনেক দোলাচলের সাক্ষী এটা। বালাসোরের খুবই অভিজাত এলাকায় ওদের বাড়িটা, বাবা ছিলেন আই টি আর চাঁদিপুরের উচ্চপদের বিজ্ঞানী, তাই বাঙ্গালী হয়েও একটু মফঃস্বল ঘেঁষা এই বালাসোরেই বাড়ি করে রয়ে গেছেন।

মায়ের ডাকে সচকিত হয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল মৈথিলী। মা বাবা দুজনেই ওদের পেয়ে ভীষণ খুশি হলেন আর রঙ্গিত আর রঞ্জনা দুজনেই এতো বড়ো বাড়ির চৌহদ্দিতে বাগানের মধ্যে নিজেদের ছড়িয়ে দিতে পেরে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল। ওরা এমনিতেই মামার বাড়ি আসতে খুব ভালোবাসে তাদের উপরি পাওনা দাদু দিদু মামুর আদরের জন্য। এবারে এতো বড়ো দীর্ঘ ছুটিতে এখানে থাকতে পারবে জেনে ওরা খুব আনন্দে দিন কাটাতে লাগল। আর মৈথিলীর গোটা মন জুড়ে আবার নতুন করে ঠাঁই নিল ওই বাগানে টাঙ্গানো দোলনাটা। দিনের মধ্যে মাঝে মাঝেই এসে ও দোলনাটাতে বসে, ওর মনের অস্থিরতা যেন ধরা দেয় দোলনার দোলনে। ঘুরতে ফিরতে যতক্ষণ বাড়ির মধ্যে থাকে ওকে পাওয়া যায় ওই দোলনাটার ওপরে। এমনকি মাঝে মাঝে ওর ছেলে মেয়ের সঙ্গেও ওর ঝামেলা হয়ে যায় ওই দোলনাতে বসা নিয়ে, আসলে প্রদীপ্তর বাইরে থাকা, ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব, মা বাবার অসহায়তা সব মিলিয়ে ও যে অস্তিত্বের দোলাচলের মধ্যে রয়েছে তার সঙ্গে দোলনার দোলাটা যেন কখন সমার্থক মনে হয় ওর। মা সুপ্রীতিদেবী আর বাবা অতনুবাবু দুজনেই মুখ টিপে প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন মেয়ের এই ছেলেমানুষী দেখে।

আসলে মৈথিলীর জন্যই এই দোলনাটা বাগানে লাগিয়েছিলেন অতনুবাবু। পাড়ার পার্কে দোলনায় উঠে ছোট্ট মৈথিলী নামতে চাইত না, সেই নিয়ে পাড়ার বাচ্ছাদের সাথে মন কষাকষি পর্যন্ত হয়ে গেছিল কিন্তু মৈথিলীর ওই দোলনা চড়ার নেশা ছাড়ানো যায়নি। তাই একরকম বাধ্য হয়েই এই দোলনাটা বাড়ির বাগানে লাগান স্ট্যান্ডসমেত অতনুবাবু। বেশ শক্তপোক্ত লোহার বড়ো সোফার মত দোলনাটা, তিনজন পাশাপাশি বসা যায়, সাদা রং করিয়ে বাগানের একটু ভেতরের দিকে এটাকে লাগানো হল আর মৈথিলীর বাড়ির বাইরে বেরোনোর সব আকর্ষণের ইতি হয়ে গেল ওখানে। সে সকালে স্কুলে যাবার আগে স্কুলের ড্রেস পরে একটু দোল খেয়ে নেয়, বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে ওই দোলনাতে বসেই দুলতে দুলতে বিকেলে খাবার খায়, পড়া মুখস্ত করে ওই দোলনাতে বসে আর রাত্রে পড়ে উঠে আধঘন্টা অন্তত তাকে বসে দোল খেতে হবে রাত্রে খাওয়ার আগে। রাত্রেও ওটাকে ছাড়ে না দেখে জায়গাটা বাঁধিয়ে মাথায় স্বচ্ছ শেড দিয়ে আলো লাগিয়ে সুরক্ষিত করেছিলেন অতনুবাবু যাতে কোনো অসুবিধে না হয় মৈথিলীর। বড়োই আদরের ছিল তাঁদের কাছে মৈথিলী। ভাই অনিকেতের সঙ্গে এই দোলনা নিয়ে কত ঝগড়া হয়েছে। ওদের দুই ভাইবোনেরই খুব প্রিয় ওই দোলনাটা।

কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই দোলনাটার সঙ্গে মৈথিলীর, লুকিয়ে আচার খাওয়া, তেঁতুলের চাটনি লুকিয়ে খাওয়া, গাছের পেয়ারা, কাঁচা আম সেও এখানে বসেই আয়েস করে খাওয়া। শীতের সকালে মায়ের করা পিঠে পুলি এই দোলনাতে রোদে পিঠ রেখে দোল খেতে খেতে খাওয়া, হেমন্তের দুপুরে উদাস হয়ে আকাশে দিকে চেয়ে এলোমেলো চিন্তা করার একমাত্র জায়গা ছিল এই দোলনাটা। প্রথম আমের মুকুল আসলে এই দোলনাতে বসেই দৃষ্টিগোচর হত, তার ঈষৎ কষাটে মেশা অঘ্রাণ নেওয়া, লাল পলাশের রঙের বাহার দেখা, বৃষ্টি ঝরা মেঘলা ভিজে বাতাসের শিরশিরানি নিয়ে বৃষ্টির ধারাপাত দেখা, কালবৈশাখীর আগমন বার্তা, শরতের শিউলির গন্ধ এই দোলনাটাতে বসেই ও পেত। প্রথম কবিতা লেখা ওর এই দোলনাতে বসে, প্রথম প্রেমিকের প্রপোজ করা এই দোলনার সামনে, প্রথম প্রেমে পড়ে সেই প্রেমপত্র পড়ার জায়গা এই দোলনাটা, প্রথম প্রেমের চুম্বনও এখানে বসে আবার সেই প্রেমিক যখন বর হয়ে অষ্টমঙ্গলায় এসেছে তার সঙ্গে খুনসুটির সাক্ষী এই দোলনাটা থেকেছে। প্রথম সন্তান কোলে নিয়ে এসে মৈথিলী বসেছে এই দোলনায়, সন্তানদের দোলা দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে এই দোলনায় শুইয়ে পাশে নিজে বসে থেকে। আজ এতদিন পরে এখানে এসে বারবার মনে হচ্ছে কি করে এতদিন ভুলে ছিল এই দোলনাটাকে।

সেদিন মায়ের সঙ্গে বসে রান্না জোগাড় করছিল মৈথিলী, হঠাৎ খেয়াল হল ছেলে মেয়ে দুটোকেই বহুক্ষণ দেখছে না, তাড়াতাড়ি সব ফেলে বেরোতে গিয়ে দেখে দুটোতে দোলনাতে বসে গুছিয়ে আচারের শ্রাদ্ধ করছে আর কি কথায় আপনমনে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। ওদের দেখে হঠাৎই নিজের ছোটবেলাটা যেন ভেসে উঠল চোখের সামনে, ও আর অনিকেত ওরা দুই ভাইবোনও তো এমনি করেই দোলনায় বসে নিজেদের একান্ত আপনার কথাগুলো ভাগ করে নিত ওখানে বসেই। ওদের আর বকুনি দেওয়া হল না মৈথিলীর। সেই তারই ট্রাডিশন যেন বয়ে চলেছে তার সন্তানদের মধ্যে দিয়ে।

আরেকদিন অনিকেতের আসার কথা তার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে বাড়িতে। সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষন, রাত নটা বাজতে যাচ্ছে, কেন এতো দেরী হচ্ছে এগিয়ে দেখতে গিয়ে দেখে সেই দোলনায় বসে অনিকেত আর তার বান্ধবী

গভীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে চুম্বনে রত। দেখে নিঃশব্দে সরে আসে মৈথিলী। পরে নিজেই ভেবে দেখে যে দোলনার উত্তরাধিকার এখন ভাই এবং তার পরিবারের, মৈথিলী এখানে দুদিনের অতিথি মাত্র। দোলনাটা তার জন্য লাগানো হলেও এখন আর সে দোলনার মালকিন নয়, সে এখন নিজের হাতে গড়া নিজের সংসার সাম্রাজ্যের মালকিন। এখন এখানে দু চার দিন, বড়োজোর মাসখানেক এসে থাকতে সে পারে কিন্তু এখানকার জিনিসের ওপরে তার সেই আধিপত্য আর বজায় নেই।

পরের শনিবার বাড়ির সকলে মিলে তারা গেল রমনাতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দিরে পুজো দিতে, সেখান থেকে ফেরার সময় চাঁদিপুরের সমুদ্রতট ছুঁয়ে বাড়ি ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। তার পরেরদিন গেল বহুবছর পরে পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে, সেখানে ঘুরে দেবকুণ্ড ঘুরে তারা ফিরল বিকেল নাগাদ। ফিরে এসে হাত পা ধুয়ে মা চা করছেন দেখে মৈথিলী গিয়ে বসল দোলনাটাতে। নিজের প্রিয় সঙ্গীর মতো দোলনাতে গা এলিয়ে নিজের মানসিক চাঞ্চল্য ভাগ করে নিতে বেশ কিছুক্ষন বসে রইল গুনগুন করতে করতে। রাত্রে খেতে বসে মৈথিলী জানালো তারা পরেরদিন কলকাতায় ফিরবে। মা বাবা, মৈথিলীর নিজের ছেলে মেয়েরা সবাই খুব অবাক হল কারণ আরো হপ্তাখানেক পরে বাচ্ছাদের ছুটি শেষ হচ্ছে, কিন্তু মৈথিলীর ফেরার সিদ্ধান্ত পাল্টালো না। স্টেশনে পৌঁছতে এসে বাবা জানতে চাইলেন, “এমন হঠাৎ করে চলে যাবার কি হল রে তোর?” মৈথিলী উত্তর দিল, “বাবা, আর কিছুদিন থাকলে ওই দোলনাটার মায়ায় এমন জড়িয়ে যেতাম যে আর ওটাকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না, তাই মায়া না বাড়িয়ে পালাচ্ছি গো, চেষ্টা করছি দোলনাটার মায়া কাটাতে।” নিজের মনের দোনামোনা ভাব সামলে একটু কষ্ট হলেও মৈথিলী আপন সত্তার দৃঢ়ভূমিতে নিজেকে যেন প্রতিষ্ঠিত করল এই হঠাৎ ফিরে যাবার সিদ্ধান্তটা নিয়ে। অতনুবাবু সজল চোখে মেয়েকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন আর মৈথিলীও সজল চোখে চলল নিজগৃহ পানে সন্তানসহ।

॥ক্লান্ত সন্ধ্যার রোমন্থন॥

ক্লান্ত কার্তিকের বিকেলে দ্রুত মুছে যাচ্ছে দিনের আলো, ঘড়িতে সবে বিকেল পাঁচটা, বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসে চারদিক ঘন মসীলিপ্ত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। নিস্তব্ধ নির্জন নিঝুম সন্ধ্যা নামছে চরাচর জুড়ে।পরনের শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে বিমলা এসে দাঁড়ালো নীলিমাদেবীর কাছে। বিকেলের খাওয়ার বাসন মাজার কাজ সেরে সে এবার বাড়ি যাবে, নীলিমাদেবীকে বলল, “ও মাসিমা, দরজাটা দিয়ে দাও গো, আমি এলুম এখন।” নীলিমা দেবী সম্মতিসূচক মাথাটা নেড়ে এগিয়ে গেলেন একতলার সিঁড়ির দিকে, বিমলা বেরিয়ে গেল, তিনি দরজাটা লাগিয়ে গিয়ে উঠলেন ঠাকুরঘরে। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে, ধূপ দিয়ে, শঙ্খে ফুঁ দিয়ে সন্ধে দিলেন, হাতজোড় করে প্রণাম করে এগিয়ে গেলেন বাসনের সিন্দুকের দিকে। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে যে বাসনগুলো বেরিয়ে ছিল সেগুলো এখনই তুলে ফেলবেন মনস্থ করেছেন।

ধুয়ে রাখা বাসনগুলো শুকনো কাপড়ে মুছে তোলেন প্রতিবার, সেইমতো একটা শুকনো কাপড় মজুত করে রেখেছেন আগে থেকে হাতের কাছে। বাসনগুলো একটা একটা করে মুছতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ছে। নীলিমাদেবীর এটা দ্বিতীয় বিবাহ, প্রথমবার বাড়ি থেকে দেখে বাইশ কাঠা জমির ওপরে বিরাট বাড়ি, বাগান, পুকুর, মন্দির সহ, তিন ভাইয়ের ছোটটির সঙ্গে মা বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন, সম্বন্ধ এনেছিল মাসতুতো দিদি। তখন তিনি সদ্য একুশে, সবে বি এ পরীক্ষা দিয়েছেন, রেজাল্টও বেরোয়নি। ছেলের কন্ট্রাক্টরির ব্যবসা, মা নেই, বাবার বয়স হয়েছে, দাদা বৌদি অভিভাবক ছেলের, বয়সে অনেকটা বড়ো ছিল নীলিমা দেবীর থেকে। দুমাস ছিলেন তিনি সেখানে, তার মধ্যে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তিনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন এক কাপড়ে। "কিছু দিতে হবেনা, কিছু লাগবেনা “বলে তারা কুড়ি ভরি সোনার গহনা নিয়েছিল, খাট বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি নিয়েছিল, টেপ রেকর্ডার, চল্লিশটা নমস্কারি শাড়ী আর প্রচুর কাঁসা পেতলের দানের বাসন নিয়েছিল। বাবা টিভি কেনার জন্য টাকাও দিয়েছিলেন কিন্তু সেই টাকা বা টিভি কোনোটাই আর নীলিমাদেবী পাননি হাতে।ডিভোর্সের সময় কিন্তু অধিকাংশ জিনিস ফেরত দেয়নি তারা। কেস চলাকালীন ওদের পক্ষের উকিল নীলিমা দেবীর বাবাকে বলেছিলেন, "আপনি কি দেখে এই বাঁদরটার গলায় এমন একটা সোনার মেয়ে তুলে দিলেন মশাই?” বাবা খুব লজ্জা পেয়েছিলেন সেদিন।

পরে নীলিমাদেবী অনেক খেটে ভালো চাকরি পান, সেখানেই আলাপ হয় আলোকিতের সাথে, তারপর বিয়ে, এক ছেলে এক মেয়ে হয়, নিজের সংসারের জন্য আর ছেলে, মেয়ে, বৃদ্ধা শাশুড়ির দেখা শোনার জন্য চাকরি ছেড়ে দেন তিনি টানা একুশ বছর চাকরি করার পরে। নীলিমাদেবীর মা নীলিমাদেবীর পুজো আচ্চার বাতিকের জন্য তাঁর সব পুজোর বাসন নীলিমাদেবীকে দিয়ে যান। শাশুড়ির কিছু বাসন শাশুড়ি দেন, নীলিমাদেবী নিজের শখেও অনেক বাসন কিনেছেন। সেইসব বাসন যোগ হয়ে যা দাঁড়িয়েছে তার পরিমাণ নেহাত কম নয়।

বড়ো পিলসুজটা শাশুড়ি মায়ের দেওয়া, প্রতিবার দুর্গাপুজোতে বেরোয়, এবারেও বেরিয়েছিল, বড়ো ঘটটা পাতা হয় লক্ষ্মীপুজোতে, দুটো পঞ্চপ্রদীপ আরতির জন্য, জলশঙ্খের পেতলের স্ট্যান্ড, বড়ো প্রদীপ যাতে অনেক ঘি দিয়ে জ্বালানো হয় সেটা, বড়ো নৈবেদ্যের থালা, ভোগ নিবেদনের নারায়ণ, লক্ষ্মীর থালা বাটি, রূপোর টাট,

তামার টাট নারায়ণের স্নানের, মধু নিবেদনের, পাঁচ কড়াই ভেজানোর, সব একে একে মুছে ঢোকালেন ভেতরে। এই যেমন পেতলের এই হাঁড়িটাতে মা খিচুড়ি করতেন লক্ষ্মীপুজোতে যা খেতে সারা পাড়ার লোক আসত তাঁদের বাড়িতে। হাঁড়িটা হাতে নিতে যেন সেই মায়ের হাতের খিচুড়ির সুবাস নাকে এসে লাগল নীলিমাদেবীর। ওই সিন্নি মাখার বড়ো গামলাটাতে পাঁচ কেজি আটার সিন্নি মাখতেন বাবা, কি অপূর্ব ছিল তার স্বাদ, গুড় নারকোল কোরা, কাজু, কিসমিস, পেস্তা, দুধ, বেদানার দানা, কাঁঠালি কলা দেওয়া সেই প্রসাদী সিন্নি পাড়ার লোকজন চেয়ে খেত তাদের বাড়িতে এসে। পেতলের কড়াইটা মুছতে গিয়ে মনে পড়ছে মায়ের হাতের লাবড়া, ফুলকপির তরকারি আর বাঁধাকপির তরকারির কথা। তিনি নিজেও ভালো রান্না করেন কিন্তু মায়ের হাতের সেই স্বাদ যেন পাননা নিজের ভালো রান্নাতেও। মুছছেন ছোট্ট স্টীলের কড়াইটা, এটাতে হত আমসত্ত্ব খেঁজুরের চাটনি, কিসমিস দেয়া। ছোট ছোট কলাপাতায় করে ভোগ পরিবেশন করা হত সকলকে। এক লহমায় যেন পৌঁছে গেলেন তিনি তাঁর সেই দুবিনুনি বাঁধা সালোয়ারের ওড়না কোমরে জড়িয়ে সবাইকে খাবার পরিবেশনের সময়টায়। যতদিন মা বেঁচে ছিলেন নীলিমাদেবী চলে যেতেন মায়ের কাছে লক্ষ্মীপুজোর দিনটাতে। শ্বশুরবাড়ির লক্ষ্মীপুজো মানে সেটা এক এক বছর এক এক জন করবে পালা করে, মানে ননদ, দেওর এরা আর কি। যার পালা পড়বে সে ছাড়া তার পুজোতে কেউ হাত দেবে না।পরে আলোকিতের পরামর্শে নীলিমাদেবীর মা মারা যেতে লক্ষ্মীর হাঁড়ি থেকে এক মুঠো ধান আলাদা করে তিনি নতুন হাঁড়ি পাতেন। সেই নিয়ে ননদ, দেওর, শাশুড়ি প্রচুর অশান্তিও করেন, কিন্তু নীলিমাদেবীর ঢাল হয়ে আলোকিত সব বিরুদ্ধাচারণের সমুচিত জবাব দেন।তারপরে প্রতিবছর পুজো হয়েছে। আগে পুরুত ডেকে পুজো করাতেন, কিন্তু তাঁদের ভুল উচ্চারণ এবং ভুল পুজো বিধিতে অতিষ্ট হয়ে নিজেই পুজো করেন।

নীলিমাদেবীর দুই ছেলে মেয়ে, নীলিমাদেবীর একমাত্র বোন, তার ছেলে খুব আনন্দ করে প্রতিবার এই লক্ষ্মী পুজোতে। নীলিমাদেবীর মেয়ে এমনিতে কোনো কাজ করেনা ঘরের, সেই মেয়ে পাঁচ ভাজা ভাজে, লুচি ভাজে, বোন নারকোল কুরিয়ে নাড়ু বানিয়ে দেয়, সব্জি কেটে, ময়দা মেখে হাতে হাতে সাহায্য করে, ভোগ নামিয়ে নিয়ে আসে ঠাকুরের সামনে দেওয়ার জন্য। বোনের ছেলে পুজোর জোগাড়ে সাহায্য করে। এবছর ছেলে কর্মসূত্রে বাইরে রয়েছে। করোনার আবহে আসতে পারেনি। মেয়ের এম এর অনলাইন ক্লাস চলছে, সে সারাদিন ব্যস্ত, তাও নারকোল কুরে দিয়েছে, লুচি ভেজে দিয়েছে। বোন আর বোনের ছেলে করোনার কারণেই আসতে পারল না।

তাই নিজের মত ছোট করে পুজো করেছেন তিনি, আলোকিত আর মেয়ে মিলে। এখন এই বাসনগুলো তুলতে তুলতে এইসব স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন তিনি, সেটা করতে গিয়ে বাসন ভরে সিন্দুকটা বন্ধ করে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। এমন সময় মেয়ে এসে ঠাকুরঘরে ঢুকে হাতটা ধরে টেনে বলল “চল না মা ওপরে, নটা বাজে যে, কি করছো তখন থেকে একা একা এখানে।” মেয়ের ডাকে সংবিৎ ফেরে নীলিমাদেবীর, বোঝেন অতীত রোমন্থন করতে গিয়ে এই নিশ্চুপ নিঝুম সন্ধেবেলাটা তিনি পুরোটাই খরচ করে ফেলেছেন। মেয়ের হাত ধরে উঠতে থাকেন ওপরে।

॥শ্রদ্ধাবানের অনুভবে॥

"হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুনৈকসিন্ধো
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভাবিতাসি পদং দৃশোরমে।"

অর্থ-হে দেব, হে কান্ত, হে জগতের একমাত্র বন্ধু, হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণার সমুদ্র, হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নরঞ্জন, হায় কবে আমার নয়ন গোচর হবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যাঁরা পড়েন তারা সকলেই জানেন যে শ্রীশ্রীপরমব্রহ্ম যিনি প্রত্যেক জীবের পরম লক্ষ্য, তাঁকে জানতে হলে যে পথ অবলম্বন করতে হয়, সেটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, যেটি সত্যযুগেও বিদ্যমান ছিল। সত্যযুগে হংস ভগবান যখন সনৎকুমারদি ঋষিগণকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করে ছিলেন, সেটি গীতারই সাধন ছিল। গীতা হচ্ছে আত্মগীত যার একটি চিন্ময়রূপ বর্তমান। সম্পূর্ণ গীতা তাই দেবতাস্বরূপ, যিনি কোনো কোনো মহাত্মার কাছে প্রকট হয়েছেন ধ্যানজ্যোতিরূপে। গীতার শ্লোকেও বলা আছে যে শুদ্ধাভক্ত যেখানে গীতা পাঠ করেন ও শ্রবণ করেন, ভগবান সেখানে আবির্ভূত হন। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৮নম্বর শ্লোকটিতে আছে:

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।।৩৯।।"

অনুবাদঃ সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হয়ে চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করেন। সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরা শান্তি প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ক্লাস চলাকালীন একটি ঘটনা শুনেছিলাম, বেশ কিছু বছর আগে এক ব্যক্তি একবার প্রয়াগে কুম্ভমেলায় সপরিবারে স্নানে গেছেন, ব্যক্তিটি একটু অসুস্থই ছিলেন, সঙ্গে স্ত্রী আছেন, জননী আছেন, পুত্র আছেন। সেবারে প্রয়াগে ছিল পূর্ণকুম্ভ মেলা, অস্বাভাবিক ভীড় হয়েছে, ভীষণ কোলাহল। ঠিক স্নান সেরে ফেরবার সময়ে হঠাৎ দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মিছিল শুরু হয় ঘোড়া, হাতি, শিঙ্গা নাকাড়া বাজিয়ে এবং সাধারণ পুণ্যার্থীদের মধ্যে প্রচন্ড হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সেই ব্যক্তিটি তাঁর পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান ভীড়ের একটা দিকে আর পরিবার রয়ে যায় আরেকদিকে। ভদ্রলোক ভীড়ের ধাক্কায় উপুড় হয়ে পড়ে যান এবং তাঁর ওপর দিয়ে লোক দৌড়োতে থাকে তাঁকে পদপিষ্ঠ করে। ভদ্রলোক একে অসুস্থ ছিলেন, তারওপর এই ভীড়ের চাপ এবং অসংখ্য মানুষের পায়ের তলায় পিষ্ট হবার যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকেন। এদিকে পরিবারের লোকজন তাঁকে খুঁজতে থাকে, ভীড় কমলে আর সন্ন্যাসীদের মিছিল চলে গেলে প্রথমে তাঁর স্ত্রী ও পরে পুত্র দেখেন তিনি ঐভাবে বাহ্যজ্ঞানরহিত অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, তৎক্ষণাৎ সেখানকার স্বেচ্ছাসেবীদের সাহায্যে তাঁকে ধরাধরি করে তুলে তাঁর পরিবার তাঁদের তাঁবুতে নিয়ে আসেন। ভদ্রলোকের জ্ঞান ফেরার পরে একটু সুস্থ হলে তিনি বেশ

কিছুক্ষন ধরে সংস্কৃতশ্লোক বলতে থাকেন, একটু ধাতস্থ হবার পরে তাঁর স্ত্রী জানতে চান তিনি হঠাৎ সংস্কৃত শ্লোক বলছিলেন কেন, তাঁর স্ত্রী যারপরনাই আশ্চর্য হয়েছিলেন কারণ সেই ভদ্রলোক যে আদৌ সংস্কৃত জানেন তা তাঁর স্ত্রীর অজ্ঞাত। তখন ভদ্রলোক বলেন যে ছোটবেলায় আট বছর বয়স থেকে তিনি টানা ছবছর প্রত্যেকদিন সংস্কৃত পন্ডিতমশাইয়ের কাছে গীতা পাঠ করতেন, এবং পরেরদিন সেটার পড়া দিতে হতো পন্ডিতমশাইকে, ফলে গীতা তাঁর মননে গেঁথে ছিল, কিন্তু তারপরে বহুদিন তাঁর নানাবিধ কারণে গীতাপাঠে ছেদ পড়ে যায়। যখন ঐ ভীড়ের চাপে তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছিলেন, তখন তিনি দেখেছেন তিনি একটি নদীর বালুকাময় তটে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর বেশ কিছু গাছের পাতা উড়ে উড়ে তাঁর চারিদিকে যেন ঘুরছে, তিনি আস্তে আস্তে একটি দুটি পাতা হাত দিয়ে ধরেন, ধরে দেখেন সেগুলির প্রতিটিতেই একটি করে গীতার শ্লোক লেখা রয়েছে, সেগুলি তিনি একটি করে ধরতে থাকেন আর বলতে থাকেন, বেশ কিছুক্ষন এইভাবে করার পরে তিনি অনুভব করেন তাঁর জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং তিনি পরিবারের মধ্যে আবার ফিরে এসেছেন। সেইদিন থেকে ভদ্রলোক আবার গীতাপাঠ শুরু করেন এবং জীবনের শেষে এসে ঈশ্বরকৃপায় মোক্ষলাভ করেন।

ঘটনাটা শুনতে খুব ভালো লেগেছিল, কিন্তু বিশ্বাস যে হয়েছিল বলতে পারি না। এর কিছুদিন পরে আমার গীতার ক্লাসে উপস্থিতির ছেদ পড়ে। আমার পায়ে অস্টিওআর্থিরিটিসের প্রচন্ড ব্যথা বাড়ে, তা ছাড়া আমার যেহেতু চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, রোদ্দুরে আমি তাই ভীষণ কাহিল হয়ে যাই, মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে জ্বর এসে যায়, এদিকে আমাদের গীতার ক্লাস সকালে ছাড়া হয়না। এইসব নানা কারণে আমার গীতার ক্লাসে যাওয়া হয়নি বেশ কিছুদিন। আমি ভেতরে ভেতরে ক্লাস না করতে পারার অপরাধবোধে ভুগতে থাকি। এই সময় পর পর চার পাঁচদিন আমি ঘুমের মধ্যে গীতার শ্লোক শুনতে থাকি এবং সকালে উঠেও দেখি সেগুলো মনে রয়ে গেছে। আমার ক্লাসে শোনা ওপরের ঘটনাটা মনে পড়ে যায় এবং খুব অবাক হই।

এর কিছুদিন পরে আমাদের যিনি গীতার শিক্ষক, যিনি নিজেও অতি সাত্বিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি,তাঁর সাথে আমার অন্য জায়গায় দেখা হলে তিনি প্রথমেই অভিযোগ করেন আমার গীতার ক্লাসের অনুপস্থিতি নিয়ে। আমি তখন তাঁকে বলি আমার টানা কয়েকদিন ধরে এই ঘুমের মধ্যে গীতার শ্লোক শোনার ঘটনা, শুনে তিনি আমায় আবার ক্লাসে যোগদান করতে বলে বলেন, “ক্লাসে আপনাদের বলেছিলাম মনে আছে “শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং”, আপনার ঐ ঘটনায় বিশ্বাস না থাকলেও গীতার ওপরে "পাঁচ শিকে পাঁচ আনা" বিশ্বাস আর ভক্তি তো রয়েছেই, তার ফল আপনি চাইলেও এড়াতে পারব।

॥ভগবানের মার॥

বেশ বড়ো করে সাইকোলজির “হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট” ম্যাডাম প্রিয়া চৌধুরীর স্মরণ সভার আয়োজন করেছে কলেজ থেকে আজকে। ঠিক দশদিন আগে মারা গেছেন ম্যাডাম প্রিয়া কোভিডে। উফফফফ....কী কষ্টই না পেয়েছেন তিনি, প্রথমে কোভিড হলো, তারপর শ্বাসকষ্ট বলে হাসপাতালে দিল, সেখান থেকে আই সি ইউতে। সেখানে থাকতে থাকতে থাকতে তিনি কোমায় চলে গেলেন, শেষ কয়েকদিন লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে রেখেও কিছু করা গেল না যখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করল কিন্তু দেহ দেয়নি বাড়ির লোকেদের হাতে, সেই ধাপার মাঠে গণচিতায় তাঁর দেহও দাহ হলো।বাড়ীতে যার মদের সেলারে দেশী বিদেশী সুরায় ভর্তি তাঁর মৃতদেহ দাহ হলো ঐভাবে.....ভাবা যায়! শেষের পাঁচ বছর প্রিয়া ম্যাম মোটামুটি অনেকেরই হাতে রেখে মাথা কেটেছেন, যথেচ্ছ দুর্ব্যবহার করেছেন লোকের সঙ্গে।বাড়াবাড়ি রকমের লাগামছাড়া অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করেছেন, কোনো মাংস বাদ দেননি, কোনো খাবার কমসম খাননি আর কেউ যদি বলেছে যে সে এসব খায়না, তাকে "সস্তা মধ্যবিত্ত মানসিকতা" বলে অপমান করেছেন সর্বসমক্ষে।আজকে স্মরণসভায় উপস্থিত রয়েছেন ইউনিভার্সিটির হেড এক্সামিনার, কন্ট্রোলার, কলেজের প্রিন্সিপাল, ডিপার্টমেন্টের এক্টিং হেড, ডিপার্টমেন্টের অন্য সব প্রফেসররা, লেকচারাররা, ল্যাব এসিস্টেন্ট হানিফ আর গ্রুপ ডি রীতা।এই রীতা যাকে রীতাদি বলা উচিৎ কারণ বয়সে সে অনেকটাই সিনিয়র প্রিয়া ম্যামের চেয়ে, প্রায় পঞ্চান্ন যাঁর বয়স, অন্ততঃ প্রিয়া ম্যামের চেয়ে বছর বারোর বড়ো তো বটেই এবং খুবই ভালো মানুষ, চুপচাপ, ঠান্ডা, তাঁকে উঠতে বসতে তাকে কী না কী বলেছেন তিনি, কিন্তু রীতাদি কখনো ফিরেও একটা জবাব দেয় নি বছর চল্লিশের প্রিয়া ম্যামকে। আর আছে উপস্থিত বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীরা যাদের তোষামোদ আর অন্যায়ভাবে পাইয়ে দেওয়া সুযোগের জন্য প্রিয়া ম্যাম বেশ জনপ্রিয় ছিলেন তাদের কাছে।

একপাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন প্রিয়া ম্যাম, কত ভালো ভালো কথা বলছে সবাই তাঁর সম্পর্কে। না, কারুর চোখে জল নেই তাঁর জন্য অবশ্য। ওই যে সামনের সারিতে বসে আছে সুমন, দিব্যঙ্গনা, অত্রি এরা তো পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ফেল করেছিল, ধর্ণা দিয়েছিলো গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড এক্সামিনারের আর কন্ট্রোলারের কাছে, এদের ওখানে গিয়ে ধর্ণা দেওয়ার পরামর্শটা তো উনিই দিয়েছিলেন। ওরা ওখানে ধর্ণা দিতে ওদের নাম লিখে নিয়েছিলেন হেড এক্সামিনার আর শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদনে ওদের একসঙ্গে সত্তর জনকে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওদের সেই পাশের আনন্দে উনি বাড়িতে ওদের নিয়ে মদের ফোয়ারা ছুটিয়েছিলেন, সঙ্গে অনুসঙ্গ হিসেবে ছিল গরুর মাংসের গোস্ত কাবাব, পর্ক ভিন্দালু। আসলে এই ছেলেমেয়েরা সবাই ধনী বিত্তবান পরিবারের সন্তান, ওদের বাবা মায়েরা টিউশনের পয়সা আর গিফ্ট ছাড়া প্রায়ই যে তাঁকে নানান সামগ্রী দিয়ে বছরের পুরো সময় তুষ্ট করে রাখে। উনিই বা কী করতেন ওদের পাশ করানোর কৌশল না বলে দিয়ে?

অথচ যে মেয়েটা সবচেয়ে বেশি মনোযোগী ছিল, সিরিয়াস ছিল তাকে খুবই তুচ্ছ কারণে একটা বছর পিছিয়ে দিয়ে ছিলেন,তিনদিনের মধ্যে একুশটা প্রাকটিক্যাল করিয়ে ঠিক জমা দেবার দিন বলেছিলেন যে না জমা নেওয়া যাবে না, তারপরেও যখন দেখলেন যে সে প্রাকটিক্যালের ওই পেপারটা ছাড়া বাকী সব পেপারে এবং পাশের সাবজেক্টও সেভেন্টি পার্সেন্ট নম্বর পেয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নম্বরের ব্যাপারে কিপটে

জায়গায়,তখন নিষ্ঠুর এক আনন্দে সে যখন আবার পরে ক্লাস করতে এলো পার্ট ওয়ানের তাকে "ক্যাজুয়াল ক্যান্ডিডেট" বলে উঠতে বসতে বিদ্রুপ করে অতিষ্ট করে ভীষণ আত্মপ্রসাদ পেয়েছেন। মেয়েটা বড্ড বেশি ভালো যে, তাকে ঘিরে ছেলেরা প্রপোজ করছে, তার আশেপাশে ঘুরছে আর সেই মেয়েটা শুধুই তার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে,সেটাই তাঁর বুকে জ্বালা ধরাতো। নিজে তিনি গ্রাজুয়েট হতে মোট আট বছর নিয়েছিলেন, তিন বছর তিনটে পরীক্ষার আর বাকী পাঁচ বছর ঘষটে ঘষটে তৈরী হতে, তাই একচান্সে কেউ ভালো ভাবে বেরিয়ে যাবে ভাবলেই গায়ের জ্বালা হত তাঁর। নিজের বিবাহিত জীবন টেকেনি তাই, আর কারো কোনো সম্পর্ক টিকুক উনি চাইতেন না। ডিপার্টমেন্টের অন্যদের উনি বলে দিয়েছিলেন ওই মেয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে, তিনি ভয়ও পেতেন একদিন যদি ও এসে তাঁর হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টের মসনদটা কেড়ে নেয়? তাই তাকে পাশ করতেই দিলেন না।

না আজকে ওই মেয়েটাকে মনে পড়ার কথাই নয় প্রিয়া ম্যামের, মনে পড়েছে একটাই কারণে। মৃত্যুর সাত মিনিট আগে সারা জীবনের কৃত ভালো খারাপ কাজগুলো যখন তিনি দেখছিলেন মহাকালের ইচ্ছেয়, তখন বার বার তাঁর সামনে ভেসে উঠেছে এই নিষ্পাপ (সত্যিই নিষ্পাপ, কোনো ভান নেই ওর আচরণে সেটা উনি এখন জেনে গেছেন) মেয়েটার সঙ্গে করা তাঁর দুর্ব্যবহারগুলো। এই মেয়েটা যার নাম অপরাজিতা, সে ছাড়াও আরো কিছু কিছু ছেলেমেয়েরাও তাঁর এই নেতিবাচক মনোভাবের শিকার। যেমন দিশানী, বনিতা, কৌশানি, অনিক, সায়ক, তারা খুব স্বাভাবিক কারণেই কেউ উপস্থিত নেই তাঁর স্মরণসভায়। আস্তে আস্তে ওখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাজির হলেন তিনি অপরাজিতার বাড়িতে।

অপরাজিতা বহু কষ্টে গত বছরে অক্টোবরে কোভিডের কারণে অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে, ইচ্ছে করে উনি ওকে এমন ভাবে নম্বর দিয়েছিলেন যাতে ও ফার্স্ট ক্লাস না পায়, পায়ওনি ও। কিন্তু সব কটা এম এর এন্ট্রান্সে চান্স পেয়েছিলো একদম ফার্স্ট লিস্টে, এখন একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি নিয়ে এম এ পড়ছে। সেটার ফার্স্ট সেমিস্টারে পঁচাশি শতাংশ নম্বর পেয়েছে, এখন সেকেন্ড সেমেস্টারের প্রস্তুতি চলছে তার। প্রিয়া ম্যামের হাতে আবার পড়তে হবে এই ভয়ে সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এর ফর্মই তোলেনি। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটিতেও ঢোকেনি পাছে আবার প্রিয়া ম্যামের গ্রিপে চলে আসতে হয়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যেটা লাগলো প্রিয়া ম্যামের যে অপরাজিতা কিন্তু ভীষণ কষ্ট পেয়েছে প্রিয়া ম্যামের অকাল প্রয়াণে।সেটা সে আর তার বাবা মা বার বার আলোচনা করছে বাড়ীতে বসে।এই ব্যাপারটা দেখে শুনে প্রিয়া ম্যামেরও খারাপ লাগছে, বিশেষ করে অপরাজিতার বাবা মা দুজনেই কোভিড আক্রান্ত তা সত্ত্বেও তাদের এই মনোভাব। ওদের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে প্রিয়া ম্যামের নিজেকে বড্ড ছোট মনে হলো, যে তিনি নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য একটা ভালো মেয়ের জীবন নষ্ট করে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর এবার মনে হলো সত্যিই ঈশ্বর তাঁকে ঠিক শাস্তি দিয়েছেন, তিনি বেঁচে থাকলে এমন আরো কিছু ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন ভাবেই ছিনিমিনি খেলতেন, সেই সুযোগটাই আর ঈশ্বর তাঁকে দিলেন না। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর অশীতিপর বৃদ্ধা মায়ের দুর্দশার শেষ থাকবে না হয়তো, কিন্তু তবুও কিছু নির্দোষ প্রাণ তো রেহাই পাবে।ভগবানের লাঠি যখন পড়ে তখন তাতে শব্দ হয় না বটে, কিন্তু তার অভিঘাত সামলাতে পারে না সবাই, তিনিও পারলেন না।

॥রবীন্দ্র পুরস্কার॥

খুব সকালে বাথরুম থেকে ফোনের আওয়াজটা পেলেন সাহিত্যিক, গবেষক ও গায়িকা ইন্দিরাদেবী।এতো সকালে কে? সবে সকাল সাতটা, কার প্রয়োজন পড়লো তাঁকে এই সময়ে আবার? আপন মনে ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলেন মেয়ে গায়ত্রী ফোন করছে। ফোনে সাড়া দিতে মেয়ে গায়ত্রী কলকল করে উঠলো, “উফফ... মা দেখেছো খবরটা? এবারে রবীন্দ্রপুরস্কারের জন্য তোমার গবেষণার বই” বর্তমান জীবনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রভাবনা “মনোনীত হয়েছে আর তাই তুমি এবারের অন্যতম রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপক। আমি এই মাত্র খবরটা পেয়েই তোমাকে ফোন করলাম। কংগ্রাটস মা, আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে এটা জেনে!!!!” সাহিত্যিক ও রবীন্দ্রগবেষক ইন্দিরাদেবী “হুঁ হুঁ” করে কোনোরকমে সম্মতি দিয়ে ফোনটা রেখে দিলেন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই রবীন্দ্র পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম মনোনীত হয়েছে খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু সত্যিই কী রবীন্দ্রনাথের ভাবনা তিনি প্রতিফলিত করতে পেরেছেন নিজের গবেষণায়, নিজের জীবনে? সত্যিই কী রবীন্দ্র মননকে আত্মস্থ করতে পারলেন এতো বছরের রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে কাজ করে? এই ভাবনা নিয়ে সারাদিন নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

নিজের ভেতরে নিজেকেই বার বার জিজ্ঞাসা করছেন ইন্দিরা দেবী। রবীন্দ্র ভাবনার প্রেরণা তাঁর জীবনে থাকলেও বিশ্বকবির মত জীবনবোধ তাঁর কোথায়? হবেই বা কিভাবে? ছোটোর থেকে তিনি মায়ের স্নেহের ছায়ায় লালিত পালিত হয়েছেন, কবির মত কাজের লোকেদের তত্ত্বাবধানে বড়ো হননি। বাবার সঙ্গে একা একা নয়, বাবা মায়ের সঙ্গে শৈশব, কৈশোরে ঘুরেছেন হিমালয়ে, করেছেন তীর্থ ভ্রমণ, জমিদারির বিলাস বা বৈভব নয়, সাধারণের জীবন যাপন করেছেন কিন্তু প্রথাগত শিক্ষা নিয়েছেন, প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন নিজের মত করে, কবির কাব্যের কথায়, ভাবনায় প্রকৃতিকে, জীবনকে চিনেছেন। উপনিষদ পড়ার বা বোঝার বহু আগে পড়েছেন ইন্দিরাদেবী স্কুলের পাঠ্য সহজপাঠ, কিশলয়ের রবিঠাকুরের কবিতা, শিখেছেন, গেয়েছেন রবীন্দ্রগান, পড়েছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা তাঁর কাব্যে, গল্পে, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্যতে । একটু একটু করে মননে, বোধে, আত্মায় মিশেছে রবীন্দ্র দর্শন। অনুভব করেছেন "আমার সকল ভালোবাসায়, সকল আঘাত সকল আশায়,তুমি ছিলে আমার সাথে "। কিন্তু কবির সারাজীবনের পাওয়া একের পর এক আঘাত, বেদনা, তাঁর একের পরে এক স্বজনবিয়োগের ব্যথা, সেসব তিনি কিভাবে পারবেন অনুভবে আনতে? লীলা সহচরী নতুন বৌঠানকে হারানোর বেদনা যাঁর ফলশ্রুতিতে লিখেছেন " সে চলে গেল, বলে গেল না, সে কোথায় গেল ফিরে এলো না"। যাঁকে আদর্শ করে জীবনে এগোনোর চেষ্টা করেছেন কবিগুরু তাঁর যৌবনে, সেই জ্যোতিদাদার নতুন বৌঠানের মৃত্যুর পরে নিঃশব্দে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, সেই আঘাত তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছে, “যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম ভুলিয়ে দিল তারে, আবার কোথা চলতে হবে গভীর অন্ধকারে।” কবির পুত্রবিয়োগের ব্যথা বুকে নিয়ে লেখা, “আমার এ ঘর বহু যতন করে, ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে, আমাকে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে, যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।” কবির তাঁর যে রচনাকর্ম, তাঁর জীবন, নিজের সময়ে নিজের ভুমিকা খোঁজার চেষ্টা এবং সেই অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়ে তোলা-সব ক্ষেত্রেই তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ঈশ্বরচিন্তার একটি

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল৷ সুতরাং সেই হিসেবে বলা চলতে পারে যে, তিনি আধ্যাত্মিক কবি ছিলেন বা আধ্যাত্মিক কবিও ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, উপনিষদের সব পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটি নারীর ব্যাকুল বাণী ধ্বনিত-মন্ত্রিত হয়ে উঠেছে - যা কখনোই বিলীন হয়ে যায়নি৷ তিনিও জানতেন,

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়...
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম।

অর্থাৎ, হে সত্য, সমস্ত অসত্য হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও; হে প্রকাশ, তুমি একবার আমার হও, আমাতে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক।

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কৈশোরের প্রারম্ভে, তখন তাঁর বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে নিয়ে হিমালয়ে যেতেন। এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের এক স্তম্ভ৷ উনি রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদের শ্লোক পড়াতেন, মুখস্থ করতে দিতেন, তার মানে বলে দিতেন৷ সেই যে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ, উপনিষদের সঙ্গে পরিচয় এবং তার সঙ্গে হিমালয়ের পরিবেশ-এগুলোর একটা গভীর ছাপ তাঁর জীবনে পড়েছে৷ ইন্দিরাদেবীর মনে হল, তাঁর রচনাকর্মের প্রথম দিকে এটাই ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী ছাপ। ফুল যেভাবে কুঁড়ি থেকে বিকশিত হয়, "ফুল যবে সাঙ্গ করে খেলা ফল ধরে সে "তেমনই উপনিষদের চিন্তা থেকেই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হয়েছে।"

যেমন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে লেখেন, 'মানুষের আলো জ্বালায় তার আত্মা, তখন ছোটো হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহংকার৷ জ্ঞানে-প্রেমে-ভাবে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা৷ সেই যোগের বাধাতেই তার অপকর্ষ, জ্ঞানের যোগে বিকার ঘটায় মোহ, ভাবের যোগে অহংকার, কর্ম যোগে স্বার্থপরতা৷' লেখেন, 'ভৌতিক বিশ্বে সত্য আপন সর্বব্যাপক ঐক্য প্রমাণ করে, সেই ঐক্য-উপলব্ধিতে আনন্দিত হয় বৈজ্ঞানিক৷' অর্থাৎ তাঁর কাব্যের ভাষায় "বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহার, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

প্রথম যে কাব্যগ্রন্থটি যেখানে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচিন্তার একটা আভাস মেলে, সেটা হচ্ছে 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে। নৈবেদ্যের ঈশ্বর - কিছুটা বলা যেতে পারে 'কর্পোরেট ঈশ্বর।' তার নিশ্চিত কর্তব্য আছে৷ তিনি একজন দূরের মানুষ৷ তার কাছে রবীন্দ্রনাথ দাবি জানাচ্ছেন - 'আমাকে এভাবে গড়ে তোলো'...."চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,

জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে

দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়-
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা-
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

এবং ঈশ্বর, স্বদেশ, সমাজ - এই তিনটে মিলে একটা ত্রিভুজ তৈরি হচ্ছে৷ সেখান থেকে indira দেবী দেখেছেন, তাঁর যে গীতপর্ব - গীতাঞ্জলী, গীতিমাল্য, গীতালি - তাতে তাঁর যে ব্যক্তিস্বত্ত্বা, তাঁর যে ক্ষুদ্র আমির জগত, তার সঙ্গে যে এই বিশ্ব-আমির সম্পর্ক - সেটাকে তিনি খোঁজার চেষ্টা করছেন, ছটফট করছেন এবং ধীরে ধীরে সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। গীতালিতে সেই পর্ব পুরো হয়েছে৷ এটাকে বলা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব৷ আর তৃতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ উদার এক মহাসমুদ্রের মতো হয়ে উঠেছেন। সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের চারটি কাব্যগ্রন্থ।"

তাই গীতাঞ্জলিতে নিজেকে অঞ্জলি দিতে গিয়ে বলেছেন " আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে, স্থান দিও হে আমায় তুমি সবার নীচে "বা" রয়েছ তুমি এ কথা কবে,জীবন মাঝে সহজ হবে,আপনি কবে তোমারি নাম, ধ্বনিবে সব কাজে।.. এখানে ঈশ্বর দূরের মানুষ, ক্ষুদ্র আমির জগৎ। এরপরে গীতিমাল্যতে বলেছেন "রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে, তোমায় আমায় দেখা হল, সেই মোহানার ধারে।সেইখানেতে সাদায় কালোয় মিলে গেছে আঁধার-আলোয়,সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে এপারে ওইপারে।" এইপর্বের লেখায় তাই তাঁর অস্থিরতা পরমাত্মার খোঁজে প্রকটিত আর গীতালিতে সেই তিনিই বলছেন, "বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি,সেই তো স্বর্গভূমি। সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি, সেই তো আমার তুমি।"

তাই কবিগুরুর কবিতার ভাষাতেই আবারো বলা যায়,

"মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
....কে সো জানি না কো চিনি নাই তারো
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে,
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপ-খানি।

কে সে, চিনি নাই তারে...।....."যদি তারে নাই চিনি গো সেকি আমায় নেবে চিনে "বা" অকারণে অকালে মোর পড়লো যখন ডাক, তখন আমি ছিলেম শয়ন পাতি।"

হয়তো জীবনের ধারা রবিঠাকুরের সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর মেলেনা, কিন্তু এ কথা তো সত্যি যে আস্ত একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা, কারুর জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হয়ে ওঠা, মানুষের বেঁচে থাকার সময়ের যতরকম আবেগ হয়, সবগুলোর ভাবনার বিকাশ, সব ঋতুর মূল্যায়ন আর কে করেছে রবিঠাকুরের মত করে? আজ তাঁর মৃত্যুর প্রায় আশি বছর পরেও তিনি সমান প্রাসঙ্গিক এবং সমসাময়িক। যা কিছু আমাদের ভাবনার প্রকাশ, বিকাশ এবং প্রতিফলন তার প্রথম কথাটা তো তিনিই সেই একশো বছর আগেই বলে বসে আছেন। তিনি যে কয়েক শতক এগিয়ে ছিলেন চিন্তায় ভাবনায় মননে আত্মিক অগ্রগতিতে তাঁর সময়ের চেয়ে। আর সেই চিন্তাগুলোর সুসংহত রূপ লেখিকা ও গবেষক ইন্দিরাদেবীর এই গবেষণা।

সারাদিন ধরে ভেবে ইন্দিরাদেবীর এতক্ষনে মনে হলো প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার পাওয়ার অভিঘাতে তাঁর যে মনে হয়েছিল তিনি এর যোগ্য কিনা তা বোধহয় ঠিক নয়, কারণ সারাদিন ধরে নিজের লেখার একটুও না ঘেঁটে নিজের মননে যে চিন্তা তিনি করে গেলেন তা বোধহয় পুরোটাই ব্যতিক্রমী, রবিঠাকুর যে ওতোপ্রতভাবে জড়িয়ে গেছেন তাঁর সর্বসত্ত্বায়, তাঁর অন্তঃস্থলে। তাছাড়া তাঁর বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে তিনি উপস্থাপিত করেছেন, সেটা নিশ্চয় আলাদা যে কারণে উদ্যোক্তারা তাঁকেই বেছেছেন এই পুরস্কারের জন্য। রবীন্দ্রনাথ বলতে শিক্ষিত বাঙালি “শেষের কবিতা” ভাববে, “চোখের বালি” ভাববে, “গোরা” ভাববে, কিন্তু প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথকে কী অস্বীকার করা যায়? নারীবাদী রবীন্দ্রনাথ যিনি বলছেন " নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবারে কেন নাহি দিবে অধিকার “সেই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা যায় বা মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ যিনি “এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান” বলে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ডাক দিচ্ছেন তাঁকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব?!!!

ভাবতে ভাবতে বিকেলের আলোয় টান ধরার আগেই বাড়ির বেল বাজল, তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য নিতে এসেছেন উদ্যোক্তারা। তাঁদের সঙ্গে বেরিয়ে দেখলেন ইন্দিরা দেবী মেয়ে গায়ত্রীও সপরিবারে উপস্থিত। এগিয়ে গেলেন তাঁরা তাঁদের গন্তব্য সায়েন্স সিটির অডিটোরিয়ামে। যথাসময়ে উঠলেন ইন্দিরা দেবী পুরস্কার নিতে, তাঁকে কিছু বলতে অনুরোধ করলে তিনি দীর্ঘ গবেষণাকালে কী কী উপাদান জোগাড় করতে কার কার কাছে সাহায্য পেয়েছেন সেই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করলেন রবিঠাকুরেরই বিখ্যাত গান দিয়ে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করে:

“তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই--

কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই॥

মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,

তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই॥

হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে

যাহা-কিছু সব আছে আছে আছে--

নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই।

অন্তরগ্লানি সংসারভার

পলক ফেলিতে কোথা একাকার

জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই।”

॥ধর্মের কল॥

দেবিকার সঙ্গে যখন রাজীবের বিয়ের কথা প্রথম হয়, দেবিকার বাবা এসেছিলেন তাঁর বড়ো জামাই আর চতুর্থ মেয়ের বরকে নিয়ে বাঁকুড়া থেকে ছেলের বাড়িতে কথা বলতে। এসে তিনি অলকবাবুর সামনে হাত দুটো ধরে অনুরোধ করে বললেন, "আমার ছোট মেয়েটিকে আপনি আপনার পায়ে ঠাঁই দিন, ও খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে।" অলকবাবু এরপরে সৈকত, মধুশ্রী, তার বর আর রাজীবকে পাঠান বাঁকুড়াতে শুধু গিয়ে "হ্যাঁ" বলে আসতে কারণ অলকবাবুর রাজীবের বিয়ে দিতে হবে আর সেটা বড়োলোক বাড়িতে কারণ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার রাজীবের ব্যবসা টলোমলো, তাই বড়োলোক শ্বশুরবাড়ি হলে রাজীবের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত। ওরা গিয়ে তাই করে আর বিয়ের কথা সম্পূর্ণ হলে দেবিকার বাবা এসে অলকবাবুকে জিজ্ঞেস করেন যে কি দিতে হবে। সেই সময় অলকবাবু দেবিকার বাবা চলে যাবার পরে দেবিকার জন্মছক দেখে বলেন মধুশ্রী, প্রতিভা আর সৈকতকে যে দেবিকা বয়সে প্রতিভার চেয়ে দু বছরের বড়ো। প্রতিভা খুব অবাক হয়, তখন উনি বুঝিয়ে দেন যে যে রাশি লগ্নের কম্বিনেশন আর চেহারার ছবি উনি দেখেছেন, তাতে সেটাই দাঁড়ায়। অলকবাবু পেশায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হলেও নেশা ছিল জ্যোতিষ চর্চা।এরপরে দেবিকার সঙ্গে রাজীবের বিয়ে ফাইনাল হয়।

দেবিকার বিয়ের সময় দেবিকাদের বাঁকুড়ার বাড়িতে বরযাত্রী গেছিল প্রথম এবং শেষবার সৈকত আর প্রতিভা অন্য সকলের সাথে । ননদ, নন্দাই সবাই গেছিলো, বিয়ের পরে যেদিন দেবিকা প্রথম শ্বশুরবাড়িতে পা দিল, সেদিন নতুন বরকনে রাজীব দেবিকার সঙ্গে সৈকত, প্রতিভা, মধুশ্রী আর বরও একই বাসে ফিরল। প্রতিভা বাড়িতে ফিরে শুনল যে সেদিন ওদের বাড়ির জল সব শেষ হয়ে গেছে, যেটা ওর সেই তিনবছরের বিবাহিত জীবনে প্রথমবার ঘটেছে। যাই হোক, নতুন বৌ দেবিকাকে শাশুড়ি অমিয়াদেবী বরণ করে ঘরে তোলার পরে কড়ি খেলা প্রভৃতি স্ত্রী আচার শুরু হলে শাশুড়ি অমিয়াদেবী বাড়ির সকলকে মিষ্টি দিতে বললেন প্রতিভাকে। মিষ্টি দেওয়া হলে ওকে পাঠিয়ে দিলেন হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নিতে ওর ঘরে। প্রতিভা মনে মনে খুব কৃতজ্ঞ হল, কারণ পর পর দুদিন ছ সাত ঘন্টা বাস জার্নি করে এসে ওর শরীর আর সত্যি দিচ্ছিল না। ও ঘরে এসে হাত পা ধুয়ে মেঝেতেই শুয়ে পড়ল। ঠিক চোখ লেগে আসছে যখন রাত আটটা নাগাদ ক্লান্ত সৈকতও এসে হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ল খাটে। রাত বারোটার পরে ওকে সৈকত ডেকে তুলল ওকে মশাতে ছেঁকে ধরেছে দেখে আর নিজে গেল দেখতে কিছু খাবার দাবার আছে কিনা জানতে, গিয়ে দেখল অমিয়া দেবী বেশ কিছু মিষ্টি, ঠান্ডা দুধ সরিয়ে রেখেছেন ওদের জন্য।সৈকতকে দেখে সেগুলো সমেত ওকে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন আর রাত্রে নীচে নামতে বারণ করে দিলেন। দুজনে সেগুলো খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

পরেরদিন রাজীবের বৌভাত, সকালে কিছু আত্মীয় এলেন, তাদের দেখা শোনার দায়িত্বে প্রতিভা তখন, তাদের দুপুরের খাবার ব্যবস্থা যে বাড়িটা বৌভাতের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে সেই বাড়িতে। কয়েকবার যাতায়াত করল প্রতিভা সেই সব আত্মীয়দের নিয়ে। দুপুরে পার্লার থেকে লোক এলো কনে সাজাতে, মধুশ্রীকেও সাজালো তারা, প্রতিভাকে কেউ ডাকলোও না। প্রতিভা নিজেই সেজেগুজে পৌঁছল সন্ধেবেলায় বৌভাতের জন্য ভাড়া নেওয়া বাড়িতে। সবাই ওর সাজের প্রশংসা করল যখন তখন ননদ মধুশ্রী, রাজীব আর দেবিকা বেশ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওকে দেখতে লাগলো।

বৌভাতের পরেরদিন সকালে নিচে নেমে দেবিকা প্রথমেই নিজের আগের দিনে উপহার পাওয়া জিনিসগুলো লোক দিয়ে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে ঢোকালো যাতে শ্বশুর, শাশুড়ি আর ননদ মধুশ্রী বিশেষ ক্ষুণ্ণ হলো, দেবিকা নির্বিকার।

এরপরে আস্তে আস্তে অনেক সময় চলে গেছে। শ্বশুর অলকবাবু যিনি দেবিকার সম্পর্কে বলেছিলেন , " ম্যানুফ্যাক্টরিং ডিফেক্ট ",মারা গেছেন, দেবিকার আর মধুশ্রীর ঈর্ষা নগ্ন প্রকাশ দেখে দেখে প্রতিভার মাঝে মাঝে মনে হয় বাড়ি ছেড়ে চলে যায় কিন্তু সৈকতের মা, ভাই আর বোনের প্রতি অকৃত্রিম টান তাদের বাড়ি ছাড়তে দেয়নি। মেয়ে হয়েছে দুজনেরই, প্রতিভার আর দেবিকার, মধুশ্রীর সঙ্গে দেবিকার মাখো মাখো ভাব এখন মুখ দেখাদেখি বন্ধতে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবে এরা দুজনেই পরশ্রীকাতর, তাই কারুর ভালো দেখলে এরা যে নিজেদের কোথায় নামাতে পারে তা দেখতে দেখতে প্রতিভা একদম সরে গেছে এদের থেকে কিন্তু শাশুড়ি অমিয়াদেবী এখনো বর্তমান, আর তিনি ওদের দুই জায়েরই দায়িত্ব। বাড়িতে শাশুড়ি অমিয়া দেবীকে নিয়ে থাকে প্রতিভা আর দেবিকা দুই জা, মেজ আর ছোট, সৈকত আর রাজীবের একটা করে মেয়ে, সৈকতের মেয়ের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট রাজীবের মেয়ে। সৈকতের মেয়ে তার খুবই আদরের, মেয়েটাও স্বভাব গুণে আদর কাড়ে। রাজীবের কিন্তু মেয়ে হয়েছে বলে খুব দুঃখ হয়েছিল, এখন সেটাকে ঢাকা দিতে আদিখ্যেতাটা বেশি করে মেয়েকে নিয়ে কিন্তু মনে মনে মেয়েকে কতটা ভালোবাসে সেটা বলা মুশকিল। আসলে রাজীব আর দেবিকা দুজনেই ভীষণ জটিল চরিত্র, সব কিছুতেই তাদের মাথায় প্যাঁচ ঘোরে।

প্রতিভা আগে চাকরি করত, এখন বাড়িতেই আছে মেয়ের পড়াশোনা দেখার জন্য। প্রতিভা সাধারণ পরিবারের মেয়ে, বাবা মায়ের থেকে নেওয়ার চেয়ে দিয়েছে অনেক বেশি। তারা দুই বোন, দুজনেই বাবা মাকে দেখেছে তাদের সাধ্যের বাইরে গিয়ে, এখন বাবা মা গত হতে নিজেদের মধ্যে খুব আন্তরিক সম্পর্ক তাদের । দেবিকার বাবা একে পাবলিক প্রসিকিউটর তায় গ্রামের জোতদার, দেবিকা তারই ছোট মেয়ে, বাপেরবাড়ির প্রচুর পয়সা, সে পাঁচ বোনের সবার ছোট, মায়ের প্রচুর সোনা আর বাবার ওকে দিয়ে যাওয়া এক কোটি টাকা আর বাপের বাড়িটার সে মালিক। বাবা মায়ের কুপরামর্শদাতা, তাই তার বোনেদের সঙ্গে ওপর ওপর ভালো সম্পর্ক দেখালেও ভেতরে ভেতরে বোনেদের মধ্যে সদ্ভাব নেই। তাছাড়া দেবিকা ভীষণ অর্থকেন্দ্রিক, কোথায় কাকে মেরে দুপয়সা বেশি জমাবে সেই ফিকির খোঁজে সারাক্ষন। শাশুড়ির কাজের লোক আর নিজের কাজের লোক একটাই রাখে যাতে শাশুড়ির ভাগের কাজ না করে ওর উনোকোটি কাজ তাকে দিয়ে করাতে পারে ।দেবিকার মন বরাবর খুব ছোট, সে প্রতিভাকে প্রায় নিজের সতীনের মত হিংসে করে, কারণ প্রতিভা কোনো ঝুটঝামেলায় থাকে না আর চেষ্টা করে শাশুড়িকে ভালো রাখার। সে সাংসারিক কূটকচালি থেকে দূরে থাকে।তাতে তার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু বুড়ো অশীতিপর শাশুড়ির ওপরে তার একধরণের মায়া আছে। বাড়ির নীচের তলাটা ভাড়া দেওয়া আছে যে ভাড়াটা দেবিকা নেয় শাশুড়ির দেখাশোনার নাম করে, কিন্তু তার স্বভাব এমন যে সে বাড়িশুদ্ধু সবাইকে চালাতে চেষ্টা করে, ফলে ননদ মধুশ্রীর সঙ্গে, জা প্রতিভার সঙ্গে এবং শাশুড়ি অমিয়া দেবীর সঙ্গে তার সংঘাত লেগেই আছে।

বড়ভাই সমীরণ বৌ সুমিতাকে নিয়ে থাকে শ্বশুরবাড়িতে, প্রতিভার বিয়ের আগেই তারা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিলো। শ্বশুর অলকবাবু আর শাশুড়ি অমিয়াদেবী দুজনের সঙ্গে সমীরণের কি নিয়ে যেন মনোমালিন্য হয়েছিল। তাই অলকবাবুর জীবিতাবস্থায় আর তারা আসেনি। অলকবাবু মারা যেতে তাদের প্রথম বাড়িতে দেখল প্রতিভা। একমাত্র ননদ মধুশ্রী বড়োলোক বাড়ির বৌ, আবার দাদাদের ছোট বলে এবাড়িরও খুব আদরের। প্রতিভার শ্বশুরবাড়ি দুশো বছরের পুরোনো বাড়ি, আগে বাগান পুকুরসহ একটা বাড়ি ছিল, তারপরে চার শরিকে ভাগ হয়ে চারটে আলাদা ভাগ হয়েছে। কিন্তু এখনো প্রতিটা ভাগের সঙ্গে বড়ো বাগান আছে দুদিকে আর পুকুরটা বুজে এসেছে দেখাশোনার অভাবে। প্রতিভার শ্বশুরবাড়ির এই পাড়াতে আশেপাশের সবাই লতায় পাতায় আত্মীয়। তাই সবাই সবাইকে চেনে। দেবিকা সব আত্মীয়দের কাছে গিয়ে বলে এসেছে সে-ই শাশুড়িকে দেখে, মেজ ছেলে সৈকত আর মেজ বৌ প্রতিভা তো দেখেই না। এদিকে বাড়িতে ছেলেরা সবাই মিলে ঠিক করেছে যে মায়ের সকালের জলখাবার আর রাত্রের খাবার ছোটবৌ দেবিকা দেবে আর দুপুরের খাবার, সকাল আর বিকেলে চা মেজবৌ প্রতিভা দেবে। রাত্রে অমিয়া দেবী শুধু এক কাপ ভিভা খেতেন বিগত তিরিশ বছর ধরে, এখন দেবিকার হাতে পড়ে সেটা এক গ্লাস ছাতু গোলায় এসে দাঁড়িয়েছে। অমিয়া দেবী সুগারের রুগী, হাঁপানি আছে, তাই তাঁর নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়, সেটা মেজবৌ প্রতিভা দিত, হঠাৎই একদিন প্রতিভা দেখল যে ওষুধ খাওয়ানোর কাজটা ছোট দেওর রাজীব করছে। যতদিন প্রতিভা খাইয়েছে ওষুধ শাশুড়ি অসুস্থ হয়নি, এবারে শাশুড়ি কেমন যেন ঝিমোতে লাগল। সৈকত রাজীবকে জিজ্ঞেস করে জানলো অমিয়া দেবী সুস্থ থাকলেই বাড়িতে অশান্তি করেন দেবিকার সঙ্গে বলে তাঁকে মাইল্ড ডোজের ঘুমের ওষুধ খাওয়াচ্ছে রাজীব দেবিকার পরামর্শে।

কদিন আগেই নবীনবাবুর নাতির জন্মদিন ছিল, বাড়ির দুই ছেলেরই সপরিবারে নিমন্ত্রণ ছিল। প্রতিবেশী বিপত্নীক নবীনবাবুর নাতির জন্মদিনে আগে গেছিল দেবিকা, রাজীব তাদের মেয়েকে নিয়ে, তার ঘন্টা খানেক পরে গেল প্রতিভা, সৈকত আর তাদের মেয়ে। নবীনবাবুর ছেলের বৌটি একদম বাচ্ছা মেয়ে হিয়া, বছর পঁচিশ হবে বয়স। সে প্রতিভাকে চিনলেও তেমন কথা হয়নি, প্রতিভা আর সৈকত গিয়ে নবীনবাবুর ছেলে ববির সঙ্গে, নবীনবাবুর মেয়ে রুবির সঙ্গে কথা বলল, নবীনবাবুও বললেন দেখে শুনে খেতে তাদের। তারা উপহার দিয়ে খেয়েদেয়ে চলে এসেছিল।

ঘটনাচক্রে করোনার পরে লোক রাখল যখন প্রতিভা, দেখা গেল সেই লোক বাসন্তী নবীনবাবুর বাড়িতেও কাজ করে। তাতে প্রতিভার কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু একদিন সেই লোক এসে বলল, “জানোতো বৌদি, হিয়া বৌদি আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিল তোমাদের জায়ে জায়ে কতা আছে কিনা, আমি বননু যে আমি তোমাদের কখনো কতা বলতে দেখিনিকো। হিয়া বৌদি বলতেছিল যে তোমার জা নাকি মাসিমাকে দেখে, তুমি নাকি দেখোইনা। আমি বননু বৌদি আমার সামনে রোজ মাসিমার ভাত বেড়ে নিয়ে যায় গুইছে গাইছে, সকালের চায়ের কাপ পেলেটও আমি ধুই নয় বৌদি ধুয়ে নেয়, মাসিমার দুপুরের খাবার থালা বাটি তো আমি নয় বৌদি বিকেলে খাবার বাসন ধোবার সময় ধুয়ে নিই, তাহলে দেখেনা কিরকম করে গো? আমি তো দেখেছি তুমি গিয়ে মাসিমার জামা ছাইড়ে দাও, বিছানা ঝেইড়ে দাও, তাহলে এমন কেন বলেছে গো বৌদি তোমার জা?” প্রতিভা বুঝলো দেবিকার সেই পুরোনো খেলা আবার শুরু হয়েছে, ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “কবে আবার এতো কথা হল ববির বৌয়ের সঙ্গে আমার জায়ের?” কাজের লোক বাসন্তী বলল, “ববিদার ছেলের জন্মদিনে গিয়ে তো তোমার নামে

সাতখানা করে নিন্দে করে এয়েছে গো তোমার জা।” প্রতিভা মনঃক্ষুন্ন হলেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বলুক গে । বলে নিজের কাজে মন দিল। আজকাল এসব গায়ে মাখে না আর প্রতিভা।

উল্টোদিকের বাড়িতেই থাকেন মামাশ্বশুররা সপরিবারে, তাদের মধ্যে এক মামিশাশুড়ি প্রীতির দুর্নাম আছে কুঁদুলে বলে, তার সঙ্গে আবার দেবিকার খুব ভাব, রাস্তায়, ঘাটে, অনুষ্ঠানে একেবারে গলে যায় দুজনে দুজনকে দেখলে। এই মামিশাশুড়ি প্রীতি আবার একটু ঠোঁটকাটা। কাজের লোক বাসন্তী ওই কথা বলে যাবার কয়েকদিন পরে সেই মামিশাশুড়ি প্রীতির সঙ্গে রাস্তায় দেখা প্রতিভার। সেদিন একাদশী, প্রতিভা শাশুড়ি খেতে চেয়েছেন বলে আইসক্রিম আর শাশুড়ির পছন্দের কচুরি আলুরদম কিনে বাড়িতে ঢুকছে, ঠিক গেটের মুখে উনি ওকে আটকালেন।

নানান কথা বলতে বলতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, “এগুলো কিনেছিস কি মেয়েটার জন্য?” প্রীতিমামীর সব ব্যাপারেই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জানার স্বভাব। প্রতিভা বলল, “না গো, মেয়ের তো সর্দি রয়েছে এসব খাবে না, মায়ের ইচ্ছে হয়েছিল খেতে, তাই আনলাম।” উনি বললেন,"তবে যে দেবিকা বলে তুই ছোড়দিকে দেখিস না, কোনো খোঁজ রাখিস না!!! চলতো বাড়িতে তোদের একবার, বলে প্রতিভাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ওকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে এসে ঢুকলেন শাশুড়ি অমিয়াদেবীর ঘরে। এই মামিশাশুড়িটিকে প্রতিভা একটু এড়িয়ে চলে তার এই কুঁদুলে স্বভাবের জন্যই আর কথা চালাচালি করার জন্য, পাড়ায় এঁর বেশ প্রভাব আছে, তাই সে ত্রস্ত হয়ে উঠলো অশান্তির ভয়ে। ইনি আবার দেবিকারও বিশেষ বন্ধু। অমিয়াদেবী অসময়ে ভাজকে দেখে অবাক হলেও সাদরে আহ্বান করলেন কারণ ভাজের স্বভাব তাঁরও অজানা নয়।

সেই প্রীতিমামমী সটান অমিয়া দেবীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে বসলেন, “তোমাকে প্রতিভা দেখাশোনা করে?” অমিয়াদেবী অভিজ্ঞ মানুষ, উনি সাগ্রহে বললেন, “ওই তো দেখে রে, খেতে দেওয়া, গল্প করা বসে আমার সঙ্গে, সময়ে অসময়ে এসে জামা ছাড়ানো, ভালো মন্দ রান্না করে কখনো, কখনো এনে খাওয়ানো, মশারি করে দেওয়া,আমি তো একা থাকি সারাটা দিন,ওই মাঝে মাঝে এসে দেখে যায়, জানলা দরজা লাগিয়ে দিয়ে যায়।” বলেই প্রতিভাকে বললেন, “তুই যে আমাকে বলে গেলি আজ কচুরি আলুরদম আর আইসক্রিম খাওয়াবি, তার কি হল রে মাইয়া?” প্রতিভা তাড়াতাড়ি ওর হাতের জিনিস প্লেটে সাজিয়ে শাশুড়ির সামনে দিতেই প্রীতিমামী বললেন, “যাই বোলো দিদি, তোমার ছোটবৌ দেবিকা "জ্যান্ত মাছে পোকা পড়াতে পারে।” অমিয়াদেবী জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন ভাজের দিকে।

ঠিক সেই সময় দেবিকা প্রীতিমামি এসেছে বলে দেখা করতে ঢুকল আর প্রীতিমামী একঘর লোকের মাঝখানে দেবিকাকে বলে বসলেন, “তুই এতো মিথ্যে কথা বলিস কেন রে? এতে তোর মনে হয় তোর ভালো হবে? ছি ছি, ভাগ্যিস আমি আজ নিজের চোখে দেখে, নিজের কানে ছোড়দির মুখে শুনে গেলাম তাই, নাহলে তো তোর কথাই সত্যি মেনে প্রতিভাকে খারাপ ভাবতাম। এতো মিথ্যে বলা তোর ধর্মে সইবে?” কি মিথ্যে বলেছে দেবিকা জানতে চাইলে উনি ব্যাখ্যান করে প্রতিভা যে অমিয়াদেবীকে দেখেনা বলেছে ওঁর কাছে সেটার উল্লেখ করলেন। অমিয়দেবীও শুনে অসন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু সরাসরি আক্রমণে দেবিকা ফুঁসে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল, সৈকত আর

রাজীবও সেখানে উপস্থিত ছিল, সৈকত বলে উঠল,"কাউকে কিছু করতে হয় না, দেখেছো তো ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে কুৎসা রটালেও সত্যিটা একদিন না একদিন বেরোবেই। অক্ষম রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দেবিকা ওপরে উঠে যায়, পেছন পেছন রাজীবও চলে যায়। প্রীতিমামী শাশুড়ি অমিয়দেবীকে বলেন, এবার থেকে একটু সমঝে চলো ছোড়দি দেবিকাকে, বাব্বা, কী সাংঘাতিক মেয়ে!!! আমিও পাড়ায় বলে দেব সবাইকে।

আজকের এই ঘটনায় প্রীতিমামীকে প্রতিভা নতুন করে চিনল।প্রতিভা প্রীতিমামীর জন্য চা করতে করতে ভাবতে থাকে সেই পাঁচফোড়নের পাঁচটা উপকরণের মত সংসার এই পাঁচরকমের মানুষদের নিয়েই, কারো ঝাঁজ বেশি, কারো স্বভাব তিক্ত, কারো সুন্দর গন্ধ কিন্তু একসাথে মেলালে নিটোল একটা অন্যরকম গন্ধ যা জীবনের বাঁচার স্বাদ বাড়ায়, সবাইকেই সবায়ের লাগে, কেন যে কেউ কেউ সেটা না বুঝে সবার ওপরে নিজের কর্তৃত্ব খাটাতে যায়!!!! মানুষ তো দোষে-গুণেই হবে, কারো দোষ বেশি, কারো গুণ বেশি, কারো, আবেগ বেশি, কারো মায়া বেশি আবার কারো মেজাজ বেশি !!!! আপন মনে হেসে ফেলে সে আজকের ঘটনায় আর চা জলখাবার নিয়ে গিয়ে হাজির হয় প্রীতিমামীর সামনে।

॥ভবিষ্যৎ কর্ণধার॥

জাপানে সুজোকিরি কোম্পানি বেশ বড়ো সংস্থা, নানা ধরণের ব্যবসার সঙ্গে তারা যুক্ত। তাদের চেয়ারম্যান তথা কর্ণধার শ্রীফুজিয়ামার বেশ বয়স হয়েছে, তিনি ঠিক করেছেন তিনি এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্ণধার নির্বাচন করবেন। সেই কাজের জন্য উনি জাপানের বিভিন্ন অফিসের পাঁচজন সর্বোচ্চ অধিকারিককে ডেকে পাঠালেন, প্রত্যেকেই তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের কর্মের উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছেন। চেয়ারম্যানের চেম্বারে মিটিং হল এবং মিটিং শেষ হবার পরে তিনি প্রত্যেক অধিকারিককে একটা করে শিমের দানা দিলেন আর বললেন দুমাস পরে আবার তিনি সবাইকে ডাকবেন এই শিমের দানা সমেত, এই দুমাসে তিনি দেখবেন এই দানা কার হাতে কেমন বেড়েছে।

পাঁচজন আধিকারিক শিমের দানা নিয়ে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন, সাধ্যমতো যত্ন করতে লাগলেন। সপ্পোরোর আধিকারিক শ্রীমিশোমার খুব অবস্থা খারাপ, তাঁর শিমের বীজটা অনেক কায়দা করেও কোনো অঙ্কুরোদ্গম হয়নি,গাছ তো অনেক দূরের ব্যাপার। তিনি বহু চেষ্টা করলেন, তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে চেষ্টা করেছেন কিন্তু কিছুতেই গাছ বেরোলো না, ওদিকে আর চার অধিকারিকদের কারো এক ফুটে গাছ হয়েছে, কারো ছয় ইঞ্চির, কারো তিন ইঞ্চির আর একজনের খালি সদ্য কয়েকটা পাতা গজিয়েছে। এদিকে দেখতে দেখতে দুমাস অতিক্রান্ত, সবাই পৌঁছলো ওসাকার হেড অফিসে সঙ্গে করে নিজের নিজের বড়ো হওয়া গাছ নিয়ে। কেবল শ্রীমিশোমার বীজের কোনো গাছ হয়নি, তিনি বীজটা পকেটে করে নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে তাঁর রেসিগ্নেশন লেটার। তিনি নিশ্চিত তাঁর চাকরিটি থাকছে না।

শ্রীফুজিয়ামা ঢুকলেন চেয়ারম্যানের চেম্বারে, সবাই দেখলো পাঁচটা চেয়ার পাতা আছে, যার শেষটা একদম টেবিলে মাথায়, অর্থাৎ ওটাই ভবিষ্যতের কর্ণধারের আসন আর বাকিগুলো তাঁর সহযোগীদের । একে একে সবাইয়ের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে এবারে তিনি দেখতে চাইলেন কার দানা থেকে কেমন গাছ হয়েছে এবং সেটা কত বড়ো হয়েছে। প্রথম তিনি গেলেন যাঁর গাছটা একফুটের বেশী লম্বা, শ্রীফুজিয়ামা গাছ দেখে মাথা নাড়লেন সম্মতিসূচক আর তাঁকে সহযোগীদের একদম শেষের পঞ্চম চেয়ারে গিয়ে বসতে বললেন। তিনি তাই করলেন। এবারে এগিয়ে গেলেন তিনি যাঁর গাছ নয় ইঞ্চি হয়েছে, তাঁকে উনি চতুর্থ চেয়ারে বসতে বললেন। এবারে গেলেন তিনি যাঁর গাছটা ছয় ইঞ্চি হয়েছে, তাঁকে তৃতীয় চেয়ারে বসালেন, তারপরে গেলেন তিনি যাঁর গাছটা তিন ইঞ্চি হয়েছে আর দুটো মাত্র পাতা বেরিয়েছে, তাঁকে উনি দ্বিতীয় চেয়ারে বসতে বললেন।

শ্রীমিশোমার অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিলেন কিছু বলার জন্য, কিন্তু বলতে পারেননি. একবার তিনি ভাবলেন বেরিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু অন্য অধিকারিকদের ওই প্রক্রিয়াটা চলাকালীন বেরিয়ে যাওয়াটা শিষ্টাচার বিরোধী, তাই বেরোননি। এবারে তাঁর সময় আসতে তিনি পকেট থেকে বীজটা বের করে টেবিলে রাখলেন এবং তাঁর হাতে যে ওই শিমদানা থেকে কোনো গাছ হয়নি বললেন। তারপরে তিনি তাঁর রেসিগ্নেশন লেটারটা বের করেছেন দেবেন বলে এমন সময় শ্রীফুজিয়ামা শ্রীমিশোমারকে বললেন ওই প্রধান কর্ণধারের চেয়ারটায় গিয়ে বসতে। সবাই অবাক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

মৃদু হেসে শ্রীফুজিয়ামা বললেন, “তোমাদের সবাইকেই আমি দানা দিয়েছিলাম কিন্তু একটা জিনিস তোমাদের বলিনি যে ওই দানাগুলো সেদ্ধ শিমের দানা যার থেকে গাছ হবার সম্ভাবনা নেই। তোমরা না জেনে চেষ্টা করেছো ওই দানা থেকে গাছ হওয়াতে এবং গাছ বের না হতে অন্য শিমের দানা পরিচর্যা করে গাছ বের করে নিয়ে এসেছো এখানে, যে যত তাড়াতাড়ি অন্য শিমের দানা পুঁতেছে তার ততো বড়ো গাছ হয়েছে। একমাত্র শ্রীমিশোমার সেসব কিছু না করে সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে এসেছে সেই পুরোনো দানাটা নিয়ে। কোম্পানির যে ভবিষ্যৎ কর্ণধার হবে তাঁর প্রথম গুণ থাকা দরকার সততা ও উদ্যোম, শ্রীমিশোমারের সেই সততা আছে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা আর সেই উদ্যোম আছে কারণ সে চেষ্টা করেছিল ওই বীজ থেকে গাছ হওয়াতে এবং সেটা না হওয়াতে সে নিজের পদত্যাগপত্র লিখে এনেছে যাতে তাঁর অপারগতায় কোম্পানির ক্ষতি না হয়। এতে তাঁর কোম্পানির প্রতি দায়বদ্ধতা প্রমাণ হয়। তোমরা প্রত্যেকে এর বিকল্প ভেবেছো এবং তার জন্য অন্য বীজ থেকে গাছ তৈরী করে এনেছো যেটা কোম্পানির বিকল্প ব্যবসার রাস্তা দেখাবে। তাই আমি শ্রীমিশোমারকে এই কোম্পানির কর্ণধার নির্বাচন করলাম আর তোমাদের তাঁর যোগ্য সহযোগী। আশা করি তোমাদের আমার এই সিদ্ধান্তে কোনো দ্বিমত নেই।” সবাই উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীফুজিয়ামার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে শ্রীমিশোমারকে নতুন কর্ণধার হিসেবে স্বাগত জানালো।

॥কৈশোরের কালবৈশাখী॥

তখন দুর্গাপুরে থাকি, ক্লাস সেভেনে পড়ি, মর্নিং স্কুলের বাস স্টপেজে আসে পৌনে ছটায়। শীতকালে অন্ধকার থাকলেও গরম কালে ওই সময়টা বেশ মনোরম থাকে, আলোও ফুটে যায় ভালোই। মে মাসের দিন, সেদিন উঠতে দেরী হয়েছে, রাত্রে অসহ্য গরমের জন্য ঘুম হয়নি ভালো, সকালে যথারীতি দেরী হয়ে গেছে বিছানা ছাড়তে। তাই কোনোরকমে মুখধুয়ে ভিজে গামছা দিয়ে সর্বাঙ্গ মুছেই স্কুল ইউনিফর্ম গলিয়ে ব্যাগটা নিয়ে বাড়ি থেকে দৌড়ে বাসস্ট্যান্ডে। এসে দাঁড়ানো মাত্র বাস চলে এলো, অসম্ভব হাঁসফাঁসে গরম সেদিন।

গরমে হাত পা জ্বালা করছে সেই অবস্থায় স্কুলে পৌঁছে প্রেয়ারের জন্য দাঁড়িয়ে দেখলাম সবাইয়ের গরমে কষ্ট হচ্ছে প্রেয়ারের লাইনে দাঁড়িয়ে। মিসেদের অবস্থাও তথৈবচ। যাইহোক, পুরো স্কুল করে বাড়ি এলাম, মা লেবুর শরবত করে রেখেছিলেন, সেটা খেয়ে স্নান সারলাম, তারপরে ঠান্ডা ঠান্ডা কড়াইয়ের ডাল, পোস্ত চচ্চড়ি, পাতলা মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে বাইরের ঘরটা বেশ করে জল দিয়ে মুছে শুয়ে পড়লাম সব দরজা জানলা বন্ধ করে দেড়টা নাগাদ। এতো গরম তখন যে মা খাওয়ার আগে শাড়িটা কেচে মেলে দিয়েছিলেন, খেয়ে উঠে দেখলাম সেটা শুকিয়ে ঝামা হয়ে গেছে।

শুয়ে তো পড়লাম, কিন্তু মেঝেটা তেতে আগুন, তাও ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল, দেখি মা পাশে নেই, বোন অঘোরে ঘুমোচ্ছে এক পাশে। উঠে জল খেয়ে 'মা কোথায়' দেখতে গিয়ে দেখি মা বারান্দায়, বারান্দায় যাবার দরজাটা বারান্দার দিক থেকে বন্ধ। ধাক্কা দিতে মা খুলে দিল। বারান্দায় বেরোতেই অবাক, সমস্ত আকাশটায় কালো করে মেঘ করেছে, হাল্কা হাল্কা ঠান্ডা হাওয়া শুরু হয়েছে।

দূরে মাঠটার দিকে তাকিয়ে দেখি ঝড়টা আসছে ওইদিক থেকে। আমাদের বাড়ির থেকে কণিষ্ক-হর্ষবর্ধনের চৌমাথাটা দেখা যায়, সেখানে রাস্তার দুধার গাছে ঢাকা, সেই গাছগুলোর ঝরা পাতা, শুকনো খড়কুটো, ধুলোবালি, ছেঁড়া কাগজ, শুকনো ঘাস, লতা, পাতা উড়িয়ে নিয়ে ওই গোলচক্করটার কাছ থেকে ঘুরতে ঘুরতে ঝড়টা আসছে, সব দোতলা কোয়াটারগুলোর ছাদের মাথায় উড়ছে ওই ঘাস, পাতা, কাগজ, ধুলো, বালি, মাটি সব, দূরের মাঠের ওপরের গাছগুলো আবছা দেখাচ্ছে ঝড়ের জন্য। ধুলোর আস্তরণে পুরো চরাচর ঢেকে গেছে, অন্ধকার করে এসেছে চারিদিক। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকের সাথে বাজ পড়তে আরম্ভ করেছে-আসছে, সে আসছে, তার ঠিক পেছনে আসছে সর্বক্লান্তিহর, সর্বতাপহর কালবৈশাখী তার তাপহরা তৃষাহরা বারিধারা নিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে শ্রান্তিহারী স্নিগ্ধ জলে রুদ্রা প্রকৃতির রক্তচক্ষু কোমলতায় ভরা মমতার আঁচল হয়ে ধরিত্রীর বুকে নেমে এসেছে। মনে পড়ল 'কালবৈশাখী' কবিতাটা:

কালবৈশাখী
মোহিতলাল মজুমদার

মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে!
ধরণীর 'পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে!

কানন-আনন পাণ্ডুর করি
জলস্থলের নিশ্বাস হরি
আলয়ে-কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিল কে!

আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ, নিমেষ গনিছে তাই কি তাহারা সারি সারি নিস্পন্দ?
মরুৎ-পাথারে বারুদের ঘ্রাণ
এখনি ব্যাকুলি তুলিয়াছে প্রাণ?
পশিয়াছে কানে দূর গগনের বজ্রঘোষণ ছন্দ?

হেরি যে হোথায় আকাশকটাহে
ধূম্র মেঘের ঘটা,
সে যেন কাহার বিরাট মুন্ডে
ভীমকুন্ডল জটা!
অথবা ও কিরে সচল অচল-----
ভেদিয়া কোন্ সে অসীম অতল
ধাইছে উধাও গ্রাসিতে মিহিরে ,
ছিড়িয়া রশ্মিছটা!

ওই শোনো তার ঘোর নির্ঘোষ ,
দুলিয়া উঠিল জটাভার
শুরু হয়ে গেছে গুরু -গুরু
রব--নাসা -গর্জন ঝঞ্ঝার ।
পিঙ্গল হল গলতলদেশ,
ধূলিধূসরিত উন্মাদবেশ----
দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণিবন্ধন সন্ধ্যার।

অঙ্কুশ কার ঝলসিয়া উঠে দিক
হতে দিক-অন্তে!
দিগ্ বারণেরা বেদনা-অধীর বিদারিছে
নভ দন্তে।
বাজে ঘন ঘন রণদুন্দুভি,
ঝরে সে আওয়াজ কভু যায় ডুবি ,
যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের

BANGL

দূর পন্থা!

বঙ্কিম-নীল অসির ফলকে দেহ হল কার ভিন্ন?
অনাবৃষ্টির অসুরের বাধা কে করিল নিশ্চিহ্ন ?
নেমে আসে যেন বাঁধ -ভাঙা জল,
ম্লান হয়ে আসে মেঘকজ্জল,
আলোকের মুখে কালো যবনিকা
এতখনে হল ছিন্ন।

হেরো, ফিরে চলে সে রণবাহিনী
বাজায়ে বিজয়শঙ্খ,
আকাশের নীল নির্মল হল ---ধৌত ধরার পঙ্ক ।
বায়ু বহে পুন মৃদু উচ্ছ্বাসে
নদী উথলিছে কুলুকুলু ভাষে,
আলো-ঝলমল বিটপীর দল নিশ্বাসে নিঃশঙ্ক।

নববর্ষের পুণ্য বাসরের কালবৈশাখী আসে।
হোক সে ভীষণ, ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে।
ঝড়-বিদ্যুৎ বজ্রের ধ্বনি---
দুয়ার জানালা উঠে ঝনঝনি---
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে বুঝি ,
তবু প্রাণ ভরে আশ্বাসে।

চৈত্রের চিতা-ভস্ম উড়ায়ে
জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর,
তৃণ-অঙ্কুরে সঞ্চারি রস, মধু ভরি বুকে মৃত্তির,
সে আসিছে আজ কাল-বৈশাখে---
শুনি টংকার তাহার পিনাকে
চমকিয়া উঠি---তবু জয় জয়
তার সেই শুভ কীর্তির।

এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি
ধরায় ধরে না হর্ষ
ওরি মাঝে আছে কাল-পুরুষের

সুগভীর পরামর্শ।
নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ কায়া,
নিশীথনীরব ঘনঘোর ছায়া----
ওরি মাঝে আছে নববিধানের আশ্বাস দুর্ধর্ষ।

এর মধ্যে ঝড়ের তান্ডবে বোন উঠে পড়েছে। আমি, মা, বোন তিনজনে তিনটে মোড়া নিয়ে বারান্দায় বসে ঝড় দেখতে দেখতে সাড়ে চারটে বাজল, মা ছাতা নিয়ে পাঠাল বাপিকে বাসস্ট্যান্ড থেকে নিয়ে আসতে। তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, কালো পীচের রাস্তায় আমি খালি পায়ে ছুটছি বাপির বাসস্ট্যান্ডের দিকে। বাপি নামল বাস থেকে, বাপির সঙ্গে বাপির দুই বন্ধু, বোসদা আর চক্রবর্তীকাকুও আছে, আমি ছাতাটা বাপির হাতে ধরিয়ে দিয়ে এন্তার বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নাচতে নাচতে বাড়ি এলাম। এসেই মায়ের কাছে বকুনি খেয়ে ভিজে জামা কাপড় ছেড়ে শুকনো জামা পড়লাম। এমন সময় মা দেখি আমায় ডাকছে, কেন? মোড়ের মাথার রঞ্জিতের আলুর চপ, ফুলুরির দোকান থেকে ওই চপ আনতে। মহানন্দে চললাম আবার, কিন্তু এবারে আর ভিজবার ঝুঁকি নিলাম না, তাহলে বাড়ি ফিরে নিশ্চিত 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' আছে কপালে। চপ, ফুলুরি, জিলিপি কিনে লিংক রোড পেরিয়ে ঠিক পাড়ায় ঢুকেছি, এমন সময়ে ঝপ করে সব অন্ধকার।

দুর্গাপুরে যেহেতু সব ওভারহেড লাইন, ঝড়বৃষ্টি হলেই সব অফ করে দেয় বড়ো বিপর্যয় এড়াতে। অন্ধকার চোখ সওয়া হতে বাড়িতে ফিরলাম, আরেকপ্রস্থ চা হল, সঙ্গে চপ মুড়ি। অন্ধকারে বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজ আর ব্যাঙেদের কনসার্ট শুনতে শুনতে বারান্দায় বসে সবাই মিলে বসে খাওয়া হল। এমন সময় দেখি নিচে সিঁড়ির মুখে টর্চের আলো আর কেউ ডাকছে বাপিকে। বাপি নিচে গেল, ফিরল ওপরে সঙ্গে এক আত্মীয়। তাঁকে চা জলখাবার দিয়ে অন্ধকারেই মা বসাল খিচুড়ি, সঙ্গে হল আলুভাজা, ডিমভাজা, পাপরভাজা আর চাটনি। রাত্রে হ্যারিকেনের আলোতে সকলে মিলে বসে হাপুস হুপুস করে খাওয়া হল সেই খিচুড়ি। সেই আত্মীয়ের বিছানা করলাম বাইরের ঘরে। আমরা খাটে আর মেঝেতে মিলিয়ে ভেতরের ঘরটাতে শুয়ে পড়লাম নিশ্চিন্তে বারান্দার দরজা খুলে কারণ দুর্গাপুরে তখন মশা ছিল না আর সেদিন আর গরম নেই। হঠাৎ কালবৈশাখী আর প্রবল বৃষ্টিতে সব স্নিগ্ধ, শীতল হয়ে গেছে। ব্যাঙের ডাক আর বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে একদম ঘুমিয়ে পড়লাম সবাই।

কালবৈশাখী
****

দীর্ঘ তপ্ত দুপুরের তৃষ্ণার্ত
রৌদ্রোজ্জ্বল নিদাঘের হুতাশে,
নির্জন ছায়াময় আম্রকুঞ্জে
আম্রমুকুলের মধুর সুগন্ধি বাতাসে।

কোথা হতে আহ্বানে ভেসে এলো
কালো মেঘের দলের বাহিত রথ,

মুহূর্তে অম্বর ছেয়ে গেলো ঢেকে
শুরু হল কালবৈশাখীর জয়রথ।

পিপাসিত তাপিত ধরা হলো
সাময়িক শীতল অবগাহনে,
স্নিগ্ধ ভেজা বাতাসের প্রলেপে
তৃষিত ধরণী বৃক্ষ তৃপ্ত ধারাস্নানে।

উড়িয়ে তার অভ্রভেদি রথ সে এলো
ধরিত্রীর বুকে করে গেল তান্ডব,
তবু এই ভীষণ ঝড়ের আগমনে
হরষিত সমাজ জীবন মানব।

সে বার্তা নিয়ে আসে স্বস্তির, আশ্বাসের,
শীতলতার, আগামীর নতুন পরশের,
তার পদধূলিতে দলিত মথিত হতেও সুখ
এই মাটির, বৃক্ষের, লতার অপার হরষের।

BANGL

আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেল কলকাতায় রয়েছি, অনেক কালবৈশাখী অনেকভাবে দেখলাম, কিন্তু আমার দূর্গাপুরের দেখা কালবৈশাখীর সঙ্গে সেগুলোর কোনো তুলনাই চলে না। কোলকাতার কালবৈশাখী গরমের থেকে সাময়িক স্বস্তি দিলেও ভোগান্তিটাই বেশী, যানজট, কাদা, ভিজে সর্দি জ্বর ইত্যাদি। আজও তাই মনটা আটকে রয়েছে ওই শিল্পনগরীর আনাচে কানাচে। আজও ভুলতে পারিনা সেই 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় শ্যামলিমা স্মৃতিপথ।

॥জীবনসঙ্গী॥

“জয় জগন্নাথ”...জগন্নাথ এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশনে দুলে উঠতেই অর্কদীপ দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বলে উঠলো এই কথা, তারপরে তাকালো তার সদ্যবিবাহিত স্ত্রী দীপাবলির দিকে। দুজনেই একই অফিসে কাজ করে, আলাদা ডিপার্টমেন্ট, বিয়েটা তাদের আলাপের। কিন্তু দুজনেই মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য ভারী ভারী অনেক জায়গার বদলে একমত হয়েছে যে তারা পুরীতেই যাপন করবে মধুচন্দ্রিমার সাতটা দিন অফিসের গেস্ট হাউসে। ফার্স্ট ক্লাস কুপেতে দুজনে বসে গল্প করতে করতে খড়্গপুর পেরোল, তারপরে দুজনে শুয়ে পড়লো। পরেরদিন ভোরে তারা পৌঁছলো পুরী। তাদের গেস্ট হাউস স্টার্লিং রিসোর্টে বুকিং, রিসোর্টের বাস স্টেশনেই ছিল, ওদের সঙ্গে আরো কিছু রিসোর্টের বোর্ডার নিয়ে যখন চলতে আরম্ভ করল, তখন দীপাবলি উন্মুক্ত সমুদ্র আর পুরীর বিস্তীর্ণ সি বিচ দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। বাস মেরিন ড্রাইভ রোড ধরতেই ভেসে উঠলো নীল অশান্ত উচ্ছল ফেনার মুকুট পরা জলরাশি যা নিয়ত এসে বিচে আছড়ে পড়ছে বড় বড় ঢেউ নিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে সাগরের বুকে। দীপাবলি আর অর্কদীপ দুজনেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সি বীচের সেইদিকে। বাস চলতে চলতে একদম শেষের একটা বাঁক ঘুরে গেল আর সমুদ্র হারিয়ে গেল।

গ্রামের আঁকা বাঁকা রাস্তা অবিন্যস্ত কিছু পাথুরে জমি ছাড়িয়ে এসে যেখানে দাঁড়ালো সেটা খুব সুন্দর করে সাজানো স্টার্লিং রিসোর্ট, যেখানে সুন্দর বাগানে ফোয়ারা আছে, ছোট পুকুর আছে, প্রচুর গাছপালা আছে বটে কিন্তু সমুদ্র নেই, সি বিচ নেই। ওদের জন্য বুক করা কটেজে ওদের পৌঁছে দিয়ে চলে গেল কেয়ারটেকার অমল। এখানে রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা হটপ্লেটে, শান্ত নির্জন সুন্দর জায়গা কিন্তু সমুদ্রের গর্জন নেই, সমুদ্রের হাওয়া নেই, সি বিচের বালুকারাশি নেই। দীপাবলির মনখারাপ হয়ে গেল, রিসোর্টের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ভার্গবী নদী যেটা বেশ কিছুটা গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে, তার মোহনাটা বেশ একটু গেলে দেখা যায়, ওপারে ঝাউয়ের বন। অর্ককে দীপাবলি বলে ফেলল ওর আক্ষেপটা আর অর্কও বৌয়ের সঙ্গে একমত হয়ে এখানে সেখানে ফোন করে পরেরদিন সস্ত্রীক এসে উঠলো কোকো পাম বিচের ওপরে একটা হোটেলে, খরচা একটু বেশি পড়লো কিন্তু সি বিচ আর সিভিউ দুটোই আছে এখানে। সি বিচে উত্তাল তরঙ্গরাশিকে সামনে রেখে বালুকাবেলায় বসে নির্জনে নিশ্চুপে দীপাবলি আর অর্ক হারিয়ে গেল এক অনন্ত আনন্দের আবহে।দীপাবলির মনে হচ্ছে ও যেন সাগরের ওই ঢেউ যে অর্কর সান্নিধ্যে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। দীপাবলি আনন্দে জড়িয়ে ধরল অর্ককে, অর্কও ভীষণ খুশি।অনাবিল আনন্দে আর মধুর আবেশে কেটে গেল ওদের মধুচন্দ্রিমার কটা দিন।

ফিরে আসার আগের দিন জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরোনোর সময় হঠাৎ পেছন থেকে নিজের নামটা শুনে চমকে তাকিয়ে দীপাবলি দেখে সুমনা দাঁড়িয়ে আছে। ওর ক্লাসমেট সুমনা, একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে, বারো ক্লাস পর্যন্ত একসঙ্গে, দুজনে থাকতও এক পাড়াতে, তাই খুব ভাব ছিল দুজনের। মিষ্টি চেহারার সুমনাকে নিজের কোনো কথা না বলতে পারলে যেন পেটের ভাত হজম হত না ওর আর সুমনারও সব কথা ওকে বলা চাই। সেই সুমনা, নিজের জন্মস্থান খড়্গপুর ছাড়ার পরে আজকে আবার তার সঙ্গে দেখা, সুমনারও সদ্য বিয়ে হয়েছে, সুমনা এখন থাকে তালচেরে, সেখানে সরকারি চাকরি ওর আর ওর বরের।

সুমনা যখন বরকে ডেকে আলাপ করাচ্ছে, তখন সুমনার বর ভরতেন্দুকে দেখে অবাক হলেও চেষ্টা করল স্বাভাবিক থাকতে। সুমনা ওকে জড়িয়ে ধরেছিল ভীষণ আবেগে, নিজের বরকে নিয়ে সুখী সুখী মুখে যখন বরের গুণকীর্তন করছে, তখন দীপাবলিও হাসি হাসি মুখে শুনলো সেসব। অর্কদীপের কথাও একটু নিজে বলল। দীপাবলি খেয়াল করল যে ভরতেন্দু ওকে একদৃষ্টে দেখে যাচ্ছে। এর মাঝেই সুমনা ওদেরকে রাত্রে ওদের সঙ্গে ডিনার করার আমন্ত্রণ জানিয়ে বসল আর অর্কও সেটায় সম্মতি দিয়ে দিল। ঠিক হলো দীপাবলি আর অর্ক ওদের পুজোর প্রসাদ ওদের হোটেলে রেখে সোজা চলে যাবে সুমনাদের হোটেল শকুন্তলাতে।

দীপাবলির মনে পড়ছিল চারবছর আগে মা বাবা বোনের সঙ্গে যখন ও পুরীতে এসেছিল তখন একদিন সি বিচে ওর সঙ্গে যেচে আলাপ করে এই ওড়িয়া ছেলে ভরতেন্দু জাগৃতি, যে তখন কোলাঘাটের থার্মাল পাওয়ারের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করত। প্রথম দুতিনদিন দীপাবলির বাবার ব্যাংকের হলিডে হোমে আসা যাওয়া করে একদিন সরাসরি প্রপোজ করেছিল দীপাবলিকে। দীপাবলি তখন নিজের এম এ আর চাকরির প্রিপারেশন নিচ্ছিলো, ও সরাসরি না বলে দিয়েছিল স্বল্প পরিচিত ভরতকে। এরপরে সে গিয়ে ধরেছিলো দীপাবলির মাকে, মায়েরও অনিচ্ছে ছিল না, কিন্তু দীপাবলির কাছে তখন চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা ভীষণ জরুরি নিজের স্বনির্ভরতার নিরিখে। ভরত কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল দীপাবলির জন্য, কিন্তু দীপাবলির ঔদাসীন্য ওকে আর কাছে ঘেঁষতে দেয়নি।ভরত ছেলে হিসেবে ভালোই হয়তো কিন্তু ভীষণ যেন একটা আগ্রাসী মনোভাব ওর ছিল যেটা দীপাবলিকে ওর প্রতি বিমুখ করেছিল। তাই সেবারে ওরা দিন পনেরো পুরীতে থাকলেও সাতদিনের মাথায় সে একরকম ছেঁটে ফেলেছিল ভরতকে। আজকে সেই ভরতকে নিজের সবচেয়ে নিকট বন্ধুর জীবনসঙ্গী হিসেবে দেখে তাই অবাক হলেও খারাপ লাগেনি। কারণ দীপাবলি এতদিনে বুঝেছে ভরত ওর জন্য ঠিক ছিল না।

হোটেল থেকে চেঞ্জ করে ওরা গেল সুমনাদের সঙ্গে দেখা করতে আর ডিনার করতে। প্রচুর আড্ডা হলো আবার দুই বন্ধুর, সেখানে কথায় কথায় সুমনা বলেই ফেলল ভরত ভীষণ ফিজিক্যাল, ওর শারীরিক চাহিদা খুব বেশি বলে সুমনা খুব হাসতে লাগলো,ভরত লজ্জা পেলেও বলেই বসল বিয়েটা করাই তো ফিজিক্যাল হওয়ার জন্য।সুমনা এটাও বলল ভরত খুব কেয়ারিংও, ভরত তখন যোগ করল যে সুমনাও ভীষণ আগ্রেসিভ আর মুডি যেটা ভরত খুব এনজয় করে।এটা শুনে দীপাবলি আশ্বস্ত হলো, যাক দুজনেই দুজনের মনোমত হয়েছে। দীপাবলি এসব ব্যাপারে একটু চুপচাপ থাকতেই ভালোবাসে, কিন্তু সুমনা ওর প্রাণের বন্ধু বলেই ও বলল যে অর্ক ভীষণ রোমান্টিক আর কেয়ারিং, তাই ওর কাছে অর্ক ভীষণ স্পেশাল। অর্কর মুখে হাজার ওয়াটের আলো জ্বলতে দেখলো দীপাবলি।

অর্কর সঙ্গে ভালোই জমে গেল ভরতের।খেলা, রাজনীতি, পে স্কেল নিয়ে নানান আলোচনা হলো যেগুলোতে ওরা দুবন্ধুও মাঝে মাঝে যোগ দিল।খেয়েদেয়ে বেরোনোর সময় সুমনা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল যোগাযোগ রাখার। অর্ক এগিয়ে গেছে, অর্কর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সুমনাও এগিয়ে গেছে এমন সময় ভরত দীপাবলির সামনে এসে বলল যে সে যে ভরতকে আগে থেকে চেনে এবং ও যে দীপাবলিকে প্রপোজ করেছিল সেটা যেন সুমনাকে না বলে। দীপাবলি ওর স্বাভাবিক হাসি দিয়ে ওকে আশ্বাস দিল, এটা তো হতেই পারে, এর জন্য ওদের

ভবিষ্যৎ জীবনে কোনো প্রভাব পড়ে সেটা দীপাবলিও চায় না । তারপরে এগিয়ে গেল অর্কর সঙ্গে ওদের বিদায় জানিয়ে। মনে মনে ভাবলো যে অর্ককে দীপাবলি যেমন ভালোবেসে বিয়ে করেছে, সুমনাও ভরতকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছে, যে যার ভালোবাসাকে নিয়ে আনন্দে জীবন কাটাবে এটাই তো কাম্য, সেদিক থেকে একদম ঠিক আছে যার যার জীবনসঙ্গী নির্বাচন।এই পুরীর সি বিচে একদিন প্রত্যাখ্যান করেছিল দীপাবলি ভরতকে যাকে খুঁজে নিয়ে নিজের জীবনে জড়িয়েছে সুমনা আবার এই পুরীর সি বিচই দীপাবলি আর অর্কদীপকে অচ্ছেদ্য চিরবন্ধনে জড়িয়ে দিয়েছে।

॥তুলসীগাছ॥

আশির দশকের ঘটনা। সদ্য বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে দুর্গাপুরে এসেছে রেবা তার দুই ছেলেমেয়ে আর অলস নিষ্কর্মা বর কান্তিকে নিয়ে মাসি নির্মলার ভরসায় । দেশে ওদের জমিজমা আছে বটে, ওর বর কান্তি পোষ্ট অফিসে কাজ করত, সেখানে বিয়ে হয়ে ইস্তক কান্তির শাসন আর শ্বশুরবাড়ির সম্মানের খেয়াল রাখতে হত কিন্তু কান্তির অলস স্বভাব আর গাঁজার নেশার জন্য সে পিয়নের চাকরিও গেছে, আর কাকারা একরকম বার করে দিয়েছে ওকে বাড়ি থেকে ওই নেশা করার জন্য।

এবারে দেখা যাক রেবার আর কান্তির চেহারাটা কেমন....রেবার দশাসই সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা কালো চেহারা, অসম্ভব কর্মঠ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বুদ্ধিমতির পাশে কান্তি একরকম মর্কটমার্কা বললে কিছু বেশি বলা হলো না। সে চারফুট দশ হবে উচ্চতায়, পুঁইয়ে পাওয়া খয়াটে চেহারা, জট পাকানো চুল আর নোংরা আধময়লা জামাকাপড়ে একেবারে মূর্তিমান ভগ্নদূত, তায় আবার সে তোতলা, সারা হাতে পায়ে ময়লা, অতিরিক্ত নেশা করার দরুণ চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি। বেশি উত্তেজিত হলে তার কথা বেরোতে চায় না, আটকে যায় আর চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় যেন। রেবার ছেলে সোমনাথ আর মেয়ে সোমা, ছেলে সোমনাথের বাঁ চোখটা আবার ট্যারা, ছেলেমেয়ে গ্রামে থাকতে বাপের দলে ছিল কারণ তাদেরকে বাপের কাছে শাসনে থাকতে হত না, কিন্তু এখানে তারা মায়ের দলে। নির্মলা মাসি বিখ্যাত তার দুটো জিনিসের জন্য, হাতটান আর মুখ, কিন্তু রেবার উল্টো স্বভাব, সে মরে গেলেও চুরি করবে না আর চুপচাপ।

দুর্গাপুরে এসে বেনাচিতির কাছে সুকান্তনগরে জমি জবরদখল করে রেবা ঘর বানালো আর কাছেই কণিষ্ক রোডে,সি আর দাস রোডে বাড়ি বাড়ি ঠিকে কাজ নিল। কান্তি কিন্তু নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকল, রেবা চেঁচামেচি অশান্তি করলে বাড়ি থেকে বেরোতো ঝুড়ি কোদাল কাঁধে নিয়ে, যেদিন বেরোবে সেদিন হাতখরচের জন্য সে রেবার কাছ থেকে দশ টাকা করে নিত, বেরিয়ে মোড়ের দোকানে এসে চা মুড়ি বিড়ি খেয়ে একটু ঘুরে যদি বাগান পরিষ্কারের কাজ কেউ করালো তো করল বারোটা পর্যন্ত, তারপরে আর তাকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না, সে বাড়িতে গিয়ে রেবার রান্না করে রেখে যাওয়া ভাত খেয়ে আয়েস করে গাঁজায় পাকানো বিড়ি টানতে টানতে ক্লান্তি অপনোদন করবে। বাগান পরিষ্কারের কাজ কোনো জায়গায় বাকী থেকে গেলে পরেরদিন এসে আবার করবে রেবার কাছ থেকে দুটাকা নিয়ে দিনের খরচা হিসেবে আর যা রোজগার করবে নেশা করে উড়িয়ে দেবে, একটা টাকাও রেবাকে দেবে না। দুর্গাপুরের টাউনশিপে যেহেতু বেশিরভাগ কোয়াটারের সামনেই বাগান, তাই একটু চেষ্টা করলেই কান্তি পেয়ে যেতে পারে রোজ কাজ, কিন্তু সে রোজ বেরোবে না। নেশার জন্য রেবার কাছে টাকা চাইলে, আর রেবা না দিলে তাকে ধরে বেধড়ক মারবে। রেবা মার খাবে, কাঁদবে, আবার টাকা দেবে বাধ্য হয়ে,এমনভাবেই চলছিল ।সে আগেও শাসক ছিল রোজগার করত বলে, এখন রোজগার না করেও গায়ের জোরে শাসক।

রেবা দুর্গাপুরে এসে প্রথম যে বাড়িতে কাজ নিয়েছিল, সেটা চ্যাটার্জী কাকিমার বাড়িতে, সেখান থেকেই তার আরো সাতটা বাড়িতে কাজ পাওয়া এবং করা। চ্যাটার্জী কাকিমা মানুষটা খুব ভালো, রেবাকে সঙ্গে করে নিয়ে

গিয়ে ব্যাংকের বই, পোষ্ট অফিসের বই করিয়ে দিয়েছেন, সেখানে প্রতি মাসে রেবা কিছু কিছু করে টাকা রাখে, পাশবইগুলো, কিষান বিকাশপত্রের কাগজ সব থাকে কাকিমার হেফাজতে, বাড়িতে রাখলে কান্তি সব টাকা উড়িয়ে দেবে। রেবার দরকার হলে কাকিমা দিয়ে দেন ওই কাগজগুলো, পাসবই। কান্তি জানে না রেবা টাকা জমাচ্ছে তাকে লুকিয়ে।রেবাকে কাকিমা নিজের মেয়ের মতোই দেখেন আর তাই কান্তিকে দেখতে পারেন না ওই অলস নিষ্কর্মা বলে। পাড়ার প্রাইমারি স্কুলে রেবার সঙ্গে গিয়ে ভর্তি করে দিয়ে এসেছেন কাকিমা রেবার ছেলে মেয়েকে। কাকিমার বড়ো মেয়ে পড়া দেখিয়ে দেয় ওদের দুজনেরই, স্কুল থেকে ফিরে ওরা কাকিমার হেফাজতে থাকে বিকেল পর্যন্ত। রেবার ভাগের খাবারের সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকেও কাকিমা খাইয়ে দেন দুপুরে স্কুলের পরে। রেবা মাঝে মাঝে শরীর খারাপ হলে আসে না, কাকিমার একটু অসুবিধে হয় তখন, কিন্তু তবু রেবাকে ভালোবাসেন বলে আর অন্য লোকের কথা ভাবেনই না কাকিমা।

সেবারে পর পর তিনদিন রেবা এলো না, চতুর্থ দিন এলো ঠোঁট ফুলে ঢোল হয়ে আছে, চোখের নিচে কালশিটে, গায়ে জ্বর। সকালে কাকিমার বাড়িতে আসতেই কাকিমা জিজ্ঞেস করলেন, “কি হয়েছে রে রেবা তোর? এমন অবস্থা কেমন করে হল?” যেই না বলা রেবা হুহু করে কেঁদে বলল, “বরটা, কাকিমা,ওর নেশা করার টাকা দিই নি বলে মেঝেতে ফেলে মেরেছে চুলের মুঠি ধরে।” কাকিমা রেগে গিয়ে বললেন, “তুই পড়ে পড়ে মার খেলি কেন? তুই রুখে দাঁড়িয়ে দু ঘা দিলে ওর ক্ষমতা হত না তোর গায়ে হাত তোলার।” রেবা বলল, “কিন্তু কাকিমা ও তো সোয়ামী, ওকে আমি মারলে পাপ হবে না?” কাকিমা বললেন, “কিসের সোয়ামী, “ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোসাঁই”, হুঁহ সোয়ামী !!! তোকে ও খেতে দেয় না, তুই ওকে খাওয়াস, এটা মনে রাখবি সবসময়। তোকে মারতে এলে তুইও দুঘা দিয়ে দিবি এরপর থেকে, নাহলে ওকে এঁটে উঠতে পারবি না তুই পরে।” রেবা চুপচাপ শুনলো, আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরলো সব।

রেবা এর মধ্যে ওর বাড়ির ঘরের মেঝে পাকা করল, ছাদ ঠিক করল, চৌকি কিনল শোবার জন্য, তারপরে ভালো দিন দেখে গৃহপ্রবেশ করল। কাকিমা, কাকু, কাকিমার মেয়েদের, আশেপাশের লোকজনকে ডেকে নারায়ণ পুজোয় খাওয়ালো প্রসাদ বলে লুচি, আলুরদম, মিষ্টি, ফল, সিন্নি। কাকু কাকিমা কিছু টাকা দিলেন ওর হাতে, কাকিমা একটা নতুন শাড়ি দিল ওকে, ছেলেমেয়ে দুটোকে জামা প্যান্ট দিলেন।

তার কয়েকদিন পরের ঘটনা, সকালে রেবা কাজে এলো একটু দেরি করে। কাকিমার সকালের দিকে একটু তাড়া থাকে, সাড়ে সাতটায় কাকু বেরিয়ে যায়, তার জন্য চা জলখাবার বানিয়ে দেওয়া, নিজের স্নান, পুজো, মেয়েদের স্কুলের তাড়া, তাই রেবার দেরি দেখে কাকিমা একটু বিরক্ত হয়েছেন সেদিন। কাকু রেবাকে দরজা খুলে দিয়েই ঢুকে গেলেন স্নানে। কাকু স্নান করে বেরিয়ে বারান্দায় ভিজে গামছা মেলছেন, এমন সময় দরজায়, “কা--খু, কা-খি-মা” বলে দরজার বাইরে কান্তির গলা। রেবা তখন সাবান কাচছে ভেতরে। কাকিমা বেরিয়ে এলেন কান্তিকে দেখে, “হ্যাঁ, কি হয়েছে, তাড়াতাড়ি বলো।”

দেখা গেল কান্তি খুবই ক্ষুব্ধ এবং অপমানিত, সকালে রেবার কাছে টাকা চেয়েছিল, রেবা দেয়নি দেখে মারতে গেছিল। রেবা একটা ঠেলা দিতে সে মেঝেতে পড়ে গেছে, লেগেছে, তার ওপরে রেবা তখন রুটি করছিল ছেলে

মেয়েকে টিফিনে দেবে বলে চাকি বেলনা দিয়ে,সেই বেলনাটা দিয়ে তাকে কয়েক ঘা উত্তম মধ্যম দিয়ে দিয়েছে, তারপর গজগজ করেছে, “মুখপোড়া মিনসে, তোকে অনেক আগে থেকে পেটানো উচিৎ ছিল। একপয়সা রোজগার নেই ওর আর নেশার বেলায় একেবারে ঠিক আছে সব, হ্যাঁ?ওকে বিড়ি খাবার পয়সা জোগাবো আমি আমার লোকের বাড়ি কাজ করে গতর খাটানো পয়সায়। কাকিমা ঠিকই বলেছে, তোকে মেরেই তোকে সোজা করতে হবে আমায়।” বলে ছেলে মেয়ের টিফিন গুছিয়ে তাদের হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে রেবা, তাদের স্কুলে দিয়ে কাজে এসেছে।

বিয়ের দশ বছরের মধ্যে চিরকাল রেবা মার খেয়েছে আর কান্তি মার দিয়েছে, শাসক আর শাসিত। কান্তির ধারণা ছিল না রেবা কোনোদিন মার দিতে পারে ।এই প্রথম উল্টো ঘটনা ঘটেছে, মার খাওয়া শাসিতের দল থেকে মার দেওয়া শাসকের দলে রেবা নাম লিখিয়েছে আর এই দল বদলের বা ভূমিকা বদলটা হজম করতে পারেনি কান্তি। রেবার হাতে মার খাওয়ার ঘটনার অভিঘাতে হতবাক হয়ে বসে ছিল কিছুক্ষন ঘরে থুম মেরে, তারপর এসেছে কাকিমার কাছে হেস্তনেস্ত করতে, যেহেতু কান্তিরই কথায়, “কাকিমা রেবার গুরু।”

কাকিমাকে দেখেই তুতলে উঠল কান্তি, “আ-ফ-নি না-খি ব-লে-ছে-ন কা-খি-মা, মা-র-লে ফি-রে মা-র-তে আ-ম্মা-কে ? আ-মি না ও-র সো-য়া-মী, তু- তু- তু-ল-সী গা-ছে-র জা-আ- ত!!! আ-মা-কে মা-র-লে ও-র ধ-ম্মে স-ই-বে, ব-লু-ন আ-ফ-নি ?” (আপনি নাকি বলেছেন কাকিমা মারলে ফিরে মারতে আমাকে? আমি না ওর সোয়ামী, তুলসীগাছের জাত!!! আমাকে মারলে ওর ধম্মে সইবে, বলুন আপনি?) কাকিমা নির্বিকার মুখে জবাব দিলেন, “তুলসীগাছ নাকি...তা হবে হয়তো...তবে ছাগলে মুড়িয়ে খাওয়া তুলসীগাছ, যা কোনো পুজোয় কাজে লাগে না। বৌ বাচ্ছাদের খাওয়াতে পরাতে পারোনা, দায়িত্ব নেবে না, এদিকে ষোলো আনার ওপরে আঠারো আনা সোয়ামীগিরি ফলাতে লজ্জা করে না তোমার? বেশ করেছে দিয়েছে দু ঘা, বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি পুলিশে দেব তোমায় মনে রেখো।”

রাগে কিছুক্ষন গরগর করে বেঁটে কান্তি দুটো লাফ দিয়েছিল, “হ্যাহ সে ছাগলে মোড়ানো তুলসীগাছ”, এত “অকোমান”.... দেখাবে সে এবারে রেবাকে, বাড়িতে তো ফিরতে হবে রেবাকে, বড্ড বাড় হয়েছে!!! কিন্তু তারপর যেই কাকিমা “পুলিশে দেব” বলল, পুলিশের নামে কাকিমার পায়ে পড়ে গেল একদম । না না, আর সে কখনো রেবার গায়ে হাত তুলবে না, তুতলে তুতলে “পোতিগ্যেই” করে বসল আর কথা দিল বরং সে বৌয়ের কথা শুনে চলবে, যদি তাতে তাকে পুলিশের হাতে না পড়তে হয়। হাতজোড় করে তুতলে উঠে বলল, “আ-র এ-ম-নি ক-র-ব না কা-খি-মা...কা-জ ক-র-বো , হ্যাঁ, হ্যাঁ, রো-জ কা-জে যা-বো, টা-কা ও-কে এ-নে দে-ব।” (আর এমনি করব না কাখিমা...কাজ করব, হ্যাঁ,হ্যাঁ, রোজ কাজে যাবো, টাকাও ওকে এনে দেব)। ওর অবস্থা দেখে কাকিমা বহু কষ্টে হাসি চাপছেন তখন। সুযোগ বুঝে কাকু ফুট কাটলেন, “সেটাই কর বুঝলি,বৌ গুরুজন, পুলিশেরও ওপরে, মেনে চলতে হয় তাকে।” কাকু মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কান্তি নির্বাক হয়ে কিছুক্ষন, বিড়বিড় করল ওই কথাগুলো আপন মনে, “বৌ গুরুজন, পুলিশেরও ওপরে”... তারপরে কি মনে করে মাথা নামিয়ে বেরিয়ে গেল। কাকিমা চোখ পাকিয়ে কাকুর দিকে তাকালেন আর রেবা ফিকফিক করে হাসছে তখন ঘরের ভেতরে।

বছর কুড়ি পরে.... সেদিন চ্যাটার্জী কাকিমার নাতি সৌপর্নর উপনয়নের অপৈতকভাত, এরমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে জীবনে সবার। কাকিমার দুই মেয়েই ভালো চাকরি করছে, ভালো বিয়ে হয়েছে, রেবার ছেলে সোমনাথ কেবল (cable) অপারেটিং আর ব্রডব্যাণ্ডে দোকান দিয়েছে, রেবার বাড়ি দোতলা হয়েছে, কান্তি মাঝে মাঝে বসে কেবলের (cable) দোকানে, সে এখন রীতিমতো কান্তিবাবু। রেবা আর এখন কোথাও কাজ করেনা, বাড়ির সামনে শাড়ির দোকান করেছে। কান্তি এতদিনে বুঝেছে সর্বত্র দুটো শ্রেণী বিরাজ করে, শাসিত আর শাসক, কান্তি সেদিনে রেবার হাতে উত্তম মধ্যম খাওয়ার আগে ছিল শাসক, মার খাওয়ার পরে এখন সে শাসিত, পুলিশকে আজও যে সে ভীষণ ভয় পায়। রেবার সঙ্গে আজও কাকিমার খুব ভালো সম্পর্ক।

রেবার মেয়ে সোমার বিয়ে হয়েছে ক্যাটারিং করে, নিজেদের ছোট রেস্টুরেন্ট আছে সেই 'রঞ্জিত ক্যাফে'র রঞ্জিতের ছেলে রণিতের সাথে, তাদের একটা ছেলে। অপৈতকভাত উপলক্ষে সবাই এসেছে আজকে কাকিমার বাড়িতে। সেখানেই রেবার জামাই রণিতের সঙ্গে সোমার একটু মনোমালিন্য হয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছে।কান্তির মেয়ে বড়ো প্রিয়, মেয়েকে সে চোখে হারায়, কান্তির কানে যেতেই সে এগিয়ে গেল মেয়ে জামাইয়ের মাঝখানে, তারপরে বলল, “খি ব্যা-পা-র, র-ণি-ত এ-তো গ-র-ম দে-খা-চ্ছ সো-মা-কে যে ব-ড়ো... ভু-লে গে-ছো বৌ কে হ-য় তো-মা-র.... বৌ তো-মা-র গু-রু-জ-ন, পু-লি-শে-রও ও-প-রে, বু-ঝে-ছো।” (খি ব্যাপার রণিত এতো গরম দেখাচ্ছ সোমাকে যে বড়ো...ভুলে গেছো বৌ কে হয় তোমার...বৌ তোমার গুরুজন, পুলিশেরও ওপরে, বুঝেছো) শ্বশুরের এহেন নীতিজ্ঞানে রণিত ভেবলে গেল খানিকটা, চুপ করে গেল আর রেবা, কাকু, কাকিমা, কাকিমার দুই মেয়ে সবাই সমস্বরে হেসে উঠল শুনে সেদিনের কাকুর দেওয়া শিক্ষা কান্তি আজও মনে রেখেছে আর নিজের জামাইকে সেই শিক্ষা দিচ্ছে।

॥স্মৃতি বিস্মৃতির দোলাচলে॥

ছোটছেলে মানুটার মাথার চুল দেওয়ার মানসিক ছিল জগন্নাথ বাবুর কাশীতে, সেই উপলক্ষে এবারে তিনি সপরিবারে কাশীতে এসেছেন মানসিক শোধ করতে, উঠেছেন ভোলাগিরি ধর্মশালায়। চিত্তরঞ্জনের বাসিন্দা জগন্নাথবাবুর এটি তৃতীয় সন্তান, বড়ো জগমোহন বা জগু,মেজ ছিল মনমোহন বা মনো আর এই ছোটটি মানসমোহন বা মানু। বড়ো ছেলে জগু এখন পনেরো বছরের, মেজ মনো থাকলে হত দশ আর এই ছোট মানু পাঁচ বছরের।

জগুর যখন আট আর মনোর তিন তখন জগন্নাথ গেছিলেন হরিদ্বারে সপরিবারে বৃদ্ধা মাকে নিয়ে কুম্ভস্নানে । জগু আর মনো দুজনেই বিভাদেবীকে “ঠাম” বলে আর সুদীপ্তাকে মা। জগুর তত্ত্বাবধানে মনোকে রেখে বৃদ্ধা মাকে কুম্ভমেলায় মহযোগের শাহী স্নান করাতে নেমেছিলেন জগন্নাথ আর সুদীপ্তা। স্নান সেরে “হর কি পৌড়ি” ঘাটেতে ফিরে দেখেন জগু একা বসে আছে, মনো নেই। বহু খুঁজেও পেলেন না তাঁরা মনোকে, খালিগায়ে একখানি ইজের পড়ানো ছিল মনোর, সদ্য দুই ছেলেকে স্নান করিয়ে বসিয়ে রেখে দিয়ে গেছিলেন নিজেরা স্নানে যাবার আগে। মনোর পাঁজরের ওপরে একটা জরুল আর পিঠের কোমরের ওপরে একটা নীলচে আঁচিল ছিল তার জন্মাবধি জন্মদাগ। সুদীপ্তা পাগলের মত দুমাস ধরে খুঁজেছিল হরিদ্বারের ঘাটে ঘাটে মনোকে কিন্তু মনোকে পাওয়া যায়নি। সেদিন ঠেলাঠেলিতে কিছু লোকজন গঙ্গায় ডুবেও মারা গেছিল, জগন্নাথ ধরে নিয়েছেন মনো তাদের সঙ্গেই অনবধানে ডুবে গেছে গঙ্গায় যদিও তার লাশ মেলেনি।

তার কয়েকবছর পরে মানুর জন্ম, জগন্নাথের মা বিভাদেবীর ধারণা মনোই আবার এসেছে। মানুর চুল তাই মানসিক করা ছিল বাবা বিশ্বনাথের দরবারে। কাশীতে এসে সংকটমোচন হনুমানজীর দর্শন করলেন তাঁরা। পরেরদিন সেই চুল দিয়ে মানসিক শোধ করে বিভাদেবী আর দুই ছেলেকে ধর্মশালায় রেখে এলেন জগন্নাথ, তারপরে আবার গেলেন মা অন্নপূর্ণা দর্শনে। মা অন্নপূর্ণা দর্শন করে ফেরার সময় ধর্মশালায় ফিরে হঠাৎ দেখেন একটা হনুমানের হাতে তাঁর মানু যার হাতে ধরা দুটো মর্তমান কলা আর একটি বছর দশেকের সাদা ধুতি পরা ছেলে ছুটছে সেই হনুমানের পেছনে ধর্মশালার বারান্দা বরাবর আর ছেলেটি মানুকে ইশারায় বলছে হাতে ধরা কলাটা ফেলে দিতে আর মানু প্রবল আতঙ্কে কান্না জুড়ে দিয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন জগন্নাথ আর সুদীপ্তা নীচের উঠোনে রুদ্ধশ্বাসে ।হঠাৎ সেই ছেলেটি কোথা থেকে একছড়া কলা এনে হনুমানটার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলো। হনুমানটা মানুকে নামিয়ে দিল রেলিঙ্গের ওপরে একেবারে কার্নিশ ঘেঁষে, দিয়ে লাফ দিল ওই ছেলেটার হাতে ধরা কলার ছড়াটার জন্য। মুহূর্তে ছেলেটা লাফ দিয়ে প্রায় নিজে পড়ে যেতে যেতে ধরল গিয়ে মানুকে নিজের শরীরে চেপে আর কলার ছড়াটা হনুমানটাকে দিয়ে দিল। ততক্ষনে গোটা ধর্মশালার লোক জড়ো হয়ে গেছে রুদ্ধশ্বাসে কি হয় দেখতে ধর্মশালার উঠোনে। মানুকে কোলে নিয়ে সেই ছেলে ছুটল জগন্নাথদের দোতলার ঘরের দিকে।

জগন্নাথ আর সুদীপ্তাও গিয়ে উপস্থিত হলেন ঘরে, মানুকে ফিরে পেয়ে বিভাদেবী আর জগুও কাঁদছে। এমনিতেই মনোর ওই হারিয়ে যাওয়া নিয়ে জগুর মনে একটা দুঃখ আছে যে ওর জিম্মার থেকেই ভাই হারিয়ে গেছে, তাই এবারে মানুকে ফিরে পেয়ে সে কি করবে বুঝতে পারছে না।

হৈচৈ শুনে ভোলাগিরি আশ্রমের সুনীল মহারাজও এসে উপস্থিত হয়েছেন। হঠাৎ সুদীপ্তার চোখ পড়লো ওই সাদা কাপড় পরা খালি গায়ে দাঁড়ানো ছেলেটার দিকে, তার পাঁজরের নিচে একটা জরুল আর মুখটা অবিকল মনোর মত, যদিও এই কয়েক বছরে বেশ একটু পাল্টেছে। কৃতজ্ঞতায় ওকে বুকের মধ্যে টেনে নেওয়ার সময় সুদীপ্তার নজর পড়লো ওর পিঠের কোমরের দিকে। ভালো করে দেখতে গিয়ে দেখলেন সেই নীলচে আঁচিল।

সুনীল মহারাজকে সুদীপ্তা জিজ্ঞেস করলেন ওই ছেলেটি সম্পর্কে, বলতে ভুললেন না যে তাঁদের মেজপুত্র মনোমোহন না মনো হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় কিভাবে হারিয়ে গেছে। অফিসঘরে বসে ক্রমে সুনীল মহারাজের কাছে জানতে পারলেন ওর নাম মনু। ওকে ভোলাগিরি আশ্রমের তৃষান মহারাজ হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় হরিদ্বারেরই ভোলাগিরি ধর্মশালার চত্বরে অচেতন অবস্থায় পান, তুলে এনে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুললেও আসল নাম, বাড়ি কিছুই বলতে পারেনি। সেই থেকে মনু এখানেই আছে, শাস্ত্রচর্চা, শরীরচর্চা করে, অসম্ভব কর্মঠ, ভোলাগিরি ধর্মশালা তো বটেই ভোলাগিরি আশ্রমের সন্ন্যাসীদের সে বড়ো প্রিয়পাত্র, ভীষণ নিঃস্বার্থ আর পরোপকারী ছেলে । মনুকে ডেকে নিয়ে জগন্নাথদের ঘরে গেলেন সুনীল মহারাজ ।এবারে মনুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সুদীপ্তা বলল, “দেখো তো বাবা, আমাদের কাউকে তোমার চেনা লাগে কিনা।” ছেলেটি কিছুক্ষন অবাক হয়ে সুনীল মহারাজের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল, পরে তাকিয়ে থেকে শেষে বিভাদেবীর কাছে গিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে “ঠাম” বলল, তারপরে সুদীপ্তাকে “মা” ডাকল। তবু আরো নিশ্চিত হবার জন্য এরপরে সুনীল মহারাজ আর তৃষাণ মহারাজ এলেন ওদের চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে, সেখানে মনোর ছোটবেলার ছবি দেখে আর ডিএনএ টেস্ট করিয়ে জগন্নাথ আর সুদীপ্তার সঙ্গে নিশ্চিত হলেন যে মনু আসলে মনোমোহন, যে তিন বছর বয়সে মনু আর মনোকে একই ভেবে সাড়া দিয়ে গেছে আশ্রমে।

কিন্তু সে এক অদ্ভুত জেদ ধরল জগন্নাথ আর সুদীপ্তার কাছে, সে তার পড়াশোনাটা ভোলাগিরি আশ্রমে থেকেই করতে চায়, আসলে সে ওই সাত্ত্বিক ত্যাগের ব্রহ্মচর্যের আশ্রম জীবনটা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিল না, ওখানকার মহারাজদের সঙ্গে এই কয়েকবছরে তার গড়ে উঠেছে আত্মিক যোগ। জগন্নাথ মহারাজদের সঙ্গে কথা বলে ওকে ভর্তি করে দিলেন ভোলাগিরি আশ্রমের স্কুলে দেওঘরে, ও ওখানে ভীষনই ভালো থাকত, এতটাই ভালো যে ছুটিছাটাতেও বাড়িতে আসতে চাইত না খুব প্রয়োজন না পড়লে। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতেন মা বাবা, তবু তো তাঁরা জানতে পারছেন সে আছে কাছেপিঠেই। আশ্রমে থেকে পড়াশোনা শেষে সে ঝাড়খন্ডের ইলেকট্রিক সাপ্লাই বোর্ডে ভালো চাকরি পেল, বিয়ে দিলেন তার জগন্নাথ আর সুদীপ্তা। সংসারী হল বটে মনো ঠিকই কিন্তু গোদা বৈষয়িক ব্যাপার তার ভালো লাগে না, সাংসারিক কূটকচালি অপছন্দ তার। ভীষণ চুপচাপ, অন্তর্মুখী স্বভাব তার। আস্তে আস্তে বিভাদেবী আর জগন্নাথ মারা গেলেন, পঁচাত্তোরের সুদীপ্তা থাকেন এখন ঘাটশিলায় মনো আর তার পরিবারের সঙ্গে।

বেশ কিছু বছর পরের ঘটনা.....মনোমোহন এবার প্রয়াগে কুম্ভমেলায় সপরিবারে স্নানে এসেছেন। মনোমোহনের এখন বছর পঞ্চাশেক বয়স, একটু অসুস্থই ছিলেন তিনি, সঙ্গে স্ত্রী সুপর্ণা আছেন, জননী সুদীপ্তা আছেন, যুবক পুত্র অর্পণ আছে। এবারে প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ স্নান, অস্বাভাবিক ভীড় হয়েছে, ভীষণ কোলাহল। ঠিক স্নান সেরে ফেরবার সময়ে হঠাৎ দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মিছিল শুরু হল ঘোড়া, হাতি, শিঙ্গা, নাকাড়া, ঝাঁঝর, খোল, করতাল বাজিয়ে সারি দিয়ে এবং সাধারণ পুণ্যার্থীদের মধ্যে প্রচন্ড হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ওই সন্ন্যাসীদের মিছিল থেকে দূরে সরে যাবার জন্য। এঁদের মিছিল বহুক্ষণ ধরে চলে আর তখন সাধারণের যাতায়াত বন্ধ থাকে।

মনোমোহন তাঁর পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন ভীড়ের একটা দিকে আর পরিবার রয়ে গেল আরেকদিকে। মনোমোহন ভীড়ের ধাক্কায় উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন এবং তাঁর ওপর দিয়ে লোক দৌড়োতে থাকল তাঁকে পদপিষ্ঠ করে দিয়ে। মনোমোহন একে অসুস্থ ছিলেন, তারওপর এই ভীড়ের চাপ এবং অসংখ্য মানুষের পায়ের তলায় পিষ্ট হবার যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রইলেন ঘন্টা দুয়েক। এদিকে পরিবারের লোকজন তাঁকে খুঁজতে থাকে, ভীড় কমলে আর সন্ন্যাসীদের মিছিল চলে গেলে প্রথমে তাঁর স্ত্রী সুপর্ণা ও পরে পুত্র অর্পণ দেখল তিনি ঐভাবে বাহ্যজ্ঞানরহিত অবস্থায় সংজ্ঞাহীন উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। তৎক্ষণাৎ সেখানকার স্বেচ্ছাসেবীদের সাহায্যে তাঁকে ধরাধরি করে তুলে তাঁর পরিবার তাঁদের তাঁবুতে নিয়ে এলো।

মনোমোহনের জ্ঞান ফেরার পরে একটু সুস্থ হলে তিনি বেশ কিছুক্ষন ধরে সংস্কৃতশ্লোক বলতে থাকলেন। যেমন.....

“যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদা আত্মনম্ সৃজামি অহম্ ।।৭”

অর্থ-হে ভরত যখনই ধর্মের অধঃপতন হয়এবং অধর্মের অভূত্থান হয় তখনই আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতির্ন হই।

“পরিত্রানায় সাধুনাম বিনাশায়ঃ চ দুস্কৃতম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে॥৮

অর্থ-সধুদের পরিত্রান করার জন্য এবং দুস্কৃত কারিদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতির্ন হই।”

একটু ধাতস্থ হবার পরে তাঁর স্ত্রী জানতে চাইলেন তিনি হঠাৎ সংস্কৃত শ্লোক বলছেন কেন? সুপর্ণা যারপরনাই আশ্চর্য হয়েছেন কারণ মনোমোহন যে আদৌ সংস্কৃত জানেন তা তাঁর স্ত্রীর অজ্ঞাত। এমনিতেই মনোমোহন ভীষণ আপনভোলা, অন্তর্মুখী, মিতবাক মানুষ, সে এমন শ্লোক বলছে হঠাৎ!!!! আশ্চর্য সুপর্ণা তাই ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে মনোমোহনকেই জিজ্ঞেস করলেন, তখন মনোমোহন বললেন যে ছোটবেলায় পাঁচ বছর বয়স থেকে তিনি টানা আট বছর প্রত্যেকদিন সংস্কৃত পন্ডিতমশাইয়ের কাছে গীতাপাঠ করতেন ভোলাগিরি আশ্রমের স্কুলে পড়বার সময়

এবং পরেরদিন সেটার পড়া দিতে হতো পন্ডিতমশাইকে। ফলে গীতা তাঁর মননে, ধ্যানে, চেতনে গেঁথে গিয়েছিল।বলে আবার বলতে লাগলেন এই শ্লোকগুলো :

"ব্রহ্ম অর্পনম্ ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্ম অগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্ম এব তেন গন্তব্যম্ ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা ।।২৪"

অর্থ-যিনি কৃষ্ণ ভাবনায় সম্পুর্ন মগ্ন তিনি অবশ্যই চিৎজগতে উন্নিত হবেন,কারন তার সমস্ত কার্য কলাপ চিন্ময়।তার কর্মের উদ্দেশ্য চিন্ময় এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি যা নিবেদন করেন তাও চিন্ময়।

"শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযত ইন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানম্ লব্ধা পরাম্ শান্তিম্ অচিরেন অধিগচ্ছতি॥৩৯"

অর্থ-সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হয়ে চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এইজ্ঞান লাভ করেন,সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরাশান্তি লাভ হন।

কিন্তু তারপরে বহুদিন তাঁর নানাবিধ কারণে গীতাপাঠে ছেদ পড়ে যায়, তিনি পড়াশোনা শেষ করে প্রথমে চাকরিজীবনে ও পরে সংসারজীবনে প্রবেশ করেন।

যখন ঐ ভীড়ের চাপে তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছিলেন, তখন তিনি দেখেছেন তিনি একটি নদীর বালুকাময় তটে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর বেশ কিছু গাছের পাতা উড়ে উড়ে তাঁর চারিদিকে যেন ঘুরছে। তিনি আস্তে আস্তে একটি দুটি পাতা হাত দিয়ে ধরতে থাকেন, ধরে দেখেন সেগুলির প্রতিটিতেই ওপরে উক্ত একটি করে গীতার শ্লোক লেখা রয়েছে, সেগুলি তিনি একটি করে ধরতে থাকেন আর বলতে থাকেন, বেশ কিছুক্ষন এইভাবে করার পরে তিনি অনুভব করেন তাঁর জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং তিনি পরিবারের মধ্যে আবার ফিরে এসেছেন। সেইদিন থেকে মনোমোহন আবার গীতাপাঠ শুরু করলেন । একদা নিয়মিত পঠিত পাঠ্য যা বহুদিন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল তা যে এইভাবে মননে, ধ্যানে, চেতনে গেঁথে গিয়ে তাঁকে জীবনমৃত্যুর মাঝে দাঁড় করিয়ে আবার জীবনের মোক্ষপ্রাপ্তির সন্ধান দিয়ে দিশা দেখাবে সেটা তিনিও ভাবেন নি।তাই গীতার অষ্টাদশ পর্বের ৬৬ নম্বর শ্লোকে বলেছে-

"সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"
অহম ত্বাংং সর্ব পাপেভ্য মোক্ষামি স্বামী মা শূচঃ॥"

যাতে ভগবান অর্জুনকে বলছেন ,

অর্থ- "হে পার্থ , সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাপন্ন হও।আমি সকল প্রকার পাপ হতে তোমায় রক্ষা করব , তুমি শোক করো না।"

সকল জীবকে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এটাই মুক্তির পথ। মোক্ষ যোগের অন্তিম চরণ।

শ্রীভগবানের এই কৃপা ধরে রেখে জীবনের চলার পথে বাকী জীবনটা তিনি কাটিয়ে দেবেন ঠিক করলেন এবং সেই কৃপার পরশে তাঁর বিস্মৃতি মুছে গিয়ে স্মৃতির দরজা উন্মুক্ত হল। শুধু মনোমোহনের জীবন থেকে হারিয়ে গেল তাঁর আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে কাটানো সাত্ত্বিক ত্যাগের জীবনটা যা তাঁর বোধকে এক অনন্য প্রজ্ঞায় উন্মোচিত করেছে, তাঁকে করেছে সংসারবিমুখ কিন্তু সংসার জীবনের সঙ্গে পুনঃসংযোগের জন্য সে বেরিয়ে যেতে পারেনি ঘর ছেড়ে সেবার ব্রত নিয়ে, মনে আক্ষেপ আছে তাঁর মানুষের মাঝে নেমে মানুষের জন্য কাজ করার সেই উদ্দেশ্য হারিয়ে গেল সংসারে ঢুকে.... তবু সংসার আশ্রমকে ভরসা করেই বাকী তিন আশ্রম, ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস দাঁড়িয়ে আছে এটুকুই তাঁর সান্ত্বনা মনে হয়, যদিও এখনকার সমাজজীবনে এগুলোর দাম নেই, আগ্রাসী সংসারী হওয়াটাই উপজীব্য এখন, শান্তির গৃহস্থ জীবন নয়, বৈভবের দিকেই সবাই ছুটছে যেটা তাঁকে আরো বিমুখ করে ।জীবনের এই সন্ধিক্ষনে দাঁড়িয়ে মনে হয় মা যদি সেদিন কাশীতে তাঁকে চিনতে না পারতো তাঁর হারিয়ে যাওয়াটা একটা সার্থক জীবন হত হয়তো!!!

“ওগো আমার প্রিয়”

অবশেষে হাওড়া থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস ছাড়ার পরে বিরস মুখে মায়ের সামনের বার্থটার জানলার ধারে এসে বসল অভিজিৎ অন্তরাকে ‘বাই’ করে ডিসেম্বরের এক সকালে। নিজের চেনা শহর, পাড়া, চেনা পরিমণ্ডল, পরিবেশ,বন্ধুদের ছেড়ে চলল অভিজিৎ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ডাকে। নাঃ... শেষ পর্যন্ত এলো না তৃষিতা!!! খুবই আশা করেছিল অভিজিৎ শেষ মুহূর্তে হয়তো তৃষিতা আসবে... তার মানে ভালোবাসা, আবেগ সবই ওর একতরফা ছিল? নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিল ওর মানুষকে ভুল চেনার জন্য, আজও ও সত্যিই মানুষ চেনে না, আবেগ নিয়েই চলে। মা সুনন্দা একদৃষ্টে ছেলেকে লক্ষ্য করছিলেন এতক্ষন, এবারে বাইরে মন দিলেন। এসি টু টায়ার কোচে দিল্লি চলেছে মা সুনন্দা, বাবা অজিতেশ আর ছেলে অভিজিৎ।

অভিজিতদের নিজেদের সোনার বড়ো দোকান আছে নিউ আলিপুরে বাড়ির লাগোয়া। অজিতেশ দেখেন সেটা, বেশ সচ্ছল পরিবার তাদের, কিন্তু সুনন্দা আর অজিতেশ দুজনেই স্বনির্ভরতায় বিশ্বাসী, তাই ছেলেকে তার মনের মত বাড়তে দিয়েছেন। অভিজিৎ বাবা মায়ের একটু বেশী বয়সের একমাত্র সন্তান, তাই সে যেমন তার মা বাবার চোখের মণি, তেমনি অভিজিতেরও মা অন্তপ্রাণ। সুনন্দা এমনিতে খুবই কর্মঠ আর মিশুকে স্বভাবের মানুষ বটে, কিন্তু তাঁকে কাবু করে দিয়েছে ব্লাডসুগার। একে তো তাঁর সত্তরের কাছে বয়স, তায় এই সুগার আর তার সঙ্গে তাঁর অসম্ভব মিষ্টিপ্রীতি। তাই মাঝে মাঝেই তিনি অসুস্থ হন আর অসুস্থ হলে বহুদিন ধরে তাঁর ভোগান্তি চলে। একবার তো চোখ তাঁর প্রায় চলেই গেছিল, বহুদিন নিয়ম মেনে চলে অবশেষে একটু ভালো আছেন। অভিজিৎ কমার্স নিয়ে পড়ে এম বি এ করে একটা ভালো জায়গায় চাকরি করছে কয়েক বছর। সেখানেই তার আলাপ তৃষিতার সঙ্গে যেটা আস্তে আস্তে প্রণয়ে রূপ নিয়েছিল।

সুনন্দার খুব উৎসাহ এইসব ব্যাপারে, তিনি ছেলের মা তো নিশ্চয়ই, কিন্তু ছেলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও বটে। অভিজিতেরও তাই মাকে সারাদিনের সব কথা না বললে পেটের ভাত হজম হয় না। তাই অভিজিতের বন্ধুদের কাছেও সুনন্দার খুবই গ্রহণযোগ্যতা, তারাও আন্টি বলতে অজ্ঞান, সুনন্দা খুবই আধুনিকমনস্কা, যুক্তিবাদী, নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মহিলা। সেই জন্যই তৃষিতার ব্যাপারে জানতে পেরে তৃষিতাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে রান্না করেছিলেন তৃষিতার পছন্দের পদ।

কিন্তু তৃষিতা অভিজিতের এহেন মাতৃভক্তি দেখে প্রথমে সুনন্দার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলল না, তাঁর নানান খুঁত ধরতে লাগলো। এতো বয়স্ক একজন মানুষ তাদের দুজনের মাঝখানে থাকবে, তার হবু বর তাঁর কথার গুরুত্ব দেবে এতো-এই ব্যাপারটা মেনে নিতে তার প্রবল আপত্তি। তার সাফ কথা, “হয় আমাকে নিয়ে থাকো, নয় মাকে।” অভিজিৎ তৃষিতাকে ভালোবাসলেও অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে ছাড়ার কথা ভাবতেই পারে না। তাই নিয়ে দুজনের মনোমালিন্য চলছিল, অভিজিৎ অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিল তৃষিতাকে, কিন্তু সে কোনো ভাবেই সুনন্দাকে মেনে নিয়ে সম্পর্ক এগোতে রাজী নয়। এমন সময় কোম্পানি অভিজিৎকে তাঁদের ব্যবসা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দিল্লীতে বদলি করল।

অভিজিৎ যাবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করতে দেখা করেছিল তৃষিতার সঙ্গে, তার আগে সুনন্দা অনেক বুঝিয়েছিল অভিজিতকে যে সত্যিই তো আসলে তো জীবনটা তাদের দুজনের, সেখানে মাতো তৃতীয় ব্যক্তি, কিন্তু অভিজিৎ মাকে বাদ দিয়ে নিজের জীবন ভাবতেই পারেনা, বিশেষত যখন সে একমাত্র সন্তান মা বাপের। শেষে অভিজিৎ রেগে গিয়ে তৃষিতার সঙ্গে দেখা করে বলেই এসেছে যে তার জীবনে আসতে গেলে তৃষিতাকে, মা সুনন্দাকে সঙ্গে ধরেই আসতে হবে, নচেৎ দরকার নেই ভবিষ্যতের সম্পর্কে এগোনোর। তৃষিতা আর কোনো উত্তর দেয় নি, চলে গেছে। আজকে কলকাতা ছাড়ার সময় অভিজিৎ ভেবেছিল তৃষিতা হয়তো আসবে স্টেশনে দেখা করতে কারণ আজকে যে অভিজিৎ চলে যাচ্ছে সেটা তৃষিতা জানে যেহেতু তাদের একই অফিস। কিন্তু ট্রেন চলতে আরম্ভ করল, অন্তরা হাত নেড়ে চলে গেল আর তৃষিতাও এলো না দেখে ভীষণ হতাশ হয়ে এসে বসল নিজের সিটে অভিজিৎ। সুনন্দা আর অজিতেশ দুজনেই দেখলেন সেটা। আসলে দিল্লীতে গিয়ে সুনন্দা অভিজিতের থাকার ব্যবস্থা করে ওকে সেটল করে দিয়ে অজিতেশ চলে আসবেন, সুনন্দা থাকবেন অভিজিতের সঙ্গে কিছুদিন। অভিজিতের আরেক বন্ধু অন্তরার সঙ্গে অভিজিৎ আর সুনন্দার খুব ভালো সম্পর্ক, অন্তরাকে সুনন্দা খুব ভালোবাসেন ওর স্বচ্ছ মন আর উদার স্বভাবের জন্য আর অভিজিতেরও খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু অন্তরা, অন্তরা তাই এই পুরো ঘটনাটাই জানে, সেও কিন্তু অভিজিতের পক্ষে। তৃষিতা থাকে অন্তরার পাড়ায়, অন্তরার থেকে তৃষিতা বছর খানেকের বড়ো কিন্তু এক পাড়ার বাসিন্দা বলে পাড়ার বন্ধু ।কিন্তু তৃষিতা জানে না অন্তরা অভিজিতের বন্ধু যদিও অন্তরা অভিজিতের চেয়ে তিন বছরের জুনিয়র কিন্তু একই স্কুল ছিল ওদের আর দুজনেই নানান স্কুল ইভেন্টে পার্টিসিপেট করত বলে খুবই বন্ধু ওরা, তাছাড়া ওরা একই টিউশনে পড়েছে কয়েক বছর।

অন্তরা গেছিল অভিজিতদের সবাইকে ট্রেনে সি অফ করতে, আবার কবে দেখা হবে আন্টি আর অভিজিতের সঙ্গে সেটা ভেবে। রাজধানী এক্সপ্রেস ছেড়ে যেতে ও বাড়ি ফেরার জন্য হাঁটছে যখন তখন ওর চোখে পড়লো তৃষিতাকে, চোখের জল মুছতে মুছতে ও বেরোচ্ছে, মুখটা ভীষণ শুকনো। অন্তরা বুঝলো অভিজিৎকে দেখতেই এসেছিল তৃষিতা কিন্তু জেদের বশবর্তী হয়ে সামনে যায়নি আর এতক্ষনে পরিষ্কার হল অন্তরার কাছে বারবার স্টেশনে কাকে খুঁজে চলেছিল অভিজিতের দুচোখ। অন্তরা গিয়ে তৃষিতার হাতটা ধরতে চমকে উঠল প্রথমে তৃষিতা, তারপরে জিজ্ঞেস করল এখানে কেন এখন অন্তরা। অন্তরা স্বাভাবিক ভাবেই বলল বন্ধুকে সি অফ করার কথা আর ওকে জিজ্ঞেস করল ওকে এত আপসেট লাগছে কেন, বলতেই তৃষিতা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল অভিজিতের কথা বলতে বলতে। এবারে অন্তরা জিজ্ঞেস করল যে তৃষিতা যদি ভালোই বাসে অভিজিৎকে তো সমস্যাটা কোথায় ।ট্যাক্সিতে ফিরতে ফিরতে দুজনে তৃষিতা অভিজিতের মায়ের কথা বলতে অন্তরা শুনলো আর আন্টির সম্পর্কে ওর ধারণাটাও বলল। এটাও বলল আন্টি খুবই সহমর্মী, আধুনিকমনস্ক ও আন্তরিক মানুষ যিনি আক্ষরিক অর্থে অভিজিতকে মরাল সাপোর্ট দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন।তাছাড়া আন্টি যে এখনো তৃষিতার হয়েই অভিজিতকে বুঝিয়ে চলেছেন সেটা বলল অন্তরা ।অন্তরা যে অভিজিতের ছোটবেলার বন্ধু সেটা তৃষিতা জানতো না।

কাল থেকে তিনদিন ছুটি অফিসে, আজকে তাই কাজের খুব প্রেসার অফিসে অভিজিতের, একে ফিনান্সিয়াল ইয়ার এন্ডিং, তায় এই সময় হোলির জন্য ছুটি থাকবে অফিস, তাই আজকে অভিজিতের বেরোতে বেশ রাত হল। অবশ্য চিন্তা নেই, ও যেখানে বাড়ি নিয়েছে সেটা অফিস থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। পুরোনো দিল্লীর এই দিকে

বাড়ি ভাড়াটা একটু কম, বাড়িটা একদম বাজারের মধ্যে এটাই যা অসুবিধে, তাছাড়া কোনো সমস্যা নেই, সবই নাগালের মধ্যে । তাই সাড়ে দশটায় বেরিয়ে কিছু স্নাক্স কিনল বাড়ির জন্য অভিজিৎ। কালকে দোল, মা পুজো করবে, তাছাড়া প্রতিবেশীরাও ভেট পাঠাবে, তাই কিছু কাজু বরফি, লাড্ডু আর শোনপাঁপড়ি কিনল। এসব কিনতে কিনতে মনে পড়লো অভিজিতের তৃষিতা কাজু বরফি আর শোনপাঁপড়ি খুব পছন্দ করে। ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো ওর, এসব এখন অতীত।

সেসব নিয়ে ফুল কিনে বাড়ি এসে বেল দিতে যে দরজা খুললো তাকে দেখে ওর হাতের জিনিস সমেত অভিজিৎ পড়েই যাচ্ছিলো। দরজা খুললো এসে অন্তরা। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে অন্তরাকে দেখে নিজের আনন্দ আর চেপে রাখতে পারলো না, ওকে ধরে একটা লাফ দিয়ে ঘুরে নিল দরজার সামনে, তারপর অন্তরাকে একরকম ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখে মা হাসিমুখে বসে আছে টেবিলে নানান খাবার সাজিয়ে। অন্তরা এসেছে অভিজিতের বাবার সঙ্গে, নিয়ে এসেছে কলকাতার থেকে নানান মিষ্টি, মিষ্টি দই আরো কত কিছু আর অভিজিতের অল টাইম ফেবারিট বাঙ্গালী নিমকি। দেখেই পেটুক অভিজিৎ একমুঠো যেই হাতে নিয়েছে নিমকি,মা সুনন্দা বললেন, “আগে চেঞ্জ করে তবে খাবি, যা ঘরে যা তোর।” বলে ওর ঘরে ওকে একরকম জোর করে পাঠিয়ে দিলেন।ঘরে ঢুকে ঘরের আলো জ্বালতে দেখে ঘরে বসে আছে তৃষিতা, অভিজিৎ চোখটা কচলে নিল ঠিক দেখছে তো ও। অভিজিতকে দেখে তৃষিতা সামনে এসে বলল, “পারবে আমায় ক্ষমা করে তোমার মনের রঙ্গে আমায় রাঙিয়ে নিতে? আমি যে সব দ্বিধা সংকোচ ভুলে শুধু তোমার জন্য এতদূর ছুটে এসেছি আন্টির কথায় অফিসে বদলি নিয়ে !!!” “আন্টির কথায়” শুনে অভিজিৎ অবাক হয়ে দরজার দিকে তাকাতে দেখে সুনন্দা দাঁড়িয়ে হাসছেন। “Thou too Brutas!!!” ধরণের একটা চাহনি দিল অভিজিৎ সুনন্দাকে, যে তাকে অন্ধকারে রেখে এই কলকাঠি নেড়েছেন ঘরে বসে বসে অন্তরার সাহায্যে। হঠাৎ প্রাপ্তির এই আনন্দে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না ও।

অন্তরার সঙ্গে যোগাযোগ বরাবরই আছে সুনন্দার আর অভিজিতের, কিন্তু অন্তরা ওর তৃষিতার সঙ্গে যোগাযোগ আর আন্টির সঙ্গে কথাবার্তা কিচ্ছুটি জানায়নি অভিজিতকে। সেই অন্তরার মধ্যস্থতায় তিনি একটু ঝুঁকি নিয়েই শৈশবে মাতৃহীন তৃষিতাকে আসতে বলেছেন আর তৃষিতা বুঝেছে সুনন্দার মত মানুষের সঙ্গ তাকে সাহায্যই করবে ভবিষ্যতে যত সুনন্দার সঙ্গে ওর যোগাযোগ বেড়েছে। তাই সেও এখন সুনন্দার সঙ্গই চায়, একটা স্নেহের মায়ের আঁচল চায় নিশ্চিত আশ্রয়ের। তাই ও এখন দাঁড়িয়ে আছে সুনন্দাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। বাবাও এসে দাঁড়িয়েছেন কখন ঘরের ভেতরে ছেলের ভবিষ্যতের রাস্তা সুগম করতে।

হঠাৎ অন্তরা গান ধরল, “আজ সবার রঙ্গে রং মেশাতে হবে, ওগো আমার প্রিয়, তোমার রঙীন উত্তরীয়” সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দা আর তৃষিতাও গলা মেলালো। অভিজিৎ বলল, “না না, আমি আজ ‘গাইবো এমন মাধবী নিশি আসেনি তো আগে’ বলে অভিজিৎ একপাক নেচে নিল অন্তরা আর তৃষিতার হাত ধরে। অভিজিতের মনে হল আজকে ও পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ যাকে ঈশ্বর একসঙ্গে মনের মানুষ, চির সহযোগী মা বাবা আর অন্তরার মত রত্ন একটা বন্ধু দিয়ে রঙীন করে দিয়েছেন জীবনকে সব উজ্জ্বল রঙ্গে। এবারে বসন্তে তাই কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, অশোকের লাল হলুদের সঙ্গে সব ফিরোজা, সবুজ, নীল রঙ মিলেমিশে এক অনির্বচনীয় আবীর রঙ্গে রেঙে হয়ে উঠেছে যেন প্রাণের হোলি।

॥ফিরে পাওয়া॥

মৌখালীর সবিতা মন্ডলের আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না, আচমকা এক ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে তার জীবনটা ওলোটপালোট হয়ে গেল যেন। বিয়ে হয়ে ইস্তক ভরা সংসার তার, শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ননদ, বর নিয়ে নয় নয় করে সাত আটজনের সংসার, বর্ধিষ্ণু পরিবার, জমিজিরেত, হালবলদ, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, গাছে আর ক্ষেতে ঘেরা বাগান নিয়ে শ্বশুরবাড়ির অবস্থা নিয়ে তার গরবের শেষ ছিল না। তায় আবার বর অজিত তাকে চোখে হারাতো, শ্বশুর শাশুড়িও ভালোই বাসতো, মাধ্যমিক পাশ করে এগারো ক্লাসে পড়া দেওর সুজিত তো সমবয়সী, বন্ধুর মত আর ননদ রানী সারাক্ষণ “বৌমণি”, “বৌমনি” করে পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করত, যেন নিজের ছোট বোন একটা।

সবিতা মাধ্যমিক পাশ, আরো পড়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাবা হঠাৎ বিয়ে দিয়ে দিল অভাবের সংসারে একটা পেট কমবে বলে আর নিজের দায়িত্ব সেরে ফেলবে বলে। কালোর মধ্যে মিষ্টি চেহারার মেয়েটার বিয়ে হয়ে দুবছরের মাথায় ছেলে সোনু হল। আর তারপরেই শুরু হল ঝামেলা। দেওর সুজিত গ্রাজুয়েট হয়ে চাকরি পেল উড়িষ্যার শতাপদাতে, সেখানে গিয়ে বছর ঘুরতে বিয়ে করে সেখানেই থেকে গেছে। বাড়িও আসেনা, বাড়ির খোঁজও করেনা, টাকা পাঠানো অনেক দূরের ব্যাপার। অজিতদের মাছের ব্যবসা, অজিত প্রায়ই যায় জেলেদের সাথে মাছ ধরতে, যদিও অজিতরাই মহাজন কিন্তু অজিতের বড়ো জলের নেশা। ছেলের জন্মে পর থেকে সে সপ্তাহে একদিন বাড়িতে আসে কিনা সন্দেহ এমন টান তার জলের। ছেলের আট বছর বয়স যখন, তখন একবার এমন ট্রলার নিয়ে গেছিল মাছ ধরতে, সেবারে রেডিওতে বার বার বারণ করছিল বড়ো ঘূর্ণিঝড় আসছে বলে, সবিতা, অজিতের মা বাবা কত বারণ করল, সে কানেই নিল না। জাফর, আব্দুলদের সাথে ভেসে পড়ল ট্রলার নিয়ে, তারপরে সেই ঝড় এলো, সমস্ত মৌখালী সেই ঝড়ে লন্ডভন্ড হল, কিন্তু সেই ট্রলারও ফিরল না, অজিত আর তার সঙ্গীরা আর ফেরেনি। দেখতে দেখতে আজ দু বছর হয়ে গেল অজিতের খোঁজ নেই। সেই শোকে শ্বশুর মারা গেল আর শাশুড়ির মাথার গন্ডগোল দেখা দিল, জমিজিরেত সব জ্ঞাতিরা অনেকখানি ঠকিয়ে নিয়ে নিল, তবু সবিতা লড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে ননদ রানীর বিয়ে হয়ে গেছে কুলপিতে। সে মাঝে সাঝে আসে বটে কিন্তু তারও বড়ো সংসার, এসে থাকবার প্রশ্নই ওঠেনা তার।

গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান নস্করবাবুদের বাড়িতে কাজ নিয়েছে সবিতা, নস্করের গিন্নির রান্নার জোগাড় করে দেওয়া, রান্না করা, ঘর গুছিয়ে দেওয়া, হাতে হাতে যোগান দেওয়া জিনিস এইসব করে, মুড়ি ভেজে, বড়ি দিয়ে, বাগানের সব্জি কিছু হাটে বেচে সে কোনোরকমে সংসারটা টেনে নিয়ে চলেছে। নস্করবাবুর বড়ো ছেলের চাহনি ভালো ঠেকে না সবিতার, তার সামনে পড়লে মনে হয় তার কেমন যেন গায়ে যথেষ্ট কাপড়চোপড় নেই, খুবই নোংরা চাহনি, কিন্তু সংসার টানতে হয় সবিতাকে, তাই এড়িয়ে চলে ওই ছেলের সামনে পড়াটা। ছেলে সোনু এখন ক্লাস ফাইভের ছাত্র, একটাই সান্ত্বনা সবিতার ছেলেটার লেখাপড়ায় খুব মাথা, স্কুলের সব মাস্টারেরা খুবই স্নেহ করে ওকে। সবিতা অভাবের তাড়নায় অনেক বই কিনে দিতে পারেনা, কিন্তু স্কুলের শিক্ষকেরা ওকে জোগাড় করে দেন সেসব বই। এখনো বাড়িতে একটু একটু ছেলের পড়া সবিতা দেখিয়ে দিতে পারে, আরো উঁচু ক্লাস হলে হয়তো পারবে না।

সন্ধেয় বাড়ি ফিরে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বেলে রাতের রান্না সারতে সারতে কারেন্ট থাকলে কখনো সখনো একটু টিভি দেখে ও, শাশুড়ির তো মাথার ঠিক নেই, টিভির সামনে বসেও বিড়বিড় করে কি বকতে থাকে সে। এমনি করেই দিন চলছে ওদের। এরমধ্যে এলো আরেক ঘূর্ণিঝড়, সুন্দরবনের মানুষ এই ঝড়কে নিয়েই বাস করে, তাই ওরা জানে ঘূর্ণিঝড় চলে যাবার পরে বেশ কিছুদিন লাগে সব স্বাভাবিক হতে।

সেদিন এমনি ঘূর্ণীঝড়ের পরে সবে কারেন্ট এসেছে, সন্ধেবেলায় রান্না করছিল সবিতা, ছেলে কোন এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে ঢুকল। ঢুকেই টিভি চালিয়ে সবিতার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল টিভির সামনে কি দেখাতে। একী দেখছে সবিতা!!!... বাংলাদেশের একটা জায়গায় একটা নৌকোয় একটা লোকের ইন্টারভিউ নিচ্ছে টিভি থেকে, সেই লোকটা নাকি শেষ ছয় সাতমাস জলে ভেসে রয়েছে, কাঠিসার চেহারা, অনাহারে অসহায়তায় দুর্বলতায় লোকটা কথা বলতে পারছে না...কিন্তু লোকটাকে চিনতে ভুল হয়নি সবিতার, এ যে তার স্বামী অজিত মন্ডল।

অজিত খুব কষ্ট করে কথা বলছে, টিভির লোকেরা বলছে সেই আগের ঘূর্ণীঝড়ের দাপটে অজিতদের ট্রলার দিকভ্রষ্ট হয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছিল এবং পরে ডুবে যায়, শেষ মুহূর্তে অজিত জলে ঝাঁপ দেয় জাফরের সঙ্গে, কিন্তু জাফর তলিয়ে যায় জোয়ারে। তাকে উদ্ধার করে ওখানকার মাছধরা নৌকো একটা, কিন্তু সঙ্গে কোনো পরিচয়পত্র না থাকাতে ইন্ডিয়াতে আসতে পারে না, এদিকে স্থলসীমান্ত পেরোনো বিপজ্জনক যদি বি ডি আরের হাতে ধরা পড়ে যায়।সেই মাছধরা নৌকোর জেলেদের সাথে মাছ ধরতে গিয়ে তাদের নৌকো পথ হারায় আবার আর একে একে সবাই মারা যায়, অজিতও মারা যেত, টানা ছমাস জলে ভেসে থেকে নৌকোর খাবার শেষ হবার পরে জলটুকুও ছিল না তার গলায় ঢালার, এমন সময় এই ঘূর্ণীঝড়ে তার নৌকো দমকা হাওয়ার দাপটে টেনে এনে ফেলে এই ইন্ডিয়ার দিকে আর সেই সময় সেটা নজরে পড়ে জলপুলিশের। তারা নৌকো আটক করে মৃতপ্রায় অজিতকে পায় এবং সংবাদমাধ্যমের নজরে আসে ব্যাপারটা। অজিত এই কথাগুলো আগে বলেছে সংবাদমাধ্যমকে, এখন সে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছে। খবরটা দেখতে দেখতে সবিতা হু হু করে কেঁদে ওঠে, ছেলেও কাঁদছে, আহা মানুষটা কত কষ্ট পেয়েছে!!!! এমন সময় সবিতা অনুভব করে তার পিঠে হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে আরো একজন আকুল হয়ে কাঁদছে, সে অজিতের মা।

হঠাৎ সচেতন হয়ে সবিতার খেয়াল হল তাদের বাড়িতে একে একে জড়ো হয়েছে প্রতিবেশীরা। একটু পরে নস্করবাবু এসে আশ্বাস দিয়ে গেলেন সবিতাদের তাঁর পক্ষে যতোটা সম্ভব হবে, তিনি করবেন অজিতকে ফিরিয়ে আনতে। সেদিন বিনিদ্র রাত কাটলো বাড়ির সবার। পরেরদিন অন্ধকার ফিকে হতেই রানী এলো তার বর আর ছেলে নিয়ে, এসে সেও কাঁদতে লাগলো। রানীর বর সুমন গেল পঞ্চায়েত প্রধান নস্করবাবুর কাছে, সুমনকে নিয়ে নস্করবাবু গেলেন জেলাশাসকের কাছে। বিকেলে সুমন ফিরে এসে বলল যে জেলাশাসক পুলিশের সাথে কথা বলেছেন, এক দুদিনের মধ্যেই অজিত বাড়ি আসবে।

সবিতার যেন মনের মধ্যে কেমন হাঁকপাক করছে, সে এখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না তার এহেন ভাগ্য। সত্যি সত্যিই যে অজিত আবার আসবে, আবার তার সংসারটা ভরে উঠবে, তার রংহীন দিনযাপন আবার আদরে সোহাগে ভরে উঠবে সে ভাবতে গেল।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM